ত্রিবর্ণা

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

॥ কস্‌মো ক্রিপ্ট ॥ ৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ১৯৬১

প্রকাশিকা : তাপসী সেনগুপ্ত, ১১ নিতাইবাবু লেন, কলকাতা-৭০০০১২
মুদ্রক : শ্রীসাধনকুমার গুপ্ত, শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রিন্টিং, ২১/বি রাধানাথ
বোস লেন, কলকাতা—৭০০০০৬

১

কাহিনীর নামের প্রসঙ্গ পরে। কাহিনী প্রসঙ্গও পরে।

একজোড়া দম্পতি ঘাটশিলা বেড়াতে গেছেন সেটা গাঁজাখুরি ব্যাপার কিছু নয়। বেড়ানোর মৌসুমে বহুজোড়া দম্পতি গিয়ে থাকেন। এটাও বেড়ানোর অথবা স্বাস্থ্যোদ্ধারের মৌসুম। এই বছরেরই অর্থাৎ আশি সালের আশ্বিন মাস। সালটা টাটকা বটে, কিন্তু ওই দম্পতি টাটকা বা কাঁচা কিছু নয়। চৌষট্টি আর সাতান্ন। মোহিনী সরকার চৌষট্টি। লম্বা, কালো। একমাথা কাঁচা-পাকা চুল। চাউনিতে বুদ্ধির ছাপ। এই বয়সেও শক্ত-সমর্থ মনে হয়। কিন্তু বছর দুই আগে একবার ছোট-খাটো হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে। হাইকোর্টের নামী অ্যাডভোকেট। সকাল সাতটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত সেরেস্তা-কোর্ট-সেরেস্তা করে অভ্যস্ত। কিন্তু দু'বছর আগে ওই অ্যাটাকটি হয়ে যাবার পরে জীবনের দোসর সাতান্নটি অর্থাৎ বিভা সরকার তাঁর সময়ের ওপর প্রকাণ্ড একটা থাবা বসিয়েছেন এবং ফাঁক পেলেই বসিয়ে চলেছেন। বিভা সরকারের ডাক্তার বাবা এখনো বেঁচে, আর ডাক্তার দাদা তো বহাল তবিয়তে বেঁচে। তাঁদের পরামর্শের পরোয়ানা নিয়ে বিভা সরকার দাবি করেছিলেন, প্র্যাকটিস থেকে সম্পূর্ণ অবসর নিতে হবে। অনেক বাক-বিতণ্ডার পর আপসরফা হয়েছে। বাছাই দু'চারটে কেস শুধু নেবেন, তার বেশি নয়। সপ্তাহে বড়জোর তিন দিন কোর্টে যাবেন, তার বেশি নয়। আর বছরে অন্তত তিন বার বেড়াতে বেরুবেন, তার কম নয়।

বিভা সরকারের সাদা-সাপটা হিসেব। মানুষ যা কিছু চায়, সবই তো হয়েছে বাপু, আর কেন। নিজের মস্ত বাড়ি হয়েছে, দু-তিন বছর অন্তর নতুন নতুন গাড়ি হচ্ছে, ব্যাঙ্কে টাকা যা আছে দেড়শ বছর

বেঁচে থেকে বসে খেলেও ফুরোবে না—এ ছাড়া ওপরে-নিচে দুটো দুটো করে এয়ারকুলার, দুটো ফ্রিজ, টি-ভি—কি না হয়েছে। আর কি চাই বা কত চাই? তাঁর মতে কেবল কাজ করা আর টাকা আনা একটা অভ্যাসের রোগ ছাড়া আর কিছু নয়।

মায়ের সঙ্গে একেবারে একমত তাঁদের ব্যারিস্টার ছেলের। একমাত্র ছেলে। আর কোনো সন্তান নেই। অতএব তাঁর মতেরও রীতিমতো জোর থাকাই স্বাভাবিক। ব্যারিস্টার ছেলের যা আয় তার বেশির ভাগ বাবার জুনিয়র হিসেবে। বাধ্য হয়েই এই বাস্তব তাকে মেনে নিতে হয়েছিল। বাবা প্র্যাকটিস কমানো মানেই তার প্র্যাকটিস বাড়া। কারণ বাবা যখন একেবারে সরে দাঁড়াচ্ছে না, মক্কেলরাই বা একেবারে সরে যাবে কেন?

অগত্যা একা মোহিনী সরকার সকলের সঙ্গে আর কত যুঝতে পারেন? তাই বুদ্ধিমানের মতো অনেকটা অবকাশের কোলে গা ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁর মনে মনে ধারণা, ছোটখাটো হার্ট অ্যাটাকের ফলে স্ত্রী-টি ভিতরে ভিতরে একটু খুশিই হয়েছেন। তাঁর কাজকমের ওপর এত জারিজুরি আর কখনো খাটাতে পারেন নি। এই বয়সে এসে স্বামীটিকে মোটামুটি দখলের ওপর পেয়েছেন। গোড়ায় গোড়ায় মোহিনী সরকারের এত অবকাশ ভালো লাগত না। হাঁপ ধরে যেত। এখন সয়ে যাচ্ছে শুধু নয়, তাঁরও ভিতরে একটু গা-ছাড়া ভাব এসেছে। এই দেশটা যে বেশ একটু ঘুরে বেড়াবার জায়গাও এটা অনুভব করছেন। এখন অনেক কিছু খুঁটিয়ে দেখেন যা আগে দেখতেন না। অনেক কিছু পড়েন যা আগে পড়তেন না।

হালের গল্প-উপন্যাস ছেড়ে রবি ঠাকুরের কবিতা পড়েও বেশ রস পাচ্ছেন আজকাল। পড়ার ব্যাপারে তাঁর গাইডের কাজ করছেন বিভা সরকার। এককালে স্ত্রীটির লেখিকা হবার সখ ছিল। বয়েস-কালে কিছু লেখা খুব সংগোপনে মাসিক-সাপ্তাহিকের দপ্তরে পাঠিয়েছেন এবং তা ফেরতও এসেছে। ক্রমে লেখিকা হবার সাধ গেছে, কিন্তু গল্প-উপন্যাস পড়ার ঝোঁক বেড়েছে। নেশা বলতে এখন

ওই একটাই। হাতে গোণা যে দু'চারজন লেখকের লেখা তাঁর ভালো লাগে তা বারকয়েক পড়া না হলে তৃপ্তি নেই। দিনে হোক রাতে হোক ভালো গল্প উপন্যাস পড়ার অভ্যাসটা শুয়ে এবং বই বুকে নিয়ে। তাই দেখে মোহিনী সরকার কত ঠাট্টা করেছেন। বলেছেন, তোমার ভালো লেখকদের ভাগ্য বটে, ষোল থেকে সত্তর বছরের তরুণী যুবতী প্রৌঢ়া আর বৃদ্ধার বুকে বুকে ঘুরে বেড়ান। এমন জানলে ওকালতির দিকে না গিয়ে লেখক হতাম।

বিভা সরকারও সমান তালে জবাব দিতেন, মেয়েদের বুকে ওঠার মতো লেখক ইচ্ছে করলেই হওয়া যায় না—বুঝলে। এ তোমার পেনাল কোড না যে ঝেড়ে মুখস্ত করে মেরে দিলেই হল। লেখক হতে হলে জীবন দেখার আর জীবন জটিলতা বোঝার আলাদা চোখ আলাদা মন দরকার।

মহিলার বাছাই-করা লেখকদের বই বেরুলে তিনি কিনেই ফেলেন। লাইব্রেরি থেকে এনে পড়ার অপেক্ষায় থাকেন না। এই করে তাঁর নিজস্ব লাইব্রেরিটি কম বড় নয়। এখন সেখান থেকে বই বেছে বেছে নিয়ে তিনি স্বামীকে পড়ান। পড়ার পর আলোচনা করেন। এক-এক সময় জোর তর্কও বেঁধে যায়। কারণ স্ত্রীটির যে লেখক যত প্রিয়, তার এই সমালোচনায় মোহিনী সরকার ততো নির্মম। স্ত্রীর কাছে ভালো লাগার দিকটা এড়িয়ে কেবল খুঁতগুলোই বড় করে তোলেন এবং স্ত্রীর তর্কের মেজাজ দেখে মনে মনে খুশি হন। মোটকথা স্ত্রীর পাল্লায় পড়ে আর সময় কাটানোর দায়ে ইদানীং গল্প-উপন্যাস পড়তেও ভদ্রলোকের ভালোই লাগে।

এবারে কাছাকাছির মধ্যে সস্ত্রীক ঘাটশিলায় এসেছেন। ছেলে বা ছেলের বউ তাঁদের সঙ্গে কখনো বেরোয় না। এদিকে মোহিনী সরকার সস্ত্রীক আসা মানে সঙ্গে পুরনো খানসামা আসা, একটা ছোকরা চাকর আসা, চাকরের থেকে প্রমোশন পাওয়া বয়স্ক অথচ কর্মঠ কেয়ারটেকারের আসা। সকলেই এসেছে। সেই সঙ্গে কলকাতা থেকে আরামে বা ভালো থাকার জন্যে যেসব সরঞ্জাম আনা সম্ভব

'তা-ও এসেছে। অথচ সরকার দম্পতি এখানে একমাস থাকবেন কি এক সপ্তাহ সেটা কেমন লাগে তার ওপর নির্ভর। বেশ নিরিবিলি ছিমছাম জায়গা, স্বাস্থ্যকর তো বটেই, আশা করা যায় ভালোই লাগবে।

এখানে এসে তিন চার দিন ধরে মোহিনী সরকার আর বিভা সরকার আর একজোড়া ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলাকে লক্ষ্য করছেন। এঁদের দৃষ্টিতে তাঁরা আর যা-ই হোন দম্পতি বলে মনে হয় নি। মোহিনী সরকার উকিলের চোখ দিয়ে তাঁদের দেখছেন। আর বিভা সরকার তাঁর সহজাত মেয়েলি কৌতূহলের চোখ দিয়ে। খুব সকালে তিন মাইল দূরের বাজারে বা কিছুটা কাছের হাটে তুজনকে দেখেছেন। এখানে খুব সকালে ভিন্ন বাজার থেকে পছন্দের মাছ তরকারি বা মাংস মেলা ভার। বেড়ানোর মৌসুমে লোকের ভিড়ে তো বাজার আরো আকাল হয়ে ওঠে। মোহিনী সরকার সস্ত্রীক সাইকেল রিকশয় আসেন, হাট বা বাজার সেরে তাতেই ফেরেন। তাঁদের লক্ষ্যের ওই ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলাও তাই। মোহিনী সরকার তাঁদের বাজার করাও একটু-আধটু লক্ষ্য করেছেন। ভদ্রলোককে এই বয়সেও একটু পেটুক মনে হয় তাঁর। কারণ, সামনে যা দেখেন সঙ্গিনীকে তাই কিনতে বলেন। আর সঙ্গিনীটি সুন্দর মুখে একটু ভুরু কুঁচকে বা একটা হাত অল্প একটু নেড়ে তার বেশির ভাগই বাতিল করে দেন। মোহিনী সরকার বেশ লক্ষ্য করেছেন, মহিলা নিজের বিবেচনামতো পরিমিত বাজার করেন। নিজেই শক্ত হাতে বাস্কেট বা ব্যাগ নিয়ে বাজার বহন করেন। মাথায় কাপড় থাকে না তখন, শাড়ির আঁচল গাছকোমর করে জড়ানো থাকে। মোহিনী বা বিভা সরকারের বাজারের ব্যাগ আর থলে অবশ্যই ছোকরা চাকরটার হাতে। সময় হিসেব করে তাকে আগেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বাজার শেষে ছোকরাটা হেঁটে ফেরে, আর বাজার ফেরে তাঁদের রিকশয়।

হাটে বা বাজারে ছাড়া রাস্তায় দেখা হচ্ছে, শীর্ণ সুবর্ণরেখার ধারে বা কাছের পাহাড়ী টিলাটার কাছেও দেখা হচ্ছে। কাছাকাছির মধ্যে বেড়াবার জায়গা এই তুটোই। শহরের মধ্যে বেড়াতে বেরুলে

এর এক জায়গায় না এক জায়গায় দেখা হবেই। কিন্তু বেড়াতে তো আরো অনেকেই বেরিয়ে থাকেন। অথচ সরকার দম্পতির অবধারিত লক্ষ্য ওই ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলাটি।

লক্ষ্যের প্রধান কারণ বোধহয় দুজনের বয়সের ফারাক। ফারাকটা অবশ্য সরকার দম্পতির বিবেচনায়। দুজনেরই ধারণা, ভদ্রলোকের বয়েস সত্তরের কিছু ওপরে ছাড়া নিচে হবে না। মাথায় চুল যেটুকু আছে সবই সাদা। গায়ের রং না কালো না ফর্সা। চোখে মোটা কাচ আর মোটা ফ্রে:মর চশমা। লাঠি ব্যবহার করেন না বটে তবে ধীরেসুস্থে পা ফেলে হাঁটেন। মুখখানা হাসি-হাসি, কিন্তু, মহিলার তুলনায় কথা কম বলেন যে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যখনই দেখা হয়, মহিলাকে বেশ সুন্দর ভঙ্গীতে একটু একটু হাত নেড়ে কথা বলতে দেখা যায়। ভদ্রলোকের বেশির ভাগ শ্রোতার আর অল্প অল্প হাসার ভূমিকা।

কৌতূহলের বা লক্ষণীয় হয়ে ওঠার আসল কারণ ওই মহিলা। দুজনেরই মতে তাঁর বয়েস খুব বেশি হলে সাতচল্লিশ কি আটচল্লিশ। মাথায় একরাশ কুচকুচে চুলের ওপর দিয়ে কতগুলো রুপোলি চুল ছড়িয়ে না থাকলে বা কানের দুপাশেও কিছু পাকা চুল দেখা না গেলে সাতচল্লিশ আটচল্লিশও আদৌ বলা যেত না। গায়ের রং রীতি-মতো ফর্সা, মুখশ্রীও সুন্দরই বলতে হবে। কিন্তু অমন ফর্সা বা অমন মুখশ্রীও হামেশাই দেখা যায়। এ ছাড়াও মহিলার মধ্যে দর্শনীয় কিছু আছে যা চট করে ঠাহর করা যায় না, অথচ অনুভব করা যায়। বয়েস কালে প্রায় দীর্ঘাঙ্গী মহিলার স্বাস্থ্য-সম্পদ নিশ্চয় চোখে পড়ার মতো ছিল। তারই তৎপরতাটুকু এখনো যেন সর্ব অঙ্গে ছড়িয়ে আছে। তাঁর বাস্কেট হাতে বাজার করা, হাঁটা চলা কথা বলার সময় ঈষৎ চঞ্চল ভঙ্গীতে সুডোল হাত নাড়া—সবকিছুর মধ্যে সেই সুতৎপর মাধুর্যটুকু রমণীয় হয়ে ওঠে। সুগৌর কপালে ছোটর ওপর জ্বলজ্বলে সিঁদুরের টিপ, সিঁথিতে সিঁদুরের জ্বলন্ত আঁচড়। এ রকমই হয়তো সকলে পরে, কিন্তু মহিলার সজীবতার দরুন তা-ই হয়তো একটু বেশি

উজ্জ্বল মনে হয়। মহিলার মধ্যে দর্শনীয় কি মোহিনী সরকারের ধারণা তিনি ধরতে পেরেছেন এবং স্ত্রীকেও বলেছেন। সাতচল্লিশ বা আটচল্লিশ যে বয়েসই হোক এখন, মহিলার চাল-চলনে তা-ও যেন একটু তফাতে সরে আছে—ছুঁয়ে থেকেও ছুঁতে পারছে না। বিভা সরকার এই মন্তব্যের সঙ্গে খুব দ্বিমত হননি।

এখন প্রশ্ন বা কৌতূহল, ভদ্রমহিলা ভদ্রলোকের কে হতে পারেন? আত্মীয়া তো বটেই। তাঁদের বাড়ির আধ মাইলের মধ্যে রেল লাইনের কাছাকাছি দু'খানা ঘরের একটা ছোট্ট বাংলোয় ওঁরা আছেন—আসতে যেতে সরকার দম্পতি তা-ও দেখে রেখেছেন। আত্মীয়া ভিন্ন ওই বুড়োর সঙ্গে এসে এক বাড়িতে থাকা, এক রিকশয় চেপে বাজারে যাওয়া বা বিকেলে একসঙ্গে বেড়াতে যাওয়া সম্ভব কেউ ভাবে না। আত্মীয়া তো বটেই, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়াই মনে হয়। কিন্তু সেটা কি হতে পারে? অবকাশ অঢেল, তাই আলোচনাতেও আলস্য নেই। মোহিনী সরকার আর বিভা একটু হিসেবও করেছেন। বিভা বলেছেন, ধরা যাক ভদ্রলোকের বয়েস বাহাত্তর, তার বেশি ছাড়া কম কিছুতে হবে না, আর ওই মহিলার বড়জোর আটচল্লিশ—তাহলে তফাৎ কত হল?

—চব্বিশ।

বিভার মন্তব্য, আগের দিনের মানুষদের বিয়ে তো একটু আগেই হত—তাহলে ভদ্রলোকের মেয়ে হওয়াই সম্ভব।

মোহিনী সরকারের উকীলের মাথা, তাঁর ভাবনাও একেবারে অত সহজ বা সরল কিছু না। জবাব দেন কিন্তু মেয়ে মনে হয় না। প্রথম কথা, ভদ্রলোককে মহিলার আগলে রাখার মধ্যে একটু মিষ্টি শাসনের ভাব আছে যা বাদ দিলে তোমার সঙ্গেও একটু আধটু মেলে।

বিভা ছোট্ট প্রতিবাদ করলেন, আ-হা—

—দ্বিতীয় কথা, আজই তোমাতে আমাতে ওই ঢিবিতে বেড়াতে গিয়ে দেখলাম, বিকেলের আলোয় টান ধরতে না ধরতে ব্যাগ থেকে চাদর বার করে মহিলা নিজের হাতে বেশ করে ভদ্রলোকের গায়ে গলায় জড়িয়ে দিলেন, যা অনেকটা শরৎবাবুর নায়িকাদের সঙ্গে মেলে।

কিন্তু তাঁদের মধ্যে একমাত্র শেষ প্রশ্নে তাজমহলে বেড়াতে এসে আশু বক্সির মেয়ে মনোরমাকে বার দুই বলতে শুনেছি বাবা ওঠো, তোমার ঠাণ্ডা লাগবে। নিজে হাতে কিছু করে নি। মোট কথা, ওভাবে চাদর জড়িয়ে দেওয়াটা বাবা মেয়ের সম্পর্কের মতো আমার একটুও মনে হয় নি।

কি বলতে চান বিভা অতটা তলিয়ে না ভেবেই জিজ্ঞাসা করলেন. তাহলে কি অনেক ছোট বোন-টোন হবে?

মোহিনী সরকার হালছাড়া গলায় বললেন, এত আধুনিক বই গিলে শেষে এই ছন্দপতন! .ভাই-বোনের ছাদ-ছিরিতে এমন অসম্ভব তফাৎ হয়! হলেও আমার ভাবতেই নীরস লাগে। আমি বলছিলাম, ভদ্রমহিলা ভদ্রলোকের তৃতীয় বা চতুর্থ পক্ষের উনি হতে বাধাটা কি— তা হলে অনেকগুলো কনডাক্ট রুল মানে আচরণ-বিধি মেলে।

বিভা সরকার বক্র শ্লেষে তক্ষুনি সেই সম্ভাবনা বাতিল করেছেন। —হুঁঃ, খোঁজ নিয়ে দেখো গে যাও বয়েসকালে প্রথম পক্ষ করার জন্য কত ছেলে ও মেয়ের পায়ের কাছে গড়াগড়ি খেয়েছে—দেখলে বুঝতে পারো না? অমন খ্যাংরাকাঠির তৃতীয়-চতুর্থ হবার তার দায় পড়েছে।

—তা অবশ্য ঠিক, কিন্তু অমনটি হলেই একটু রসের হয় না?

—বাজে বোকো না, শেষে দেখবে বাপ-মেয়ে বা সেই গোছের কিছু, তখন রস বেরিয়ে যাবে। তুমি যে বলেছিলে, কদিন দেখার পর ভদ্রলোকের মুখখানা একটু চেনা-চেনা ঠেকছে, কোথাও দেখেছ মনে হচ্ছে—মনে পড়ছে?

দু' তিন দিন দেখার পর মোহিনী সরকারের সত্যি মনে হয়েছে ভদ্রলোকের ওরকম একখানা মুখের আদল, বিশেষ করে ওই গোছের একটু মিষ্টি মিষ্টি হাসি কবে কোথাও দেখেছেন। ওকালতিতে আইনের ধারা পড়ে পড়ে হোক বা যে কারণেই হোক, আজও তাঁর প্রখর স্মরণশক্তি। কিন্তু অনেক ভেবেও তিনি ঠিক করতে পারেন নি, এই ভদ্রলোকটিকে কোথাও তিনি দেখেছেন কি দেখেন নি। অথচ মনে হয় দেখেছেন।

জবাব দিলেন, না, কত অচেনা লোককেই তো অনেক সময় চেনা-চেনা মনে হয়।

স্ত্রীটি তক্ষুনি সন্দিগ্ধ।—আসলে তোমার মেমরি খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

আরো দু'দিন বাদে চাক্ষুষ দেখা আর সামনা-সামনি আলাপ। বিকেলের দিকে মোহিনী সরকার আর বিভা সরকার রেল লাইনের দিক ধরে বেড়াতে বেড়াতে আসছিলেন। ওই দু' ঘরের বাংলোর সামনের ঘরের দরজা খোলা। দরজা আগলে বৃদ্ধ ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে। গায়ে একটা আধা গরম চাদর জড়ানো। তাঁদের দিকেই চেয়ে আছেন।

মোহিনী সরকারও তাঁর দিকে চেয়ে হঠাৎ হাসলেন একটু। অবশ্যই সৌজন্যের হাসি।

ভদ্রলোকও তক্ষুনি হাসলেন এবং মিষ্টি হাসি।

মোহিনী সরকার আর বিভা সরকার তখন বাংলোর দশ গজের মধ্য দিয়ে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিলেন। মোহিনী সরকার হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে হাসিমুখে দু হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার জানালেন।

ভদ্রলোকও তক্ষুনি প্রতি-নমস্কার করে অন্তরঙ্গ অভ্যর্থনা জানালেন, আসুন আসুন—বেড়িয়ে ফিরছেন?

মোহিনী সরকার ঘুরে স্ত্রীর হাসিছোঁয়া মুখখানা একবার দেখে নিয়ে ভদ্রলোকের দু' গজের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন।—হ্যাঁ....আপনারা আজ বেরোন নি?

মুখখানা একটু বিরস করে ভদ্রলোক জবাব দিলেন, নাঃ, আমার শরীরটা নাকি আজ খুব ভালো নেই।

শুনে মোহিনী সরকার এবং তাঁর পিছনে বিভা সরকার অবাক। নিজে বলছেন, শরীরটা নাকি ভালো নেই—এ আবার কি কথা।

ভদ্রলোক আবার সাদর আহ্বান জানালেন, আসুন, ভিতরে আসুন।

তাঁরা তবু একটু দ্বিধান্বিত। অসুবিধে হবে কিনা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলেন। তার আগেই ভদ্রলোকের পিছন থেকে কচি ছেলের গলার মতো মিষ্টি রমণী কণ্ঠ শোনা গেল, কার সঙ্গে কথা হচ্ছে?

ভদ্রলোকের এবারের জবাবও অদ্ভুত। পাশের ঘরের দিকে সামান্য ঘাড় ফিরিয়ে জবাব দিলেন, আমাদের সেই ওঁরা—

না বুঝে ঈষৎ বিস্ময়ে ভিতরের মহিলা এগিয়ে এসে ভদ্রলোকের পাশ দিয়ে দেখলেন। তারপরেই হাসিমুখে ব্যস্ত আহ্বান জানালেন, ও···আসুন আসুন। আঃ, দরজা আগলে দাঁড়িয়ে থাকলে ওঁরা আসেন কি করে।

শেষেরটুকু ভদ্রলোকের উদ্দেশে। তিনি অপ্রস্তুত মুখে সরে দাঁড়ালেন। মোহিনী আর বিভা সরকার ভিতরে ঢুকলেন। মহিলা সামনের কাঠের চেয়ার দুটো দেখিয়ে বললেন, বসুন—

চেয়ার দুটোর পাশেই একটা ইজিচেয়ার পাতা। বিভা হাসি হাসি মুখে একটা কাঠের চেয়ারের দিকে এগোলেন। কিন্তু বসার আগেই বাধা পড়ল। মোহিনী সরকার প্র্যাকটিস অনেক ছেঁটে দিলেও বাঘা উকিল তো বটেন। মনে মুখে তেমন লাগাম টেনে কথা বলার অভ্যেস নেই। তিনি ভদ্রলোকের দিকে ফিরে বলে উঠলেন, দাঁড়ান, একটা জিনিস আগে বুঝে নিই, উনি (মহিলা) কার সঙ্গে কথা হচ্ছে জিজ্ঞেস করতে আপনি জবাব দিলেন, আমাদের সেই ওঁরা—মানে, আপনাদের আমরা···কি রকম ব্যাপার ?

বিভা সরকারের চোখে কৌতুক, মহিলার অপ্রতিভ মিষ্টি মুখ। ভদ্রলোকের বাইরেটা একটু নির্লিপ্ত গম্ভীর বটে, কিন্তু কথা একটু কৌতুক-ছোঁয়া হেঁয়ালি গোছের। বিনীত জবাব দিলেন, আমার বলার মধ্যে একটু ভুল হয়েছে। বলা উচিত ছিল বাইরে দেখা হয়ে গেলে আমরা যাঁদের সেই ওঁরা।

জবাব শুনে তুখোড় চালাক মানুষ মোহিনী সরকার ভিতরে ভিতরে একটু হোঁচট খেলেন। অথচ কথাগুলো সঠিক বোধগম্য হল না। মহিলা তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, আপনারা বসুন, ওঁর কথায় কান দেবেন না—

বসার আগে মোহিনী সরকার বললেন, দাঁড়ান, আগে নিজেরা নিজেরা পরিচয় করে নিই। আমি মোহিনী সরকার, পেশা

হাইকোর্টের ওকালতি—আর ইনি আমার স্ত্রী মিসেস সরকার—আপাতত প্র্যাকটিস অর্ধেকের বেশি ছেড়ে দিয়ে এঁর শাসনে আছি—

ভদ্রলোক গম্ভীর গলায় বলে উঠলেন, আ-হা, সুশাসন বলুন। নমস্কার, নমস্কার। আমার যে নামটা ইদানীং সব থেকে প্রিয় সেটা হল খোকা—যত বয়েস হচ্ছে এই নামের টান ততো বাড়ছে। তাই আমি খোকা গাঙ্গুলি।

মোহিনী সরকার এবারে বুঝলেন, ভদ্রলোক বাইরে যেমনই হোক ভিতরে রসিক মানুষ। হাসিমুখে নিজেও তক্ষুনি একটু রসিকতা করে বসলেন, আপনাকে তাহলে খোকাবাবু বলে ডাকব?

—নিশ্চয় ডাকবেন। একদিকে মিষ্টি, অন্যদিকে লোকে শুনলে মজা পাবে।

পরিচয় শেষ হবার আগেই থেমে যাবার উপক্রম দেখে একটু বেশি আগ্রহ নিয়েই হয়তো মহিলাকে দেখিয়ে মোহিনী সরকার জিজ্ঞেস করলেন, ইনি....?

নির্লিপ্ত গম্ভীর গলায় খোকা গাঙ্গুলি বললেন, ইনি আমার ছোট শালী।

শোনামাত্র মোহিনী সরকার আর বিভা সরকার বিমূঢ়, হতচকিত। এটা বাইরের ঘর, যত বয়সই হোক শালী নিয়ে একঘরে···

কিন্তু ভালো করে মাথায় কিছু ঢোকার আগেই ভদ্রলোকের উদ্দেশে মহিলার ধমক শোনা গেল।—কি হচ্ছে? মুখ লাল করে অভ্যাগতদের দিকে ফিরে সুন্দর তু'খানা হাত জোড় করে বললেন, আমি মিসেস গাঙ্গুলি।

পলকে ঘর ছেড়ে পাশের ঘর থেকে একটা মোড়া নিয়ে এলেন। —বসুন আপনারা, আমি এতে বসি।

যে যার আসন নিলেন। সরকাররা তু'জন কাঠের চেয়ারে, খোকা গাঙ্গুলি ইজি-চেয়ারে। বসার পরেই মোহিনী সরকার অপ্রস্তুত। কারণ বসার ফাঁকটুকুর মধ্যে স্ত্রীর দিকে চেয়ে তিনি একটা বিজয়ীর দৃষ্টি হেনেছেন, তারপর মুখ ফিরিয়েই দেখেন, ভদ্রলোকের নির্লিপ্ত

দু'চোখ তাঁরই মুখের ওপর। চোখোচোখি হওয়ামাত্র খোকা গাঙ্গুলী আলতো করে জিজ্ঞেস করলেন, কি হল? আপনি জিতেছেন আর আপনার স্ত্রী হেরেছেন?

শুনে বরাবরকার স্মার্ট মানুষ মোহিনী সরকার হঠাৎ ভ্যাবাচাকাই খেলেন একটু।—কি বলছেন?

—দাঁড়ান মশাই দাঁড়ান, না, মানে সবুর করুন। গম্ভীর মুখে ঈষৎ ভ্রুকুটি।—সেই প্রথম থেকে দেখছি আপনি আমার সোজা-সোজা কথাগুলোও বুঝতে পারছেন না। আচ্ছা, গোড়া থেকে একে একে বোঝাপড়াটা হয়ে যাক—

এ পর্যন্ত বলেই স্ত্রীর দিকে ফিরলেন।—এঁদের একটু চা দিতে বলো···আমি আধ পেয়ালার বেশি না।

সকোপে তাঁর দিকে ফিরে তাকাতে গিয়ে মহিলা হেসে ফেললেন। অতিথিদের বললেন, আসলে এঁর দু'বার হয়ে গেছে বলে আর সিকি পেয়ালাও জোটার কথা নয়—

ভদ্রলোক গম্ভীর গলায় তাগিদ দিলেন, তাড়াতাড়ি। এঁদের সঙ্গে বোঝাপড়াটা শুরু করতে পারছি না।

মহিলা তক্ষুনি উঠে গেলেন। প্রথম পরিচয়পর্ব এমনি অভিনব যে সৌজন্যের খাতিরেও দু'জনের কেউ চা থাক বলার ফুরসত পেলেন না। খোকা গাঙ্গুলি আধবসা থেকে তিন কোয়ার্টার শুয়ে পড়লেন। আর সেই ফাঁকে সরকার-দম্পতি বার দুই দৃষ্টিবিনিময় করে নিলেন। কাজের লোকটিকে চায়ের কথা বলে মিসেস গাঙ্গুলি এক মিনিটের মধ্যে ফিরে হাসিমুখে আবার মোড়ায় বসলেন।

মোহিনী সরকার ভিতরে ভিতরে বেশ কৌতুকবোধ করছিলেন। সপ্রতিভ মুখে বললেন, খোকাবাবু এবারে বোঝাপড়া শুরু হোক—

খোকাবাবু আবার সোজা হলেন। কিন্তু অতিথির কথা কানেও গেল না যেন। স্ত্রীর দিকে ঝুঁকলেন, বেন্দাটাকে কি বলে এলে, আমাকে এই একটুখানি অন্তত দেবে তো? আঙুলে করে পরিমাণ দেখালেন।—না কি এঁরা খাবেন আমি বসে বসে দেখব?

সরকার-দম্পতি একটু জোরেই হেসে উঠলেন। মহিলার হালছাড়া হাসিটুকু আরো সুন্দর। বললেন, এই রকমই বলার স্বভাব, আপনারা ভাবছেন আমি ভালো করে খেতেই দিই না—

সঙ্গে সঙ্গে খোকা গাঙ্গুলির ভ্রূকুটি এবং বিস্ময়।—সোমা! তুমি আর যা-ই করো, মিথ্যের আশ্রয় তো নাও না। ওঁরা ভাবছেন কি রকম? সামান্য একটু চা নিয়েই যা ব্যাপার, বৃহৎ ব্যাপারে তুমি কি করো সে-কি এঁদের বুঝতে বাকি যে তুমি এঁদের অন্যরকম ভাবাতে চাইছ!

এ ক'দিনের দূর থেকে দেখা মানুষটার এমন রসের ফল্গুধারা কল্পনা করা যায় নি। তাঁদের বিশেষ জল্পনা-কল্পনা ছিল এই সোমা গাঙ্গুলিকে নিয়ে। সোমা নামটাও বেশ লাগল মোহিনী সরকারের। খোকা গাঙ্গুলি ছাড়া হাসছেন সকলেই। সোমা বললেন, লোকের সামনে আমাকে নাকাল করতে পারলেই ওঁর খুব আনন্দ।

মোটা ফ্রেমের পুরু কাচের চশমার ওধারে খোকাবাবুর দু' চোখ এবার মোহিনী সরকারের মুখের ওপর।—কি বলছিলেন···বোঝাপড়া? হ্যাঁ, আমি বলছিলাম আপনি আমার জলের মতো কথাগুলোও বুঝতে পারছেন না। যেমন, এক—যেমন, আমরা আজ বেরুইনি কেন জিজ্ঞেস করতে আমি বললাম, আমার শরীরটা নাকি আজ ভালো নেই। ওই 'নাকি' শুনে আপনি অবাক। অথচ একটু আগে আপনি নিজেই বললেন, প্র্যাকটিস অর্ধেকের বেশি ছেড়ে এখন স্ত্রীর শাসনে আছেন। সেই শাসনটা যদি আস্তে আস্তে নিখাদ সুশাসনের দিকে গড়ায় তাহলে দেখবেন আপনার শরীরের খবর আপনার থেকে আপনার স্ত্রী ঢের বেশি রাখেন।

—দুই। আমি স্বীকারই করলাম, আপনাদের আমাদের সেই ওঁরা বলা ঠিক হয়নি—বলা উচিত ছিল, বাইরে দেখা হয়ে গেলে আমরা যাঁদের সেই ওঁরা। তাই শুনেও আপনি বিলক্ষণ অবাক। অথচ বাইরে দেখা হয়ে গেলেই আপনারা যে আমাদের বেশ খুঁটিয়ে দেখেন, একজনের চোখে না পড়লে আর একজনকে খোঁচা দিয়ে বা ইশারায় আমাদের দেখান, আর আমাদের নিয়ে

আলোচনা করেন—এসব আমার থেকে আপনারাই ভালো জানেন। এবারে আমার জবাবটা বুঝতে আর বোধহয় খুব অসুবিধে হচ্ছে না।

—তিন। সোমা আমার স্ত্রী শুনেই যেভাবে আপনি আপনার স্ত্রীর দিকে তাকালেন, আমার ধারণা, শুধু বাজী জিতলেই অমন করে তাকানো যায়। কিন্তু আমি জেতা-হারার কথা বলতে আপনি বুঝতেই পারলেন না।

বিভা সরকারের দু' চোখ কপালে। লজ্জিত আর অপ্রস্তুত তো বটেই, অদ্ভুত ভালোও লাগছে। অথচ এই মানুষকে দেখে দূর থেকে স্বল্পভাষী মনে হত। অ্যাডভোকেট মোহিনী সরকার চক্ষুলজ্জার ধার ধারেন না। এ যাবৎ অনেক মানুষ দেখেছেন, অনেক মানুষ চরিয়েছেন। সামান্য আলাপে এই লোকের বিচক্ষণ দৃষ্টিশক্তি আর অতি সহজে দুয়ে দুয়ে চারে পৌঁছানোর ক্ষমতার প্রশংসা না করে পারলেন না। কোনো কথার প্রতিবাদ না করে অল্প অল্প হাসছিলেন তিনি। মুখের দিকে চেয়েছিলেন। হঠাৎ একটু উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, এর আগে আপনাকে কি আমি কখনো কোথাও দেখেছি—অথবা আপনি আমাকে দেখেছেন?

ভালো করে মুখের ওপর একটু চোখ বুলিয়ে খোকাবাবু জবাব দিলেন, শাস্ত্রমতে দু'জনেই দু'জনকে দেখেছি।

—সেটা কি রকম? মোহিনী সরকার উৎসুক।

—শাস্ত্র বলে আমাদের প্রত্যেকটা যোগাযোগ পূর্বনির্দিষ্ট। আগের যোগাযোগ ভিন্ন কোনদিন কারো সঙ্গে পরের যোগাযোগ হয় না।

—আগের বলতে?

—আগের বলতে আগের জন্মের হতে পারে—তার আগেরও হতে পারে।

মোহিনী সরকার হাসলেন একটু।—না আমি এই জন্মের কথাই বলছি।

খোকাবাবু আবার তাঁকে দেখলেন। বললেন, মনে পড়ছে না।

বৃন্দাবন ট্রে-তে তিন পেয়ালা চা আর ডিশে বিস্কুট নিয়ে এলো। সোমা মোড়া ছেড়ে উঠে ভরতি পেয়ালা দুটো অভ্যাগতদের দিলেন আর কম চায়ের পেয়ালাটা তৃতীয় জনকে। বিভা সরকার জিজ্ঞেস করলেন, আপনারটা?

জবাব দেবার আগেই খোকা গাঙ্গুলি বলে উঠলেন, চলে না, চলে না—আমার আর এক দুর্ভাগ্য দেখুন, চায়ের সঙ্গী পর্যন্ত নেই। স্ত্রীর দিকে ফিরলেন, তুমি আর এক পেয়ালা দুধ নিয়ে বোসো না, লজ্জা কি?

অন্যদিকে থেকে কোপের প্রতিক্রিয়াটুকু অবিমিশ্র মিষ্টি লাগল মোহিনীবাবুর।

পরপর কয়েক চুমুকে নিজের পেয়ালা খালি করে এবং সেটা ইজি-চেয়ারের পাশে রেখে খোকা গাঙ্গুলি নিশ্চিন্ত। একটু চুপ করে থেকে বললেন, এবারে আমাদের নিয়ে আপনাদের আসল যা কৌতূহল সেটা ব্যক্ত করে ফেলুন—একটুও লজ্জা করবেন না, আমি ও জিনিসটা অনেককাল বর্জন করেছি।

মোহিনী সরকার ঠোঁট-কাটা মানুষ, কিন্তু এ এমনি এক পরিস্থিতি যে অভিজ্ঞতার ভান করা ছাড়া উপায় নেই। বললেন, আর কি কৌতূহল?

—বলেন কি মশায়! ভদ্রলোক সত্যের অপলাপ দেখেই যেন আরো অবাক।—উনি আমার দ্বিতীয় পক্ষ না তৃতীয় পক্ষ নাকি চতুর্থ পক্ষ এই প্রশ্ন আপনাদের মনে নেই বলতে চান?

কর্তার থেকেও এবারে বিভা সরকার বেশি ফাঁপরে পড়লেন। সোমা গাঙ্গুলি এবারে ধমকেই উঠলেন, সেই থেকে তুমি যা করছ ওঁরা আর এদিক মাড়াবেন না।

মোহিনী সরকার বললেন, নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনারা না চাইলেও আমরা নিশ্চয় মাড়াবো, কারণ দোষী হয়েও এত আনন্দ কমই মেলে—লোকচরিত্র পাঠে উনি সিদ্ধ মানুষ এ অস্বীকার করতে পারছি না।

লজ্জা পেয়েও সোমা গাঙ্গুলি বলতে গেলেন, শুনুন এর মধ্যে ওঁর শরীরটা—

খোকা গাঙ্গুলি একটা হাত তুলে বাধা দিলেন।—থামো, অপ্রাসঙ্গিক কথা আমি বরদাস্ত করি না জানোই তো। গম্ভীর। —কথা তোমাকে নিয়ে আমাকে নিয়ে নয়। এঁদের কৌতূহল এমন বৃদ্ধের অমন প্রায়-তরুণী ভার্যা কেন—বা কোন্ পক্ষের। মোহিনী সরকারের দিকে ফিরলেন।—ঠিক কি না ?

মোহিনী সরকার ওকালতির মাথা খাটালেন। জবাব দিলেন, কৌতূহল যদি অস্বাভাবিক না হয়, অপরাধ স্বীকার করছি।

—খুব স্বাভাবিক। আমার মতো বৃদ্ধ কারো কৌতূহলের বিষয় নয়, ওঁর মতো মেয়েও কারো কৌতূহলের ব্যাপার নয়—দুই অসমের সাতপাকের অঘটনটুকুই কৌতূহলের স্বাভাবিক কারণ। এই কারণ না থাকলে আপনারা হয়তো আসতেনই না। স্ত্রীর দিকে ফিরলেন, অতিথিদের বিমুখ না করে তুমিই বলে দাও কোন্ পক্ষ। এর মধ্যে লজ্জা পাবার বয়েস তো কারো নেই—

সোমা গাঙ্গুলি প্রায় ধমকের সুরে বললেন, চালাকি করে কেবল কথা ঘোরাচ্ছ, তুমি আমাকে বলতে দিচ্ছ ? বিভার দিকে ফিরলেন। —শুনুন, যা বলছিলাম, এই ছ' মাস হল—

—অবজেকশন মাই লর্ড অ্যাণ্ড লেডি—অবজেকশন। ইরেগুলার, ইর‍্যাশানাল অ্যাণ্ড ইম্‌মেটিরিয়াল। মোহিনী সরকারের দিকে তাকিয়ে গলা খাটো করলেন খোকা গাঙ্গুলি।—আপনাদের ভাষাটা ঠিক হল ? তারপরেই আবার গলা চড়ালেন।—শুনুন, মেয়েরা—না মানে আমার স্ত্রী অন্তত ঘোরা পথে চলেন, অর্থাৎ সোজা প্রশ্নের সোজা জবাব দিতে চান না, এ প্রমাণ তাহলে হয়েই গেল। ঠিক আছে, জবাব আমিই দিচ্ছি। পক্ষ বিচারে আপনাদের সব অনুমানই ভুল, এ সম্পর্কে একটা বিচারই খাটে—উনি চিরদিনই আমার বিপক্ষ।

হাসির মধ্যেই বিভা সরকার ঈষৎ বিস্ময়ে বলে উঠলেন, তার মানে উনি তাহলে প্রথম পক্ষ ?

—একেবারে খাঁটি ধরেছেন ম্যাডাম। আদি এবং অকৃত্রিম। স্ত্রীর লাল মুখের দিকে চেয়ে এবারে গম্ভীর আবার। —তাহলে একটা প্রশ্ন থেকেই যায়—প্রজাপতির এমন অসম নির্বন্ধ ঘটে কি করে। অতিথি দুজনকে সচকিত করে স্ত্রীকে হঠাৎ রুক্ষ কণ্ঠে ধমকে উঠলেন তিনি, কতদিন বলেছি বয়েসের সার্টিফিকেটটা গলায় ঝুলিয়ে নাও—লোকের কাছে আমাকে এমন অপ্রস্তুত করার মানে কি?

বকুনির শেষ শুনে সরকার-দম্পতি আরও মজাদার বিস্ময়ের আঁচ পেলেন। সোমার লালচে মুখে হাসি চুয়ে পড়ছে। বললেন, নিজে অসময়ে সাত বুড়োর এক বুড়ো সেজে বসে আছ লজ্জাও করে না।

অন্য দুজন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছেন। খোকা গাঙ্গুলির মুখে স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্যের ফাঁকে টিপটিপ হাসি। বললেন, এবারে তাহলে উপসংহারে আসা যাক। যদিও মেয়েদের বয়েস নিয়ে আলোচনা এটিকেটের বাইরে, তবু এই জমাটি পরিবেশের খাতিরে আমরা অকপট হতে পারি। বিশেষ করে যা নিয়ে এত কাণ্ড—দু'চোখ মোহিনী সরকারের দিকে।—এবার আপনি তাহলে আমার মিসিসের বয়েসটা অনুমান করুন।

মোহিনী সরকার বোকা নন আদৌ। অনুমানের বেশ ওপরেই উঠলেন—পঞ্চাশ একান্ন…

হাসিমুখে সোমা গাঙ্গুলি ঘোষণা করলেন, আটান্ন।

—কক্ষনো না। প্রতিবাদ বিভা সরকারের। তাঁর থেকেও মহিলা এক বছরের বড় এ বিশ্বাস করেন কি করে।

সোমা গাঙ্গুলি তেমনি হেসেই বললেন, তা হলে কলকাতায় ফিরে একদিন বাড়িতে আসুন, এজ্‌ সার্টিফিকেট দেখাব।

মোহিনী সরকার বলে উঠলেন, তাহলে কংগ্র্যাচুলেশনস্—অনেক কংগ্র্যাচুলেশনস্ সোমা দেবী। এভাবে বয়সের চোখে ধুলো দেওয়াটা আমি দস্তুরমতো ক্রেডিট মনে করি।

ঘরের লোককে দেখিয়ে এবারে টিপ্পনীর সুরে সোমা গাঙ্গুলি বললেন, তাহলে ওঁকেও একটু কংগ্র্যাচুলেট করুন, আমার থেকে

বিশ্বাস করবেন, আমার থেকে মাত্র পাঁচ বছরের বড়।

অর্থাৎ মোহিনী সরকারের সমবয়সী। অন্য দু'জনকে এবারেও একটু হকচকিয়ে যেতে দেখা গেল। খোকা গাঙ্গুলি বললেন, বিশ্বাস করবেন না। আপনার বৃদ্ধের তরুণী ভার্যার রসটুকুই মাটি তাহলে।

—থামো। অন্যদের দিকে ফিরলেন সোমা গাঙ্গুলি। —এই জন্যেই আমাকে বার বার থামিয়ে দিচ্ছিলেন, বুঝলেন?....ক'মাস আগে ওঁর একটা অপারেশন হয়ে গেল, প্রোসট্রেট অপারেশন—সঙ্গে আরো সতের ব্যাপার—অপারেশনের পরেই তার ওপর নিউমোনিয়া—যমে-মানুষে এমন টানাটানি আমি আর দেখিনি। তারপরেই মাথার চুলগুলো সব সাদা হয়ে গেল আর শরীরের এই হাল। দেখলে কেউ ভাবতেও পারবে না কি চেহারা কি হয়ে গেল।

খোকা গাঙ্গুলি গম্ভীর। —অর্থাৎ তখন ওঁর মতে আমি রূপবান পুরুষ ছিলাম।

মোহিনী সরকার আর বিভা সরকারের সত্যি ভারি ভালো লাগছিল। বিভা বললেন, আপনি যা-ই বলুন, অনেক ঠকেছি আমরা, আর আপনার কথার ফাঁদে পড়তে রাজি নই।

খোকা গাঙ্গুলি স্ত্রীকে বললেন, এবারে শুধু ওঁদেরই তাহলে আর এক পেয়ালা করে চা হোক।

মোহিনী সরকার তাড়াতাড়ি বাধা দিলেন, আর চা না, আমারও বেশি চায়ে একটু অসুবিধে আছে—গল্প করতে খুব ভালো লাগছে.... আপনাদের সময় নিচ্ছি না তো?

—দয়া করে সময় দিচ্ছেন, খোকা গাঙ্গুলির বিনীত জবাব, একটা বিকেল সন্ধ্যা ভালো কাটছে।

ভালো বিভারও খুবই লাগছে। গলা একটু খাটো করে সোমাকে বললেন, অসুস্থ মানুষকে একলা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন, আপনার ছেলেপুলে...?

খোকা গাঙ্গুলি বলে উঠলেন, সে কথা তুলে আর লজ্জা দেবেন না,

একটা তুটো নয়, একেবারে পাঁচটি। প্রথমে তুই ছেলে পরে তিন মেয়ে। গেলবারে ছোট মেয়েটারও বিয়ে হয়ে যেতে এখন আমাদের নির্ঝঞ্ঝাটি হনিমুন।

যিনি বলছেন, তাঁরই শুধু সিরিয়াস মুখ। অন্য সকলের হাসির ফাঁকে বিভা সরকার পাঁচ ছেলেমেয়ের মায়ের স্বাস্থ্যের ওপর আর একবার চোখ না বুলিয়ে পারলেন না। সোমা গাঙ্গুলি জিজ্ঞেস করলেন, আপনারাও তো তু'জনেই এসেছেন দেখছি···আপনার ?

—একটি ছেলে। ব্যারিস্টার। উনি প্র্যাকটিস কমিয়ে দিতে ওর ওপর চাপ বেশি—বেড়াবার সময়-টময় হয় না।

খোকা গাঙ্গুলি গম্ভীর মন্তব্য করলেন, ইন্দিরা গান্ধীর প্রাইজ দেওয়া উচিত আপনাদের—ছোট পরিবার সুখী পরিবার।

তেমনি নকল গাম্ভীর্যে মোহিনী সরকার বললেন, আপনাদের দেখে অসুখী যারা বলবে তাদের জরিমানা হওয়া উচিত। একটু কৌতূহল হচ্ছে, আপনার পেশাটি জানতে পারি ?

খোকা গাঙ্গুলী সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, ব্যবসা।

—ব্যবসা বলতে ?

—মিথ্যেকথার ব্যবসা। যত মিথ্যে বলি লোকে ততো খুশি আর ব্যবসাও ততো জমজমাট।

মোহিনী সরকার বিভা সরকার তু'জনেই চেয়ে আছেন। সোমা অল্প অল্প হাসছেন। খোকা গাঙ্গুলি বললেন, বুঝলেন না তো ? তাহলে শুনুন—

নিজের ইজি-চেয়ারেই জমিয়ে বসলেন একটু। তেমনি গম্ভীর। পুরনো দিনের কথা মনে করার মতো করে বলে গেলেন, সে অনেক কাল আগের কথা, বিলেত থেকে এক জাহাজ মিথ্যেকথা চালান এসেছিল আউট্রাম ঘাটে। আমার তখন বেকার দশা। শুনে পড়ি-মরি করে ছুটলাম। কিন্তু গিয়ে দেখি সর্বনাশ কাণ্ড। আগেভাগে টের পেয়ে বাঘা-বাঘা ব্যবসায়ীরা এসে সব কিনে নিয়ে গেছে। আমার

মনে দুঃখ শুধু হল না, ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখতে লাগলাম। রাগে শোকে ওই গঙ্গাতেই প্রাণ বিসর্জন দেব ঠিক করে ফেললাম। বেগতিক দেখে মা গঙ্গা উঠলেন। বললেন, বাছা আত্মঘাতী হয়ে কাজ নেই, এখন থেকে মিথ্যাই তোর স্বচ্ছন্দ জীবিকার অবলম্বন হবে। ব্যস, আর কি, তারপর থেকে ওই মিথ্যের নৌকোতেই ভেসে চলেছি।

বিভা সরকার হাসতেও পারছেন না, হাসি চাপতেও পারছেন না। সোমা গাঙ্গুলি সকৌতুকে স্বামীর গম্ভীর মুখের দিকেই চেয়ে আছেন। মোহিনী সরকার ধরে নিলেন, ব্রোকারি অর্থাৎ দালালি-টালালি হবে ভদ্রলোকের জীবিকা। মিথ্যের ফুলঝুরি ওই লাইনেই বেশি ছোটাতে হয়। তাই আর জেরার মধ্যে না গিয়ে তারিপ করলেন, আপনি তো ভাগ্যবান, অসৎ রাস্তা ধরেন নি—আমরা সত্যকে মিথ্যে করছি আর মিথ্যেকে সত্য বানাচ্ছি। যাক, এখানে আছেন কতদিন?

—জানি না। উনি যদি মনে করেন আমার শরীর ভালো যাচ্ছে তাহলে চট করে নড়া-চড়ার কোনো প্রশ্ন নেই। আপনারা?

—আপনার মতো অতটা না হলেও আমারও উনিশ বিশ একই ব্যাপার। দু'বছর আগে একটু মাইলড্ স্ট্রোক হয়েছিল, সেই থেকে ওঁর বিবেচনায় খুব সুস্থ থাকছি না।

খোকা গাঙ্গুলি বলে উঠলেন, বাঃ এদিক থেকে আমরা তাহলে সতীর্থ।

বিভা সরকার এবারে উঠে দাঁড়ালেন, এখন চলো, অনেক জ্বালিয়েছি, আর না। খোকা গাঙ্গুলির দিকে ফিরলেন, আপনারা আমাদের বাড়িতে কবে যাচ্ছেন বলুন, অনেকক্ষণ সময় নিয়ে যেতে হবে—আর আপনি কি খেতে ভালবাসেন বলুন।

খোকা গাঙ্গুলি নিজের স্ত্রীর দিকে তাকালেন। —দেখলে, কেবল তুমিই বলো কথার চোটে কান ঝালা-পালা—কথার জাদু দেখলে? বিভার দিকে ফিরলেন, খাওয়ার ব্যাপারে আমি ভেজ্, ননভেজ্, দুইয়েরই উপাসক—মোচার কাটলেট আর চিকেন কাটলেট দুইই সমান রেলিশ করে খাই। আপনি যেভাবে বলছেন, কাল যেতে পারি, পরশু যেতে

পারি, তরশু যেতে পারি—আবার কাল পরশু তরশু রোজই যেতে পারি।

বিভা সরকার হাসি মুখে মাথা নাড়লেন, বেশ তো যাবেন—এমন কান ঝালাপালার আশায় আমরা খুব আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করব।

পরদিন না হোক, তার পরদিন সত্যিই এসেছেন তাঁরা। সরকার দম্পতি খুশির অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। আর ভদ্রলোকের গল্প জমাবার প্রতিভা দেখে এদিনও মুগ্ধ হয়েছেন। আর খোকা গাঙ্গুলি মুগ্ধ হয়েছেন এমন অল্প সময়ের মধ্যে খাওয়ার ব্যবস্থা দেখে। সত্যি গরম চিকেন কাটলেট এসেছে, চমৎকার স্যালাড এসেছে, ফ্রায়েড পোটাটো এসেছে, শেষে পুডিংও। খোকা গাঙ্গুলি হাঁ করে খানিক দেখলেন। তারপর না হেসে সোল্লাসে বলে উঠলেন, আপনি একি জাদু জানেন—ঘাটশিলায় এই সব!

বিভা বললেন, আমার বাহাদুরি নেই, উনি বাইরে বেরুলে আমি সঙ্গে না থাকলেও চলে—পুরনো খানসামাটা না হলে চলে না—তাকে সঙ্গে আনাই চাই।

—খানসামা! আ-হা! সোমার দিকে ফিরলেন, দেখো, এবার থেকে ওঁদের আর কষ্ট করে আমাদের ওখানে যাওয়ার দরকার নেই, আমরাই যখন পারি এসে যাব'খন।

বিভা খুশিমুখে রাজি।—আসবেন, ও জন্যে ঘাবড়াই না। স্বামীকে দেখিয়ে শোনালেন, উনি সেদিন বলছিলেন, ভদ্রলোকের কথা শুনলে আর তাঁর সঙ্গে কথা বললে মনে হয় খানিকটা আয়ু বাড়ল। তবে এর পরে আপনার খাওয়ার ব্যাপারে আপনার মিসেসের মতামত নেব কিন্তু।

—নিশ্চয় নেবেন। সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর সায়।—তবে দয়া করে আমার খাওয়ার আগে নয়, পরে।

খাওয়ার শেষে বড় করে একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন।—আঃ, আমারও পরমায়ু কিছু বাড়ল।...তবে আমাদের তফাৎ খুব নেই

বুঝলেন, আমি খাই-খাই করে খাই আর উনি (স্ত্রীকে দেখিয়ে) ভালো জিনিস হলে খাই-না খাই-না ভাব দেখিয়ে খান।

সোমা গাঙ্গুলির পুডিং খাওয়ায় ছেদ পড়ল। হেসে ফেললেন।

বিভা তাড়াতাড়ি বললেন, আপনি খান তো। ভদ্রলোকের দিকে ফিরলেন, আপনি সব থেকে বেশি মজা পান দেখছি ওঁর পিছনে লেগে।

খোকা গাঙ্গুলিব নিবীহ মুখ।—অন্যের পিছনে লেগে অত নিরাপদ বোধ কবি না।

মোহিনী সবকার হা-হা শব্দে হেসে উঠলেন।—আপনাকে কথা-শিল্পী বলি, না কথাসাগর বলি।

এই সামান্য কথায় সোমা গাঙ্গুলির বেশ একটু আনন্দ দেখা গেল। মন্তব্য করলেন, তাই বললে যদি একটু জব্দ হন।

আর এই সামান্যতেও খোকা গাঙ্গুলি দমে গেলেন।—অমন কাণ্ডটি কববেন না, শুনলে সাহিত্যিকের দল আপনাকে ঘেরাও করবে। যাক, ঘাটশিলায় বেড়ালেন কেমন ?

বিভা জবাব দিলেন, এখানে ওই সরু পাথুরে সুবর্ণরেখা আর ওই টিবি ছাড়া বেডাবার কি আছে—দেখারই বা কি আছে।

খোকা গাঙ্গুলি বললেন, সুবর্ণরেখার বিক্রম দেখতে হলে বর্ষায় আসবেন। মৌভাণ্ডারের কপার কর্পোরেশন তো মাত্র দেড় মাইলের মধ্যে—দেখে আসতে পারেন। ...কপার মাইন অবশ্য মাইল ছয়েক হবে এখান থেকে, মোসাবাণী থেকে রাখা পর্যন্ত চলে গেছে। সাইকেল রিকশ নিয়ে তা-ও ঘুরে আসতে পারেন। একটু থেমে আবার বললেন, এই ঘাটশিলাকে হেলাফেলা করবেন না—একদিন এই ঘাটশিলা ছিল ধলভূমের রাজধানী। ধলভূম রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রংকিণীর মন্দিরও দেখে আসতে পারেন—এই আশ্বিনেই সেখানে সাঁওতালদের বিন্দ মেলা হয়, টানা পনের দিন চলে—ওদের সব থেকে বড় উৎসব এখানকার।

সরকার-দম্পতি মন দিয়ে শুনছিলেন। বিভা সরকার বললেন,

কিছুই তো দেখি নি এখনো....আপনি বুঝি অনেকবার এখানে এসেছেন ?

খোকা গাঙ্গুলি তক্ষুনি মাথা নাড়লেন। —আমারও এখানে এই প্রথম, আর এখন পর্যন্ত সুবর্ণরেখা ছাড়া আর কিছুই দেখি নি।

তাঁরা অবাক।—সে কি ?

সোমা মুখ টিপে হেসে জবাব দিলেন, এটা মিথ্যে নয়, যেখানে যখন যান, আগে লাইব্রেরি থেকে বই আনিয়ে সে জায়গা সম্পর্কে খুঁটিয়ে পড়ে নেন।

অন্য দুজনের কৌতূহল স্বাভাবিক। মোহিনী সরকার জিজ্ঞেস করলেন, কেন, পরে দেখতে সুবিধে হয় বলে ?

সোমা গাঙ্গুলি তেমনি জবাব দিলেন, মিথ্যের ব্যবসারও কিছু সুবিধে হয় বোধহয়।

ওঁরা না বুঝেও হাসলেন। সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে, এবার ওঠার তাড়া। অবশ্য রিকশতেই যাবেন, অল্প রাস্তা হলেও হিম লাগার ভয়ে সোমা তাঁর ভদ্রলোককে হাঁটতে দেবেন না।

সকলে একসঙ্গে নেমে আসতেই খোকা গাঙ্গুলির দু'চোখ তামার খনির দিকে গেল। ওদিকটা গনগনে লাল। সেই লালের আভা আকাশ পর্যন্ত ছড়িয়েছে। রাত হতে না হতে রোজই সকলের চোখে পড়ে তামার খনির অগ্নিকুণ্ডের আগুন। সেদিকে চোখ রেখে খোকা গাঙ্গুলি নিস্পৃহ মন্তব্য করলেন, ওই তপতপে লাল দেখতে বেশ লাগে আমার, ঘরে যিনি আছেন তাঁর সঙ্গে ওটার প্রায়ই খুব মিল দেখি।

মোহিনী সরকার জোরেই বলে উঠলেন, অবজেকশন—অবজেকশন! একজন মহিলার ওপর আপনি মিথ্যে অপবাদ চাপাচ্ছেন।

সোমা চাপা গলায় ঠেস দিলেন, মিথ্যের ব্যবসা পেশা নিজেই তো স্বীকার করেছেন—অবজেকশন দিয়ে কি লাভ।

পরের তিনদিন রোজই হাটে বা বাজারে আর সুবর্ণরেখার ধারে দেখা হয়েছে। এই অন্য জুটিকে পেয়ে সরকার-দম্পতির দিন বেশ

হাসিখুশির মধ্যে কাটছে। সেদিন বাজারে এসে তাঁরা অন্য জুটিকে দেখলেন না। অবশ্য বাজারে ওঁরা রোজ আসেন না, মাঝে মাঝে বৃন্দাবন আসে। তাকেই দেখলেন। তক্ষুনি দুজনের মধ্যে প্ল্যান হল। একটু ঘটা করেই বাজার সারলেন তাঁরা। বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ দুজনে বেড়াবার জন্য তৈরি হয়ে বাংলো থেকে বেরুলেন। সোজা রেল লাইনের দিকে অর্থাৎ গাঙ্গুলি বাড়ির দিকে চললেন। উদ্দেশ্য রাতে বাড়িতে ওঁদের ডিনারের নেমন্তন্ন করবেন। সকলে একসঙ্গে বেড়ানো সেরে ওঁদের সঙ্গে করে বাংলোয় ফিরবেন।

পেঁছুলেন। সামনের ঘরের ভেজানো দরজা দুটো চার-ছ আঙুল ফাঁক। মোহিনী সরকার দরজা ঠেলতেই মেঝেতে তিনটে খাম চোখে পড়ল। ডাক-পিওন দরজার ফাঁক দিয়ে ফেলে দিয়ে গেছে। খাম তিনটে তিনি ম্যাট থেকে কুড়িয়ে নিয়ে সোজা হবার ফাঁকে একটা খামের ওপরে চোখ পড়তেই থমকালেন একটু। তারপরেই বিমূঢ় কেমন। ভুরু কুঁচকে পরের খামটার নাম ঠিকানা দেখলেন। তার পরেরটারও। তারপর আকাশ থেকে পড়া মুখ করে স্ত্রীর দিকে তাকালেন।

স্বামীর এই আচরণ দেখে বিভা সরকারও কম অবাক নন। তিনি কিছু বলতে যেতেই একটা আঙুল ঠোঁটে ঠেকিয়ে মোহিনী সরকার তাঁকে কথা বলতে নিষেধ করলেন। তার পরে তিনটে খামেরই ওপরের নাম দেখালেন। ঠিকানার ওপরে প্রত্যেকটাতে নাম লেখা, মহাদেব গাঙ্গুলি।

বিভা সরকারও প্রথমে বিমূঢ় কয়েক মুহূর্ত। তারপরেই বেশ বড় সড় ঝাঁকুনি খেলেন একটা। ওই খামের নামের ওপর দু চোখ ঠিকরে পড়ার দাখিল—দেখেও বিশ্বাস করতে পারছেন না। নিজের অগোচরে গলা দিয়ে অস্ফুট একটা শব্দই বেরিয়ে এলো। সেটা আনন্দের থেকে ঢের বেশি বিস্ময়ের।

ভিতর থেকে খোকা গাঙ্গুলির গলা শোনা গেল, দেখ তো ওঁরা এলেন বোধ হয়।

সোমা গাঙ্গুলি এলেন। হেসে আপ্যায়ন জানাতে গিয়েও থমকালেন। বিশেষ করে বিভা সরকারের মুখ আর চাউনি কি রকম লাগল, বললেন, কি ব্যাপার, ওঁকে কি ছুটিয়ে নিয়ে এলেন নাকি?

মোহিনী সরকারের হাত দুটো পিছনে। জবাব দিলেন, না, এখানে এসে ছুটছেন। আপনার ভদ্রলোককে ডাকুন।

ডাকতে হল না। নিজেই এলেন। সেই চিরাচরিত গম্ভীর মুখ। —এই যে আসুন, আজ একটু সকাল সকাল মনে হচ্ছে…।

সে কথার জবাব না দিয়ে মোহিনী সরকার একটা খাম তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিলেন।—এই মেঝেতে পড়েছিল, দেখুন তো পিওনটা ভুল করে দিয়ে গেল নাকি।

খামটা হাতে নিয়ে চোখ বোলাবার সঙ্গে সঙ্গে মোহিনী সরকার এই প্রথম ভদ্রলোকের মুখে চকিত বিড়ম্বনার ছায়া দেখলেন একটু। অস্ফুট কথাও শুনলেন, তাই তো দেখছি…

—এটা? দ্বিতীয় খাম সামনে ধরলেন মোহিনী সরকার।

—এ-ও তো…

—আর এটা? কিছু বলার আগেই তৃতীয় খাম।

তৃতীয় খামটাও হাতে নেবার পর ভদ্রলোকের মুখে বিড়ম্বনার হাসি একটু। —এ যে দেখি মহাদেব গাঙ্গুলির ট্রায়ো একেবারে।

সোমা গাঙ্গুলি দ্বিতীয় খাম দেখার পরেই ব্যাপার বুঝেছেন। হাসি চাপার চেষ্টায় মুখে আঁচল চাপা দিয়েছেন।

মোহিনী সরকার তাঁর স্ত্রীর দিকে ফিরলেন। গম্ভীর আদেশের সুরে বললেন, চলো—

সোমা ব্যস্ত।—ও কি, বসুন!

—বসব! ওঁর নামে আমি ক্রিমিন্যাল কেস আনব—নাম ভাঁড়ানোর মজাখানা উনি টের পাবেন।

সোমা হেসে বললেন, বেশ আনবেন। এখন তো বসুন।

বিভা সরকারের মুখে রাগ-বিরাগের কোনো চিহ্নই নেই। দেখলে মনে হবে হঠাৎ যেন তিনি এক নতুন জগতে ঢুকে পড়েছেন। সেই

উত্তেজনায় দাঁড়াতেও পারছেন না। একটা চেয়ারে বসে পড়লেন। দ্বিতীয় চেয়ারের দিকে এগোতে এগোতে মোহিনী সরকার বললেন, হ্যাঁ মশাই এতগুলো দিন দিব্বি নিজেকে খোকা গাঙ্গুলি বলে চালিয়ে দিলেন ?

মহাদেববাবুর শুধু ঠোঁটের কোণে একটুকরো হাসি। জবাব দিলেন, মা গঙ্গার সেই আশীর্বাদে আমার অদৃষ্টখানা দেখুন—সত্যি বললেও সেটা মিথ্যে হয়ে যায়। ওই নামটাও মিথ্যে নয়, বাপ-মায়ের আদরের নাম।

—আমরা তো আপনার বাপ-মা নই, আমাদের কাছে ওই আদরের নাম চালানোর অর্থ কি ?

ইজি-চেয়ারে শরীরটাকে আরো একটু শিথিল করে জবাব দিলেন, প্রাণের দায়ে মশাই, প্রাণের দায়ে। এখানে একটা কলেজ আছে জানি, আর এসে জানলাম বড় একটা পাবলিক লাইব্রেরি আছে—আর অন্যদিকে দেয়ালেরও কান আছে। তাই এখানে এসেই আমি খোকা গাঙ্গুলি।

মোহিনী সরকার জিজ্ঞেস করলেন, কলেজ আর লাইব্রেরি আছে তাতে কি ?

—এরা থাকা মানেই সাহিত্যিক শিকারের ফাঁদ পাতা—সাহিত্য সভা—সাহিত্য মিটিং—হরিব্‌ল্'।

—আর এখন যদি আমরাই খবর দিয়ে দিই ?

—প্রাণে মারা যাব। ওঁর (স্ত্রীকে দেখিয়ে) সেই মূর্তি আপনারা দেখতে পারবেন ?

সোমা গাঙ্গুলি হাসতে হাসতে বললেন, বসুন, চা আনি।

মোহিনী সরকার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন।—দাঁড়ান।

নিজেই গটগট করে ভিতরের ঘরে ঢুকে মোড়াটা এনে পেতে দিলেন।—বসুন। এখানে চা নয়। যে ভাঁওতবাজি ইনি আমাদের সঙ্গে করেছেন, আপনিও চুপ করে থেকে ওঁর অ্যাকসেসরি হয়েছেন, তার জের আপনাদের সামলাতে হবে। আমার রায় আমি পরে

দিচ্ছি। তাছাড়া আমার আবার না ডাক্তারের কাছে ছুটতে হয়, ইনি কে জানার পর আমার স্ত্রীর কথা বন্ধ হয়ে গেছে। যাক, আগে আপনি বলুন—

নিজের চেয়ার টেনে নিয়ে আবার মহাদেব গাঙ্গুলির মুখোমুখি।—আপনার মিথ্যের ব্যবসাটা তাহলে এই ?

মহাদেববাবু অম্লানবদনে সায় দিলেন। এই।

বিভা সরকারের এতক্ষণে জিভ নড়ল।—আপনি এত বড় স্রষ্টা বলেই নিজের সৃষ্টিকেও অনায়াসে মিথ্যে বলতে পারছেন।

মোহিনী সরকার মন্তব্য করলেন, বাঁচা গেল, ডাক্তারের কাছে যেতে হবে না। সোমাকে বললেন, ওঁর এখনকার কথার মধ্যে কেবল সুপারলেটিভ ডিগ্রিটা লক্ষ্য করে যাবেন!

সোমা হেসেই বললেন, আপনিও তো ওঁর পিছনে কম লাগেন না দেখি। উনি বুঝি গল্প-উপন্যাস পড়তে খুব ভালবাসেন ?

—মুখ দেখে বুঝে নিন। তবে গল্পকার ও ঔপন্যাসিক মাত্র দুই একজনকে মারাত্মক ভালবাসেন। এখন আমিই ওঁকে নিয়ে কলকাতায় সরে পড়ব কিনা ভাবছি।

মহাদেব গাঙ্গুলি গুরুগম্ভীর গলায় বলে উঠলেন, কি ভাগ্য—কি ভাগ্য!

মহিলারা দু'জন কেবল হাসছেন। মোহিনী সরকার ভদ্রলোকের দিকে ফিরলেন।—এই বছর তিনেক আগে আপনাকে একবার কলকাতার রোটারি ক্লাবে আনা হয়েছিল ?

একটু ভেবে মহাদেববাবু জবাব দিলেন, হয়েছিল।

—আপনি সেদিন অ্যাংরি জেনারেশন আর জেনারেশন-গ্যাপ সম্পর্কে বলেছিলেন ?

আবারও ভেবে জবাব দিলেন, হবে...।

—হবে না। আমি রোটারিয়ান, সেদিন উপস্থিতও ছিলাম। চেনা-চেনা মনে হতেও চিনতে পারি নি, কারণ উনি (সোমা) ঠিক কথাই বলেছিলেন—আপনার ওই অসুখ আপনার কতটা খেয়েছে

দিয়েছে এখন বুঝতে পারছি। যাক, রোটারি থেকে ফিরে আমার স্ত্রীকে আপনার কথা বলতে উনি টানা তিন দিন অভিযোগ করেছিলেন, কেন কিছু একটা ব্যবস্থা করে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল না।

মহাদেব গাঙ্গুলি আবার বলে উঠলেন, ভাগ্য—ভাগ্য।

এবারে জোরালো অনুযোগের সুরে বিভা সরকার বললেন, কিন্তু আমাদের তো আপনি দুর্ভাগ্যের দিকেই ঠেলে দিয়েছিলেন। আপনার লেখা পড়ে মনে হয় মানুষের জন্য আপনার কত মমতা, কিন্তু নিজে কত নির্মম হতে পারেন তার প্রমাণ পেলাম। আজ এই খাম ক'টা ওঁর হাতে না পড়লে আমরা জানতেও পারতাম না কার সঙ্গে এত দিন ঘুরলাম বেড়ালাম কথা কইলাম। এ কথা মনে হতে এখন আপনার ওপর আমার রাগই হচ্ছে।

জবাবে মহাদেববাবু আবার একটা ভারী নিঃশ্বাস ছেড়ে শুধু বললেন, বেচারা খোকা গাঙ্গুলি।

গম্ভীর মুখের যে কৌতুক এতদিন এমনি ভালো লাগছিল এখন সেটা দ্বিগুণ ভালো লাগছে দু'জনেরই। মোহিনী সরকার এবার হুকুমের সুরে সোমাকে বললেন, দশ মিনিট সময় দিলাম, এর মধ্যে রেডি হয়ে আসুন।

সোমা বললেন, দাঁড়ান, আগে চা হোক, ওঁরও এখন পর্যন্ত জোটেনি।

—নো টি! মোহিনী সরকারের বিচারের মুখ।—এখন আপনারা দু'জনেই আমাদের আসামী—আমাদের খুশিমতো আমরা আসামী ধরে নিয়ে যাব। চটপট রেডি হোন।

সোমাই জিজ্ঞেস করলেন, কোথায়?

—আগে ঠিক ছিল এখানে এসে আপনাদের নিয়ে বেড়াতে বেরুব। বেড়িয়ে আপনাদের আমার বাড়ি নিয়ে যাব, কারণ সেখানে আপনাদের রাতের ডিনার রেডি থাকবে—

মহাদেব গাঙ্গুলি তাঁর বলার মাঝে গুরুগম্ভীর আর্তনাদ করে উঠলেন, যাঃ কলা, এখন সেটা বাতিল নাকি?

বিভা সরকার হেসে উঠলেন। মোহিনী সরকার বললেন, না, আজ বেড়ানো বাতিল—এক্ষুনি আমাদের বাড়িতে আপনাদের হাজত-বাস, রাতেও ফিরতে পারছেন কিনা সন্দেহ। স্ত্রীর দিকে ফিরে গলা খাটো করলেন, কেমন, জাঁদরেল লেখকের সঙ্গে কথাবার্তা সমান তালে হচ্ছে তো?

জবাব মহাদেববাবুই দিলেন, বললেন, বেশ হচ্ছে। কিন্তু নিয়ে গিয়ে তারপর উত্তরপ্রদেশ থেকে মধ্যপ্রদেশ পর্যন্ত শান্তির ব্যবস্থাটা কেমন হবে?

প্রশ্নটা হঠাৎ না বুঝে মোহিনী সরকার থতমত খেলেন একটু। তারপর জোরে হেসে উঠলেন।—মুখ থেকে পেট পর্যন্ত শাস্তির ব্যবস্থা?…তা ভালোই হবে। ইংরেজি, বাংলা দু'রকমেরই শাস্তির আয়োজন। মোচার কাটলেট পাবেন আবার চিকেন কাটলেট পাবেন, ফ্রায়েড পোটাটো পাবেন ফ্রায়েড ফিশও পাবেন, ভাত পাবেন ফ্রায়েড রাইসও পাবেন, মাছের কালিয়া পাবেন চিকেন কারিও পাবেন, কাস্টার্ড পাবেন আবার রসগোল্লাও পাবেন—

—ব্যস ব্যস ব্যস, আমি রসের অতলে মানে রসাতলে চলে যাচ্ছি! স্ত্রীর দিকে ফিরে তাড়া দিলেন, কই, ওঠো না শিগ্‌গির। এত শাস্তি কি একবারে সহ্য করতে পারব—এখন থেকেই শুরু হোক। শিগ্‌গির যাও, আর দেরি কোরো না।

বাংলোয় পা দিয়ে এইদিন মোহিনী সরকার সোজা তাঁদের শোবার ঘরে নিয়ে এলেন। সামনে বইয়ের তাকে তিনটে মোটা বই, আর তিনটে বিপুল আকারের পূজাসংখ্যা। তিনটে বইয়েরই লেখক মহাদেব গাঙ্গুলি। একটা শ্রেষ্ঠ গল্পের সংকলন, একটা লেখকের নির্বাচিত গল্পগুচ্ছ আর একটা হালের ছাপা পরিপুষ্ট আকারের উপন্যাস। এবারের ওই পূজাসংখ্যা তিনটেতেও মহাদেব গাঙ্গুলির তিনখানা উপন্যাস আছে। মোহিনী সরকার বললেন, তাহলে বুঝুন আমার গৃহিণীর হৃদয়ে আপনার জায়গাটি কোথায়।

বিভা সরকার প্রতিবাদ করলেন, কেন, তুমি পড়ো না?

মোহিনী সরকার জবাব দিলেন, পড়তে হয়। কারণ আলোচনা যখন হয় তখন আমি তোমাকে বিপাকে ফেলার মতো তবলচির কাজ করি। যেমন ধরো ওই পূজাসংখ্যাটায় ওঁর এবারের উপন্যাস 'দ্বিতীয় বাসর' পড়ে আলোচনায় আমি তোমাকে যে-রকম কোণ-ঠাসা করেছিলাম, যার ফলে তুমি একেবারে দাম্পত্য কলহের পর্যায়ে চলে গেছলে।

বিভা সরকার তক্ষুনি তাঁকে সামলাবার জন্য ব্যস্ত।—থাক থাক, আমি ঠিক জানি তুমি সব ছেড়ে ওঁর এই লেখাটা নিয়েই পড়বে। লেখকের দিকে ফিরলেন, ওকালতি করে করে লোকের কেবল ছিদ্রি বার করতেই শিখেছে—বুঝলেন?

—বুঝলাম। মহাদেববাবু গম্ভীর মুখে সায় দিলেন।—কিন্তু আমাদের তো বিকেল থেকেই শাস্তি শুরু হবার কথা ছিল!

সাহিত্য-বিতর্ক আপাতত চাপা পড়ে গেল। চা আর পরিপাটি জলখাবার সহযোগে গল্পে-গল্পে শীতের ছোট বেলা পার। সন্ধ্যার একটু পরেই মোহিনী সরকার মহাদেববাবুর কানে কানে কি বলতে তিনি মুখখানা এমন করলেন যেন দুনিয়ার সব থেকে বড় সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। বলে উঠলেন, নিশ্চয় নিশ্চয়, আপনার নিখুঁত আতিথেয়তা নিয়েই আমাকে কিছু লিখতে হবে—বিকেলে মধ্যপ্রদেশে যা চালান গেছে একটু ওষুধ না পড়লে রাতে ওর ওপর আবার চাপাব কি করে। আপনার বিবেচনার জয় হোক।

অন্য দুই মহিলা সঙ্গে সঙ্গে বুঝলেন ব্যাপারখানা। বিভা সরকার ঈষৎ বিব্রত মুখে সোমা গাঙ্গুলির দিকে তাকালেন একবার, তারপর সকোপে স্বামীর দিকে ফিরলেন।—আজ খুব সুবিধে পেয়ে গেছ, না?

মোহিনী সরকার বললেন, অতিথির দরকার কিনা খোঁজ নিলাম। ...তুমি সঙ্গ দাও তো আমি ছোঁবও না। লেখকের দিকে ফিরলেন, গৃহিণী ডাক্তার হলে যে কি বিপদ মশাই আপনিও তো নিশ্চয় জানেন। ডাক্তার পরোয়ানা দিয়েছে, একটু-আধটু চলতে পারে, তাতে হার্টের

ক্ষতি হবার কোনো আশংকা নেই। কিন্তু ওঁর বিশ্বাস সাংঘাতিক ক্ষতি হবার আশংকা, আমি ঘুষ দিয়ে ডাক্তারকে বশ করেছি। সঙ্গে আছে অথচ নির্জলা রাত কাটছে। যাক, অতিথির দরকার যখন কি আর করা যাবে ?

বিভা সরকার মাথা নেড়ে সোমাকে দেখালেন, ওঁর পারমিশন না হলে দেব না।

সোমা গাঙ্গুলি হেসে ফিরে বললেন, আপনার কি ধারণা, উনি আমার কথায় ওঠেন-বসেন ?

বিভা হালকা জবাব দিলেন, আপনাদের সঙ্গে আলাপ হওয়ার আগে পর্যন্ত তাই কিন্তু ভাবতাম। এখন দেব কিনা বলুন—

—ক'টা দেবেন আগে কড়ার করে নিন।

বিভা সরকার হাসিমুখে মহাদেববাবুর দিকে তাকালেন। জবাবে তাঁর সীরিয়াস মুখ।—খেলে উনি আমাকে দুটোর বেশি খেতে দেন না, আজ মনে হচ্ছে, তিনটেতে আপত্তি করবেন না।

বিভা সরকার বলে উঠলেন, ওঁর কিন্তু দুটোর বেশি কখ্খনো চলবে না। দুটোতেই দেখবেন কেমন স্পষ্ট বক্তা হয়ে উঠেছেন।

মহাদেববাবু সায় দিলেন, দুটোর বেশি চলার দরকার নেই তাহলে। প্রথমে ওঁকে একটা পুরো দেবেন, পরের দুটো হাফ হাফ।

বিভা সরকার উঠে হুইস্কির বোতল গেলাস আর জল এনে সামনে রাখলেন। বিলিতি জিনিস দেখে কর্তার দিকে চেয়ে মহাদেববাবু মন্তব্য করলেন, উকিল না হয়ে আপনার ওমর খৈয়াম হওয়া উচিত ছিল—ঘাটশিলায় বিলিতি জিনিস! স্ত্রীর দিকে ফিরলেন, ও-গো, তুমি কি তিন'টাকে চার করতে পারমিশান দেবে ?

সোমা গাঙ্গুলি বললেন, আমার তিনেই আপত্তি।

—থাক থাক, তাহলে আর চা-রে কাজ নেই।

প্রথম দফা শুরু হতে নিজের গেলাসে বারকয়েক ছোট ছোট চুমুক দিয়ে মহাদেববাবু একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলে স্ত্রীর কথাই সমর্থন করলেন যেন। সীরিয়াস মুখ করে বললেন, বেশি না খাওয়াই

ভালো।…একবার এক ভদ্রলোক বার থেকে বেরিয়ে নিজের গাড়িতে উঠে হাঁ। ড্রাইভ করবেন কি, তাঁর স্টিয়ারিং, ব্রেক, অ্যাক-সেলারেটর, ক্লাচ, ড্যাশবোর্ড—সব কিছু চুরি হয়ে গেছে। তক্ষুনি নেমে ছুটে গিয়ে তিনি ওই বার থেকেই পুলিশে ফোন করলেন। এমন তাজ্জব চুরির কথা শুনে পুলিশও পাঁচ মিনিটের মধ্যে ছুটে এলো। এসে দেখে স্টিয়ারিং-এ হাত দিয়ে ভদ্রলোক বিমর্ষ মুখে বসে আছে। তারা উঁকি দিয়ে দেখল, কিছুই চুরি যায় নি। সবই ঠিক আছে। তখন তারা রেগে আগুন। ভদ্রলোক তখন বললেন, আমার সত্যি একটু ভুল হয়ে গেছে, তখন আমি ভুল করে পিছনের সীটে উঠে বসে-ছিলাম…।

সকলকে ছাড়িয়ে মোহিনী সরকার হা-হা শব্দে হেসে উঠলেন। বললেন, আপনি তাহলে সর্বদা অত সীরিয়াস গল্প লেখেন কেন মশাই—হাসির গল্প লিখলে তো এর থেকে ঢের বেশি ভালো করতেন।

শুনেই মহাদেববাবু দস্তুরমতো গম্ভীর। একচুমুকে গ্লাসের বাকিটুকু শেষ করলেন। বিভা সরকারের দিকে তাকাতে তিনি উঠে দ্বিতীয় দফা তাঁর গেলাস সাজিয়ে দিলেন। দেখাদেখি মোহিনী সরকারও চট্‌পট্ তাঁর গেলাস শেষ করে ওটা সামনে এগিয়ে দিলেন। বিভা সরকার তাঁকে মেপে অর্ধেকই দিলেন।

নিজের গেলাসটা তুলে নিয়ে মহাদেব গাঙ্গুলি আগের কথার জের টেনে মোহিনী সরকারকে জিজ্ঞেস করলেন, সীরিয়াস গল্প বলতে একটা নমুনা দিন।…দ্বিতীয় বাসর ?

দ্বিতীয় গেলাস হাতে নেবার পর মোহিনী সরকারেরও ভিতর চাঙ্গা একটু। জবাব দিলেন, তা তো বটেই, ওটা আপনার সীরিয়াস উপন্যাসের সব থেকে অসার নমুনা—

বিভা সরকার বলে উঠলেন, তখনই বলেছিলাম এসব খেলে—

একটা হাত তুলে মহাদেব গাঙ্গুলি তাঁকে থামিয়ে দিলেন। গেলাসে একবার চুমুক দিয়ে ওটা সামনে রাখলেন। পলকা গম্ভীর চাউনি মোহিনী সরকারের মুখের ওপর।—দ্বিতীয় বাসর আপনি মন দিয়ে পড়েছেন ?

—পড়েছি।

—'দ্বিতীয় বাসর গাঁজাখুরি' পড়েছেন ?

—তা-ও পড়েছি।

—কোন্‌টা আগে পড়েছেন ?

মোহিনী সরকার একটু আমতা-আমতা করার ফাঁকে বিভা সরকার জানান দিলেন, 'দ্বিতীয় বাসর গাঁজাখুরি' পড়েই তো আমাকে জব্দ করার জন্য তাড়াতাড়ি ওই পূজাসংখ্যাটা নিয়ে বসেছিলেন।

'দ্বিতীয় বাসর গাঁজাখুরি' একজন রূঢ় অথচ নামী সমালোচকের সমালোচনার হেড-লাইন। একে একে তিনি এবারের নামী লেখকদের লেখা নিয়ে একটা নামকরা কাগজে আলোচনা করেছেন। প্রথমেই মহাদেব গাঙ্গুলির 'দ্বিতীয় বাসর' নিয়ে পড়েছেন আর বাস্তবশূন্যতার তীক্ষ্ম মন্তব্য করে হেড-লাইন দিয়েছেন, 'দ্বিতীয় বাসর গাঁজাখুরি'।

নিজের গেলাসে আর একটা চুমুক দিয়ে মহাদেব গাঙ্গুলি বললেন, বেশ।...পূজাসংখ্যায় কিছুটা তাড়াহুড়োর মধ্যে লিখতে হয়, কি লিখেছি না লিখেছি মনেও থাকে না। নিজেকে ডিফেণ্ড করতে হলে গল্পটা আগে ভালো করে মনে পড়া দরকার। 'দ্বিতীয় বাসরে' কি আছে আপনি ছোটর ওপরে বলতে পারবেন ?

চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার মতো করে মোহিনী সরকার জবাব দিলেন, নিশ্চয় পারব।

—বলুন তাহলে। আমার বক্তব্য পরে।

পরিবেশ জমে উঠেছে। মোহিনী সরকার মাঝে মাঝে গেলাসে চুমুক দিয়ে যা বললেন, সংক্ষেপে 'দ্বিতীয় বাসর'-এর কাহিনী মোটামুটি তাই। এবং সেটা এইরকম।

—দু'টি গ্রামের ছেলেমেয়েকে নিয়ে গল্প। ছেলেটি জগৎ মিত্র। কাছাকাছির শহরের কলেজ থেকে বি এ পাশ করে তিন বছর যাবৎ কলকাতার এক বে-সরকারী অফিসে চাকরি করছে। বয়েস চব্বিশ। চাকরি করলেও গান তার ধ্যানজ্ঞান। কলেজে পড়তে ছাত্রমহলে তার গানের সুনাম হয়েছিল। কলকাতার ছোট, মাঝারি, বড়

আধুনিক গানের আসরেও ইদানীং তার ডাক পড়ছে। রেডিওর চান্স পাচ্ছে। তার গাওয়া এক ছবির দুটো গান রীতিমতো হীট করেছে। জগৎ মিত্র আশা করছে, শিপ্‌গিরই আর তার চাকরি করতে হবে না। কারণ গানের রোজগার আশাতিরিক্ত বাড়ছে।

মেয়েটির নাম রত্না। একই গাঁয়ের মেয়ে। বন্ধু ছিল, মিত্র হয়েছে। সে-ও ওই কাছাকাছি শহরের আত্মীয়ের বাড়িতে থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেছিল। চেনা-জানা ঘব, জগৎ মিত্রের অথর্ব বাবার আগে থাকতে মেযেটার ওপর চোখ ছিল। ছেলে চাকরিতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে। এই বিয়েতে প্রেমট্রেমেব কোনো ব্যাপার নেই। মেয়েটাকে রূপসী না বললেও বেশ সুশ্রীই বলতে হবে। তাব বয়েস উনিশ। সে গ্রামে থেকে প্যাবালিটিক শ্বশুরেব পরিচর্যা করে। বৃদ্ধ ভদ্রলোক এই চঞ্চল বউটিকে দারুণ ভালবাসেন। তাঁব শাসন নেই বলেই রত্নার আচবণ গাঁয়ের বউয়েব মতো নয়—শ্বশুরেব আদুরে মেয়ের মতো। শ্বশুরের সেবা-যত্ন করে, পুকুরে সাঁতার কাটে, ওর থেকে বয়সে ছোট ছেলেমেয়েদের ধরে ধরে চোবায়, দুপুরে নিরিবিলি পেয়ারা, কুল, আতা, জামরুল গাছে ওঠে, নয় তো এক মাইল দূরের বাপের বাড়িতে টহল দিয়ে আসে। প্রত্যেক শনিবারের বিকেলে জগৎ আসে, সোমবার খুব ভোরে চলে যায়। এই শনিবারটার জন্য রত্না যে উন্মুখ হয়ে থাকে জগৎকে তা বুঝতে দেয় না। দুষ্টুমি মাথায় চাপলে সে আসার পর বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত শ্বশুরকে নিয়ে বা রাঁধা-বাড়া নিয়ে এমন ব্যস্ত থাকে যে, জগৎ তাকে ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে পায় না। ফলে তার রাগ হবেই। সে অন্য পাশ ফিরে চুপচাপ শুয়ে থাকে। কিন্তু রত্নার রাগ ভাঙানোর রীতিটাও আসুরিক। সুড়সুড়ি দেবে, কথা না বলে খুনসুড়ি করবে, তারপর একসময় জগৎকে জাপটে ধরে খাটেই গড়াগড়ি খাবে। জগৎ তখন ছাড়াতে চেষ্টা কবেও পারে না। তবু রাগ দেখায়। বলে, সামনের শনিবার আমি আসছি না—

রত্না বড় বড় চোখ করে বলে, তুমি হলে গিয়ে আমার জগৎ। না এলে তো অন্ধকার দেখব।

—অন্ধকার দেখবে। তাহলে এতক্ষণ কি হচ্ছিল?

রত্না হেসে গড়িয়ে জবাব দেয়, এতক্ষণ জগৎ-এর সঙ্গেই বসকরা হচ্ছিল।

এর পরে আর রাগের আয়ু কতক্ষণ? গুনগুন করে অন্তত চার-পাঁচখানা গান শোনাতে হয়। জোরে গাওয়ার উপায় নেই, বাবার ঘুম ভেঙে যাবে কলকাতায় কবে কোথায়, কি গাইল সেই গল্প করে। মাসের রোজগারের বাইরে গানের কল্যাণে কত বাড়তি রোজগার হল বলে। আর, আরো কিছু রোজগার বাড়লে কলকাতায় বাসা ঠিক করে রত্নাকে আর বাবাকে নিয়ে যাবার কথাও বলে। রত্না সাগ্রহে শোনে, কিন্তু রুগ্ন শ্বশুর যে গাঁয়ের বাড়ি ছেড়ে আর কোথাও যাবে না তাও জানে। আর এত সুন্দর জায়গা ছেড়ে ওর নিজেরও দু'খানা খুপরির মধ্যে গিয়ে উঠতে কেমন লাগে সে সন্দেহও আছে।

জগৎ-এর ইচ্ছা ছিল, বউ কলেজে পড়ুক। ফার্স্ট ডিভিসনে ম্যাট্রিক পাশ করেছে, কলেজে পড়লেও খারাপ রেজাল্ট করবে না নিশ্চয়। কিন্তু শ্বশুরের দোহাই দিয়ে রত্না সে-প্রসঙ্গ এড়াতে চেষ্টা করে। আসলে দিব্যি আনন্দে আছে, এর মধ্যে আবার পড়াশুনার ঝামেলার মধ্যে কে ঢোকে। জগৎ প্রাইভেটে আই. এ পরীক্ষা দেবার জন্য তাকে তৈরী হতে বলে। রত্না তখন তাকে কাজের যে ফিরিস্তি দেয়, তাতে পড়াশুনা ছেড়ে কারো নিঃশ্বাস ফেলারও সময় হবার কথা নয়।

এই সুখের দিন হঠাৎ ফুরালো।

তার সূচনাও আকস্মিক। কলকাতার সমস্ত অফিসের কর্মচারীরা হঠাৎ একদিনের ধর্মঘটে নেমেছিল। তাঁদের মিছিলে জগৎকেও টেনে নামানো হয়েছিল। সেটা একচল্লিশ সাল। স্বাধীনতার দাবি বা ইংরেজ শাসনের কোন-না-কোন অন্যায় উপলক্ষে কলকাতায় তখনও

মিছিল লেগেই ছিল। অভিযোগ অন্য কোন্ অফিসের একজন কর্মচারীকে ইংরেজের পুলিশ ঠেঙিয়ে মেরে ফেলেছে। তাই সমস্ত অফিসের কর্মচারীদের পরদিন অফিস বয়কটের ডাক। একে যুদ্ধের সময় সেটা। দু'-পক্ষই মারমুখী। সরকার ট্রাম-বাস গাড়ি চলাচল বন্ধ হতে দেয়নি। অন্যদিকে এই বিশাল মিছিলও পথ আগলে মনুমেন্টের দিকে এগোচ্ছে। ফলে রাস্তা জ্যাম্। ট্রাম, বাস, মোটর, লরির লম্বা জট। এক জায়গায় মিছিলও দাঁড়িয়ে গেছে, ওগুলোও। জগৎ মিত্র কেটে পড়ার তাল খুঁজছিল। এক্ষুণি হয়তো পুলিশ এসে কাঁদানে বোমা ছুঁড়বে আর লাঠিপেটা করে মিছিল ভেঙে দিতে চাইবে।

এই সময় পাশের একটা গাড়ির দিকে দু'চোখে আটকে গেল। পিছনের সীটে একটি মেয়ে বসে আছে, বছর একুশ হবে বয়েস। মেয়েটির চোখে বড়-সড একটা সানগ্লাস। একটু লালচে চুল, বেশ ফর্সা। গাড়ি এভাবে আটকে যাওয়ার দরুন মুখে রাজ্যের বিরক্তি। জগৎ হাঁ করে তাকেই দেখতে লাগল। মেয়েটা তার পাশেই দু'হাতের মধ্যে।

সেই মেয়েও দেখল তাকে। বার কয়েকই দেখল। দেখছে যে, সানগ্লাসের দরুন জগৎ সেটা বুঝতে পারল না। নইলে অমন বোকার মতো চেয়ে থাকত না।

মেয়েটা হঠাৎ একঝটকায় সানগ্লাসটা খুলে ফেলে মুখটা গাড়ির জানালা দিয়ে একটু বার করে দু'চোখ টান করে তার দিকে চেয়ে রইল। রাগত মুখের ভাবখানা, কত দেখবে দেখো, খুব ভালো করে দেখো! এই যাদের স্বভাব তারা আবার পথ আগলে দেশ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে!

জগৎ হঠাৎ এত ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল যে, মেয়েটা একটু বাদে ফিক্ করে হেসেই ফেলল। আর কথা নেই। জগৎ এদিক-ওদিক চেয়ে হঠাৎ লাইন থেকে সটকান। গাড়িটার পাশ দিয়ে পালানোর সময় মেয়েটা জোরেই হেসে উঠল। জগৎ-এর দু'কান গরম। এদিকের ফুটপাথে উঠে ঘুরে তাকালো। মজা পেয়ে মেয়েটা এদিকের জানলায়

সরে এসো। আর সোজা ওর দিকে চেয়েহ হাসতে লাগল। জগৎ হনহন করে উল্টো দিকের রাস্তা ধরল।

মেয়েটার ওই হাসি আর ওই চাউনি ওর গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিল। অন্যদিকে আত্মাভিমানও চাড়িয়ে উঠতে লাগল। আগামী দিনের কতবড় এক গায়ক ঐ মিছিলে দাঁড়িয়েছিল মেয়েটা যদি জানত, আক্কেল হত। মেসে ফিবে কল্পনায় আক্কেল হওয়ার ছবিটা ধরতে চেষ্টা করল। করে প্রতিশোধ নিতে পারার আনন্দ পেতে চেষ্টা করল। শেষে কলম নিয়ে বউকে চিঠি লিখতে বসল। সেটা সবে সোমবার, শনিবার পর্যন্ত ঘটনাটা পেটে চেপে রাখা কঠিন।

লিখে সেই দুপুরেই পোস্ট করে দিল।

তার ঠিক দু'দিনের মধ্যে সত্যিই এক বিচিত্র যোগাযোগ। বালিগঞ্জের এক বড়লোক বন্ধুর জন্মদিন উপলক্ষে নেমন্তন্ন খেতে গেছল। জগৎ মিত্র সেখানে মাননীয় অতিথি। তার সোলো গানের আসর হবে। বন্ধুব বায়না অন্তত দশখানা গাইতে হবে। গাড়ি পাঠিযে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেই গাড়িতে জগৎ তার হারমোনিয়াম নিয়েছে। তবলচি বন্ধুই জোগাড় করে রেখেছে। রেডিও আর্টিস্ট, কয়েকটা গান রেকর্ড হয়েছে, দু' দুটো গান ছবিতে সুপারহীট—এমন ছোট আসরে দারুণ খাতির কদর হবে না কেন?

ছেলের থেকে মেয়ের ভিড়ই বেশি। তাদের মুখে মুখে বায়না এটা গান, ওটা গান। এক-একটা গান শেষ হলেই আবার বায়না। পাঁচখানা গান গাওয়ার পর ষষ্ঠ গান সবে শুরু করবে, সামনের মেয়ে পুরুষদের ঠেলে সরিয়ে যে মেয়েটি সামনে এসে দাঁড়ালো তাকে দেখেই জগৎ-এর দু'চক্ষু স্থির। মিছিলের রাস্তার সেই মোটরগাড়ির মেয়ে। কল্পনার প্রতিশোধ যে এমন বাস্তব হয়ে উঠতে পারে ভাবা যায় না।

মেয়েটি খুব সপ্রতিভ মুখে বলল, আমার নাম সুমিত্রা চৌধুরী—আমি আপনার এখানকার বন্ধুর স্ত্রীর বন্ধু। আচ্ছা, আপনাকে আমি খুব শিগ্‌গিরই কোথায় দেখেছি বলুন তো—দেখেছি ঠিক, কিন্তু মনে করতে পারছি না।

একটু দম নিয়ে জগৎ বলল, তরশুদিন দুপুরে রাস্তায় মিছিলে দেখেছিলেন···আপনি গাড়িতে বসে ছিলেন, আমি আপনার পাশেই মিছিলে ছিলাম।

শোনার সঙ্গে সঙ্গে এবারে আকাশ থেকেই পড়ল সুমিত্রা চৌধুরী। —এই খেয়েছে। আমি কার সঙ্গে কি ব্যবহার করেছি! তাই তো —আপনিই তো সেই—মিছিল ছেড়ে একেবারে ছুটেই পালিয়ে গেলেন। ছি ছি ছি, আচ্ছা আপনার গান শেষ হোক, তারপর ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

জগৎ আবার গান ধরল। এমন মনপ্রাণ ঢেলে আর কখনো গেয়েছে কিনা জানে না। একে একে আরো চারখানা গান। সকলে বাহবা বাহবা করে উঠল। খাওয়ার পরে সুমিত্রা চৌধুরী এসে ধরল তাকে।—চলুন, আমার বাড়ি একবারটি যেতে হবে।—এই কাছেই।

জগৎ মিত্র বলল, আজ থাক, সঙ্গে হারমোনিয়াম আছে, গাড়ি না পেলে অসুবিধে হবে।

কানেই তুলল না। বলল, আপনার হারমোনিয়াম অলরেডি আমি আমার গাড়িতে তুলিয়েছি—ওটা আর তার মালিককে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা হবে। আসুন, ছাড়া পাচ্ছেন না—সেদিনের কাণ্ড আমি বাড়ি এসেই বাবা-মাকে বলেছিলাম আর হেসে গড়িয়ে ছিলাম—ছি ছি ছি ঃ না জেনে—কি কাণ্ড করেছি বলুন তো!

জগৎ বলল, দোষ হয়তো আমারও কিছু ছিল।

অম্লানবদনে সুমিত্রা চৌধুরী বলল, তা তো ছিলই। মিছিলে দাঁড়িয়ে আপনি ড্যাবড্যাব করে আমাকে দেখছিলেন—আপনি জগৎ মিত্র সেই লোক জানলে তো উল্টে গর্ববোধ করতাম।

জগৎ আরো লজ্জা পেল। তাকে বাড়িতে ধরে নিয়ে গিয়ে সেই মেয়ে এক হৈ-চৈ কাণ্ড বাধিয়ে দিল। কত বড়লোকের মেয়ে বাড়িতে ঢুকেই জগৎ টের পেয়েছে। তকতকে সাজানো-গোছানো সব ঘর, জেল্লা ঠিকরানো আসবাবপত্র। সুমিত্রার বাবা-মায়ের সঙ্গে আলাপ হল। তাঁরাও অমায়িক। আর একমাত্র মেয়ের প্রতি বাবা-মায়ের

অন্ধ স্নেহেরও আঁচ পেল। চাকর দিয়ে হারমোনিয়াম নামিয়ে জোর করে আবার তাকে বসিয়ে দিল—বাবা-মাকে দুটো গান অন্তত শোনাতে হবে।

জগৎ-এর মনে হল, এই মেয়েটার ইচ্ছেতেই যেন জগৎ চলছে। কোনো বাধা মানার বা আপত্তি শোনার পাত্রী নয় সে। দুটো গানের পর বাবা-মায়ের সামনে সে কথা আদায় করতে চাইল, সামনের রবিবার সন্ধ্যায় এখানে আসবে এবং খাবে। কারণ আজ নেমন্তন্ন খেয়ে আসার পরে আর খাওয়ানোর প্রশ্ন ওঠে না। ফাঁপরে পড়ে জগৎ মিত্র বলল, রোববারে আমি কলকাতায় থাকি না, দেশে যেতে হয়।

সুমিত্রার মা জিজ্ঞেস করলেন, দেশে কে আছে তোমার?

—অসুস্থ বাবা। আর কে আছে সেখানে সেটা যে বলা হল না জগৎ মিত্রর ও-বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার পরে মনে হয়েছে।

রবিবার বাদ দিয়ে পরের সোমবার জগৎ এখানে আসবে, গাইবে, গল্প করবে, খাবে কথা দিয়ে তবে নিষ্কৃতি। একেবারে নিষ্কৃতি, ঠিক বলা যায় না। কারণ, সুমিত্রাও তার সঙ্গে এসে গাড়িতে উঠল। মেসে পৌঁছে দিয়ে ফিরবে। তার বাবা-মা আদরের মেয়ের স্বাধীনতায় এতটুকুও কটাক্ষ পর্যন্ত করেন না লক্ষ্য করল।

জগৎ-এর ভালোও লাগছে, আবার বেশ অস্বস্তি বোধ করছে। দু'জনের মাঝখানে চার-ছ' আঙুলও ফারাক নেই, মেয়েটার সেদিকে হুঁশ নেই। মাঝে মাঝে কাঁধে কাঁধ ঠেকছে, ওর তপ্ত নিঃশ্বাস মুখে লাগছে। খুশি মেজাজে সুমিত্রা বকেই চলেছে। এ-রকম এক অদ্ভুত যোগাযোগের ফলে ওর নাকি দারুণ মজা লাগছে। আজকের গানগুলোর প্রশংসা করল, এমনি একখানা রেকর্ড আর ছবির হীট গানের রেকর্ড তার কালেকশান আছে জানালো। আবার কবে নতুন রেকর্ড বেরুবে খোঁজ নিল। ফাঁকে ফাঁকে নিজের কথাও ঘুরিয়ে বলল। বি-এ পাশ করে এবারে এম-এতে ভর্তি হয়েছিল—আর পড়তে ভালো লাগল না বলে ছেড়ে দিল। গান তার দারুণ ভাল লাগে—ওরও ইচ্ছে করে বড় বড় শিল্পীর মতো গাইতে। একজন ওস্তাদ রাখা হয়েছিল,

কিন্তু তিন মাস ধরে সে সা রে গা মা পা ধা নি নিয়ে ওকে এমন নাকানি-চোপানি খাওয়াতে লাগল যে, সুমিত্রা তাকে বিদায় করে বাঁচল। আর শেষে জিজ্ঞেস করল, আপনি সেদিন মিছিলে দাঁড়িয়ে-ছিলেন কেন—চাকরি করেন নাকি?

এত বড়লোকের মেয়ের কাছে সামান্য চাকরির কথা বলতেও লজ্জা। জবাব দিল, এখনো করছি, আর বেশি দিন বোধহয় দরকার হবে না।

—তা তো হবেই না, এরই মধ্যেই যা নামখানা করে ফেলেছেন। জানেন, আপনার বন্ধুর বউ প্রমীলার সঙ্গে আমার এমন কিছু খাতির নেই—ও মনে মনে আমাকে হিংসা করে—কিন্তু আপনি আসছেন খবর পেয়ে ফোন করে নিজে সেধে নেমন্তন্ন নিলুম। তখন কি জানি আপনি—সেই মিছিলের আপনি।

গলির মধ্যে মেসবাড়ি। গাড়ি ঢোকে না। হারমোনিয়ামটা ড্রাইভারকে দিয়ে মেসে পাঠানো হল। দ্বিধা কাটিয়ে জগৎ বলল, মেসবাড়ির যা দশা আপনাকে ডাকতে পারছি না—

—আর ডেকে কাজ নেই। কিন্তু আপনিই বা এ-রকম একটা জায়গায় থাকেন কেন? খুব পয়সা জমাচ্ছেন বুঝি?

—না···দেখেশুনে উঠে যাব ভাবছি কিন্তু সময় হয়ে ওঠে না।

তার অফিসের ফোন নম্বর লিখে নিয়ে আর সোমবার রাতের কথা আবার মনে করিয়ে দিয়ে সুমিত্রা চলে গেল। জগৎ মিত্রর মনে হল একঝলক বিদ্যুৎ সরে গেল।

পরদিন রত্নার চিঠি পেল। পারতে চিঠি লেখে না। কিন্তু মিছিলে এক মেয়ের কাছে হেনস্তার খবর জেনেই লিখেছে নিশ্চয়। তাই। ছোটর ওপর সুন্দর চিঠি।—তোমার চোখের ভাষায় নিশ্চয় কিছু ছিল। নইলে অচেনা অজানা ভদ্রলোকের মেয়ে ও-রকম করতে যাবে কেন? যাক, ওতেও যদি তোমার শিক্ষা না হয়ে থাকে তাহলে বাকি শিক্ষা আমি দেব। তবে একটু আশ্বাস দিতে পারি, সুন্দরী মেয়ের দিকে তাকানো আমার মতে ছেলেদের খুব বড় অপরাধ নয়।

আর বে-আবরু না তাকালে মেয়েরা সেটা অপছন্দও করে না। তুমি সেই মেয়ের দিকে কিভাবে তাকিয়েছিলে এখানে এসে তার মহড়া দিতে হবে—তবে বিচার করতে পারব। এরপর বাবার সম্পর্কে খুঁটিনাটি খবর। তাঁর শরীরটা নাকি বেশ ভেঙেই পড়ছে।

শনিবারে দেশে যেতে পরের খবর বিস্তারিত শোনার পর রত্না হাঁ একেবারে। তারপর সে কি হাসি। হাসি আর থামতেই চায় না। শেষে বলল, বেচারি সুমিত্রা চৌধুরী—তোমার ঘরে যে বউ আছে তাকে সেটা বললেই না?

—বলার আর চান্স পেলাম কোথায়। সোমবারে নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে বলব।

রত্না সাবধান করল, তাহলে খাওয়ার পরে বোলো, নইলে কপালে কি জুটবে কে জানে।

কিন্তু সোমবার নেমন্তন্ন খেতে এসে জগৎ মিত্রের আবারও দিশেহারা দশা। সুমিত্রা তার একগাদা বান্ধবীকে নেমন্তন্ন করেছে, ডজনখানেক বন্ধুকে নেমন্তন্ন করেছে, সেই সঙ্গে আর যাকে নেমন্তন্ন করেছে তাকে দেখে তো জগৎএর দস্তুরমতো রোমাঞ্চ। এক রেকর্ড কোম্পানীর হর্তা-কর্তা সেই ভদ্রলোক। এদিকে হারমোনিয়াম আর তবলার ব্যবস্থাও করে রেখেছিল। এদিনও গুণে গুণে দশখানা গান হ'ল। রেকর্ড কোম্পানীর ভদ্রলোক প্রশংসা করতেই সুমিত্রা তাকে নিয়ে পড়ল।—মাত্র দু-খানা রেকর্ড কেন ওঁর? শুধু মুখে প্রশংসা করলেই হবে? কবে রেকর্ড করবেন বলুন, আমি নিয়ে যাব।

ভদ্রলোক দিন তারিখ বলার পর রেহাই পেলেন। আর তার পরেও মাঝে মাঝে রেকর্ড করবেন কথা দিলেন।

খাওয়া-দাওয়া সারা হতে এই রাতেও সুমিত্রা তাকে নিজের গাড়িতে পৌছে দিতে এলো। আগের দিনের থেকেও বেশি ঘন হয়ে বসে ফিক করে হেসে বলল, কেমন—মিছিলে ওভাবে জব্দ করার পুরস্কার পেলেন তো? বছরে ক-খানা করে আপনার রেকর্ড করাই এবারে দেখবেন।

জগৎ মিত্র জিজ্ঞেস করল, ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে আপনাদের কি সম্পর্ক ?

—সম্পর্ক আবার কি, উনি চ্যাটার্জি আর আমরা চৌধুরী ক্রিশ্চিয়ান। বাবার সঙ্গে অল্পস্বল্প খাতির ছিল, বাবা নিজে ইন্টারেস্ট নিয়ে ওঁর বাড়িটা খুব কম খরচে করে দেবার পর থেকে আমাদের বাড়ির সঙ্গেই এখন দারুণ খাতির। উনি নিজের ক্ষমতায় ডবল খরচ করেও অত বড় বাড়ি করতে পারতেন না। বাবা বিরাট কণ্ট্রাক্টর জানেন তো ?

জগৎ বলল, আপনাকে কি বলে ধন্যবাদ দেব জানি না।

—হুঃ। শুকনো ধন্যবাদ নিতে আমার বয়ে গেছে। আর শোনো, ওসব আপনি-টাপনি আমার ভালো লাগে না, ক্রম নাও অন উই আর ফ্রেণ্ডস—বুঝলে ?

বোঝার চমকে জগৎ-এর ঘাম ছোটার দাখিল। গলির মুখে নামতে সুমিত্রা মনে করিয়ে দিল, রেকর্ড করার ডেট মনে আছে তো ? ঠিক সময় ধরে গলির বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে, আমি গাড়ি নিয়ে আসব।

জগৎ মাথা নাড়ল। মাথাটা ঝিম-ঝিম করছে। আর ভিতরটাও কি-রকম মোহাচ্ছন্ন। গাড়িতে আজ অনেকবার কাঁধে কাঁধ ঠেকেছে, গায়ে গা ঠেকেছে। ও চলে যাবার পরেও একটা উষ্ণ স্পর্শ যেন তাকে ঘিরে আছে। সেই কারণে প্রচণ্ড অস্বস্তি। কিন্তু তারই তলায় কোথায় একটু লোভও। টের পাওয়া মাত্র নিজের ওপরেই রাগ। মাথা ঝাঁকিয়ে সেটা অস্বীকার করেছে। রত্নাকে সে ভালবাসে দারুণ ভালবাসে।

কিন্তু এবারে দেশে গিয়ে রত্নার অনেক জেরার জবাবে মুখ যদি বা একটু-আধটু খুলল মন খুলতে পারল না। দু-চার কথায় শুধু জানালো, নেমন্তন্ন খেতে গেছল, খুব আদরযত্ন পেয়েছে, অনেকগুলো গানও গাইতে হয়েছে।

এর বেশি আর কিছু বলল না। বলা সহজ নয়। রত্নার তাতে ভুল বোঝার সম্ভাবনা ষোল আনা। তাছাড়া বাবার শরীরটা বেশি খারাপ বলে রত্না বারবার সে-প্রসঙ্গ তোলবারও খুব সময় পেল না।

বাবাকে শহরের ডাক্তার এনে দেখানো নিয়েই বেশি কথা হল। জগৎ একদিন কামাই করে ডাক্তার দেখিয়ে সোমবারের জায়গায় মঙ্গলবার কলকাতায় ফিরল।

টিফিনে সুমিত্রার টেলিফোন। দেশে যাবার আগে ও প্রায় রোজই টেলিফোন করেছে। প্রথম দিনেই জগৎ বলে দিয়েছিল, ফোন করলে যেন টিফিনে করে, সেকশনাল হেড-এর ঘর তখন ফাঁকা থাকে।

—কাল অফিসে আসোনি কেন?

—দেশে বাবার অসুখ বেড়ে যেতে শহরের ডাক্তার এনে দেখাতে হয়েছে।

—এখন ভালো?

—ভালো খুব না।

—সেরে যাবে, ভেব না। পরশু রেকর্ডিং তোমার মনে আছে তো?

—আছে।

—কি গাইবে ঠিক আছে?

—আছে।

—আচ্ছা, দুটো গানেরই এক লাইন করে শোনাও তো।

জগৎ আঁতকে উঠল, টেলিফোনে শোনাব কি।

—আঃ শুধু সুরটা শোনাও না। ঘর তো ফাঁকা?

—হ্যাঁ, তবু এটা ঠিক হবে না…।

ওধার থেকে সুমিত্রা রেগেই গেল, দেখো, আমার মুখ দিয়ে একবার বেরিয়েছে যখন, রেহাই পাচ্ছ না—এক লাইন করে শোনাও।

অগত্যা খুব গলা চেপে এক লাইন করে শোনালো।

—ঠিক বুঝতে পারলাম না কতটা ভালো। আচ্ছা, পরশু আগে গাড়িতে বসে শুনব।

গাড়িতে বসে জোর করেই পুরো দুটো গান শুনল। তার আগে দু-দিকেরই জানলার কাচ তুলে দিয়েছিল জগৎ। তার পরেও চাপা গলায় গেয়েছে। গায়ে গা ঠেকিয়ে বসে প্রায় মুখের কাছে কান এনে সুমিত্রা প্রথম গানটা শুনেছে। শেষ হতেই ধমক।—অমন গলা

চেপে গাওয়ার কি হয়েছে—আচ্ছা নার্ভাস লোক তো। পরেরটা জোরে গাও।

দু-মাস কেটে গেল। জগৎ মিত্রের ভিতরটা সর্বদা অস্থির। এক মুহূর্তের শান্তি নেই। রাত্রে ঘুম নেই। দ্রুততালে সে একজনের দখলের মধ্যে চলে যাচ্ছে বুঝেও যেন অসহায়। সুমিত্রা প্রায় রোজই টেলিফোন করে, দুই-একদিন পরে ঠিক ছুটির মুখে গাড়ি নিয়ে অফিসে আসে, বাড়িতে ধরে নিয়ে যায়, সিনেমায় নিয়ে যায়, নয় তো এমনিই কলকাতার রাস্তায় চষে বেড়ায়। তার চোখে জগৎ মিত্র এক দুর্লভ আবিষ্কার। গানের জগতে তাকে একেবারে সামনের সারির প্রথম দিকে এগিয়ে আনা যেন তারই গুরুদায়িত্ব। কিছুটা এগিয়ে আনতে পারলে আনন্দে আটখানা হয়। না পারলে ফুঁসে ওঠে। যা চায় তা হতেই হবে। যা চায় তা পেতেই হবে। এর মধ্যে কোনো মাঝপথ নেই। আপস নেই। সভায় বা রেডিওতে গাইতে গেলে সে নিজেই আগে থাকতে গাড়ি নিয়ে চলে আসে। রেকর্ড কোম্পানীর—সেই ভদ্রলোককে ধরে আবার দুটো গান রেকর্ড করিয়েছে। যতক্ষণ সুমিত্রা চৌধুরী কাছে থাকে, জগৎ মিত্রর মোহগ্রস্ত দশা। চোখের আড়াল হলে যন্ত্রণা, বিবেকের দংশন। হ্যাঁ, ভালো সে আজও রত্নাকেই বাসে। তার জায়গায় আর কাউকে ভাবতে পারে না। কতবার ভেবেছে, আর না, এবার সুমিত্রাকে বলবে সে বিবাহিত। কিন্তু সুমিত্রা কাছে এলেই সব ভণ্ডুল। বলি-বলি করেও বলতে পারে না। তখন সুমিত্রা যেন কাচের আবরণে একঝলক আগুনের শিখা। সেই কাচে পতঙ্গের মতো মাথা খুঁড়ে মরা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

এই দু-মাসেও প্রতি শনিবার জগৎ বাড়ি এসেছে। বাবার অসুখটা বেশি বাড়াবাড়ির দিকে বলে রত্না একটু ব্যস্ত। জগৎও ব্যস্ত ভাব দেখাতেই চেষ্টা করে। তবু রত্না কিছু পরিবর্তন আঁচ করছে, লক্ষ্য করছে তা-ও টের পায়। পাওয়ার কথাই। ভালো করে রত্নার

দিকে তাকাতে পারে না, আগের মতো কথা বলতে পারে না। রাতে আগে ভাগে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ে। ঘুমের ভান করে পড়ে থাকে। অবশ্য বাবাকে ঘুম পাড়িয়ে ওর ঘরে আসতে বেশ দেরিই হয়। কিন্তু তবু যে-ভাবে রাত কাটে সে-ভাবে কাটার কথা নয়।

গোড়ায় গোড়ায় রত্না জিজ্ঞেস করেছে তোমার কি হয়েছে বলো তো দিন দিন তুমি এ-রকম হয়ে যাচ্ছ কেন?

জগৎ মিত্র তাতেই বিরক্ত—অফিসে নানারকম ঝামেলা শুরু হয়েছে বলেছি না? এরপর শনিবার আসতে পারব কিনা তারও ঠিক নেই।

রত্না একদিন বলেছিল, ঝামেলা তো চাকরি ছেড়ে দাও না—অন্য-দিকের রোজগার তো এখন ভালই হচ্ছে।

জগৎ আরো তেতে উঠেছিল,—যা বোঝো না তা নিয়ে কথা বোলো না। বাবার অসুখ, খরচের অন্ত নেই—চাকরি ছেড়ে বসে থাকলেই হল!

রত্না এখন কিছু বলে না, কিছু জিজ্ঞাসাও করে না। কিন্তু মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ চোখে তাকে লক্ষ্য যে করে হঠাৎ হঠাৎ সেটা টের পায়। জগৎ বেশির-ভাগ সময় অন্যমনস্ক থাকে তারপর হঠাৎ টের পেয়ে ধড়ফড় করে ওঠে।

কলকাতায় সেদিন। সুমিত্রা অফিসে এসে জগৎকে বাড়ি ধরে নিয়ে গেছে। বিকেল থেকে বেশ বৃষ্টি হচ্ছিল। তার মধ্যেই গাড়ি নিয়ে এসেছে। তুলে নিয়ে গেছে। ওদের বাড়ি পৌঁছানোর পরেও অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছে! বিকেলের জল-খাবারের পাট চুকতেই মা-কে বলে দিয়েছে রাতে বিরিয়ানি আর কষা চিকেন খাবে তারা। মুখের কথা খসলেই এখানে সেটা তামিল করা জলভাত। বৃষ্টির বিরাম নেই।

সন্ধ্যার পরে সুমিত্রার বাবাও আড্ডায় যোগ দিলেন। কথায় কথায় হঠাৎ তিনি মেয়েকে বললেন, তোরও তো একসময় বেশ মিষ্টি গলা ছিল, এখনো গুনগুন করে নিজের মনে গান করিস যখন ভালো লাগে—জগৎকে পেয়েছিস যখন পছন্দমতো দুই একখানা গান তুলে নে না।

সুমিত্রা লাফিয়ে উঠল—দি আইডিয়া। একটা গান তুলে নেবার কথা তো আমার অনেকবার মনে হয়েছে। জগৎকে ডাকল, চ'ল এসো, আজই চেষ্টা করা যাক—

তাকে ধরে নিয়ে নিজের ঘরে এলো। তারপর দরজা বন্ধ করল। সামনের জানালাটাও। বলল, যা গলার ছিরি আমার এখন, জানলেই আশপাশের বাড়ির লোক গলা বাড়াবে।

কাছে এসে দাঁড়ালো। খুব কাছে। কপট গম্ভীর।—কি মাইনে দিতে হবে?

জগৎ-এর অজানা অস্বস্তি।—মাইনে আবার কি, হারমোনিয়াম আনো—

—নাঃ, এমনিতে আমি কাউকে খাটাই না।

বলেই আচমকা দু-হাত বাড়িয়ে তাকে বুকে টেনে আনল। তারপর পায়ের আঙুলের ওপর দাঁড়িয়ে উষ্ণ ঘন নিবিড় চুমু খেল একটা।

—হল?

জগৎ তখনো তার বাহুবন্দী। ঠোঁট দুটো জ্বলে যাচ্ছে। তার মুখের অবস্থা দেখে সুমিত্রা খিল খিল করে হেসে উঠল। বলল, তুমি একটা রামভীতু। এতদিন তোমার সঙ্গে যেভাবে মিশেছি, অন্য কেউ হলে ঢের আগেই হাত বাড়াতো। বলার সঙ্গে সঙ্গে আবার চুমু। আবার হাসি। বলল, যতক্ষণ না তুমি খাচ্ছ ততক্ষণ আমি খেয়ে যাব।

জগৎ মিত্র আস্তে আস্তে তার হাত ছাড়িয়ে নিল। মাথা টলছে। শরীর জ্বলছে। বলল, সুমিত্রা একটা কথা তোমাকে অনেকবার বলতে চেষ্টা করেছি। আমি বিবাহিত। দেশে আমার বউ আছে।

সুমিত্রা ছিটকে তিনহাত পিছনে সরে গেল। স্তম্ভিত চোখে দেখল একটু। তারপর চেঁচিয়ে উঠল —কি বললে? তুমি কি?

—বিবাহিত।

—স্কাউনড্রেল! জোচ্চোর! আমি তোমাকে জেল খাটাব। প্রথম দিনেই তুমি মা-কে বলেছিল, দেশে কেবল তোমার বাবা আছেন।

—বাবার অসুখ, তাঁর জন্তেই প্রতি রবিবারে দেশে যেতে হয় বলেছিলাম।

—কিন্তু এত দিনের মধ্যে তুমি বলারই সময় পেলে না ?

এর জবাব কি দেবে—জগৎ মিত্র চুপ।

সুমিত্রা তার খাটে বসল। রাগে সমস্ত মুখ লাল। দু-চোখে খানিক ভস্ম করল সামনের মানুষটাকে। তারপর আচমকা আবার হেসে উঠল। বলল, তুমি হাড়বজ্জাত আর অতিমাত্রায় লোভী। বাবা-মা শুনলে কি বলবে বল তো ?

—তাদের কাছে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

—থাক, তোমাকে আর ঘটা করে কিছু করতে হবে না। বিয়ে করা বউকে কত যে ভালোবাসো আমার সঙ্গে মেশা দেখেই বুঝেছি। ……তোমাকে ক্রিশ্চিয়ান হয়ে রেজিস্ট্রি বিয়ে করতে হবে। ও কি ? আঁতকে উঠলে কেন—তোমাদের হিন্দু বিয়ে একটা ছেড়ে পাঁচটা করলেই বা আটকাচ্ছে কি—এখন পর্যন্ত তো আইনের বাধা কিছু নেই। বোসো এখানে, আমি আসছি।

বেরিয়ে গেল।

জগৎ মিত্র স্তব্ধ। বাইরে মুষল ধারে বৃষ্টি হচ্ছে। কলকাতা ভেসে গেল বুঝি।

মিনিট কুড়ি বাদে একেবারে বাবা-মাকে নিয়ে সুমিত্রা ফিরল। তাঁরা গম্ভীর। ভদ্রলোক তাঁর মেয়েকেই বললেন, বুঝলাম ওর কোনো দোষ নেই—কিন্তু তুই আর ক'টা দিন ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে নে না, এত তাড়া-হুড়ো করার কি আছে ?

—আঃ বাবা, তোমাকে অত করে বললাম কি ? আমার ভাবার আর কিছু নেই—ওকে ছাড়া আমার চলবে না—আমাকে ছাড়া ওর চলবে না—ব্যস। যত টাকা লাগে লাগুক, একমাস আগের তারিখে নোটিশ দিয়ে তুমি সাত দিনের মধ্যে আমাদের রেজিস্ট্রী বিয়ের ব্যবস্থা করে দাও। তুমি তো বললে টাকা খরচ করলে হতে পারে।

—তা পারে, কিন্তু—

—আর কিন্তু-টিন্তু নেই। ডান

রাতে এ বাড়িতেই থাকার ব্যবস্থা হয়েছে জগত্র মিত্রর। রাস্তায় বেরুনোর উপায় নেই। কলকাতা জলের তলায়। এত বৃষ্টি স্মরণীয়কালের মধ্যে আর হয়েছে মনে পড়ে না। ডানলোপিলোর নরম শয্যায় শুয়ে জগৎ ছটফট করছে।—তার চোখে ঘুম নেই। দোতলার সব আলো অনেকক্ষণ নিভে গেছে। নিঝুম। জগৎ মিত্রর সংকল্প স্থির কাল সকালে উঠে ও কাউকে কিছু বুঝতে দেবে না। ...যতটা সম্ভব স্বাভাবিক থাকতে হবে। অফিসে গিয়ে বাবার অসুখের কথা লিখে লম্বা ছুটি নেবে। তারপর বেলা সাড়ে এগারোটার ট্রেনেই দেশে চলে যাবে। দেশের হদিস এরা জানে না। যাতে না পায় সে ব্যবস্থাও করে যাবে। পেলেও জগৎ নিপাত্তা হলেই সব বুঝতে পারবে। আর দেশ পর্যন্ত ধাওয়া করবে না।

হঠাৎ বিষম চমকে উঠল জগৎ মিত্র। অন্ধকারে তার শয্যায় বসল কেউ। নারী দেহ। পরনে রাতের বাস। তাকে ঠেলে পাশে শুয়ে পড়ল। উষ্ণ নরম দুই বাহু বেষ্টনে টেনে আনল। তারপর অমোঘ অব্যর্থ রসাতলের দিকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল।

সকাল। দুপুর। বিকেল। জগৎ মিত্র মেসে ফিরল। একে একে দিন গড়াতে লাগল। শনিবার এলো। দেশে গেল না। অফিসে যাচ্ছেই না।

আট দিনের দিন রেজিস্ট্রি বিয়ে হয়ে গেল।

তার দু-দিন বাদে রত্নাকে রেজিস্ট্রি চিঠি পাঠালো একটা। আর কারো হাতে না পড়ে, তাই। আর অবশ্য যাতে পায়, তাই। কি ঘটেছে সংক্ষেপে লিখল। আর লিখল, বাকি জীবন কেবল অভিশাপ দিয়ে যাও। সেটা আমার প্রাপ্য। জগৎ নতুন শ্বশুরবাড়িতে আছে। সেই ঠিকানা দিল।

চারদিন বাদে রত্নার জবাব এলো। খুব ছোট চিঠি। তোমার বাবার শরীরের অবস্থা এখন আশংকাজনক। সময় হয়ে আসছে

বোঝা যায়। তাঁকে কিছু বলার দরকার নেই। এ শনিবারও যদি দেশে না আস তাহলে পরের শনিবার পর্যন্ত টিকবেন কিনা বলা যায় না। এক সপ্তাহ না আসাতে তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন।

জগৎ অফিসের চাকরি রিজাইন করেছে। সে করেনি, সুমিত্রা করিয়েছে। তবু শনিবার পর্যন্তই অপেক্ষা করল। শনিবার আরো অনেক দূরে হলে যেন ভালো হত।

বাবার অবস্থার কথা সুমিত্রাকে জানিয়ে শনিবার দেশে গেল। বাবা তার হাত দুটো ধরে কাঁদতে লাগলেন। বললেন, আমার এই অবস্থা আর তুই পনের দিন পরে এলি! আমি যে তোকে দেখার জন্যেই প্রাণটা ধরে বসে আছি।

সত্যিই তাই। তিনদিনের মধ্যে ছেলের কলকাতায় ফেরা হল না। তিনি চোখ বুজলেন। দাহ কাজ শেষ করে জগৎ সেদিনই কলকাতায় এলো। টাকা নিয়ে আবার সেদিনই রাতে ফিরল। এ ক'দিনের মধ্যে রত্নার সঙ্গে তার একটিও কথা হয়নি। সে শ্বশুরের ঘরে শ্বশুরের কাছেই থেকেছে। এরই মধ্যে দু-বেলার রান্না সারতে হয়েছে। জগৎ-এর খাবার তার ঘরে ঢাকা দিয়ে রেখে গেছে. তার খাওয়ার সময়েও সামনে থাকেনি।

রাতে ফিরতে খুব ঠাণ্ডা মুখে রত্না সামনে এলো। বলল, গ্রামের লোককে জানিয়ে দিতে হবে বাবার কাজ কলকাতার কালীঘাটে হবে।

মনের অবস্থা যা-ই হোক জগৎ অবাকই হ'ল একটু।—কালীঘাটে হবে?

—হ্যাঁ। তা না হলে আমার কাজ করতে অসুবিধে।

—তুমি কাজ করবে!

রত্না ঠাণ্ডা দু-চোখ তার মুখের উপর তুলল।—আমি ছাড়া আর কে করবে?.

ঘর ছেড়ে চলে গেল। কথাটা জগৎ-এর মাথায় ঢুকল। সে এখন ক্রিশ্চিয়ান। শাস্ত্রমতে বাবার কাজ করার অধিকার এই জন্যেই

নেই। কিন্তু ছেলে থাকতে এখানে বসে পুত্রবধূ শ্বশুরের কাজ করছে দেখলে সকলে হাঁ হয়ে যাবে।

রাতে রান্নার প্রশ্ন নেই। কারণ ফলাহার জলাহার বিধি। রত্না দুধ আর ফল তার ঘরে ঢাকা দিয়ে রেখে গেল। তার দিকে তাকালো না বা একটি কথাও বলল না। জগৎ মিত্রর বুকের ভিতরটা একটা যন্ত্রণায় দুমড়ে মুচড়ে যেতে লাগল। একবার ইচ্ছে হল রত্নাকে জোর করে ধরে আনে, বলে কি অবস্থায় পড়ে তাকে এ কাজ করতে হয়েছে। কিন্তু সেটা আরো হাস্যকর।

পরদিন সকালে বাবার ঘরে এসে রত্নাকে বলল, ব্যবস্থাপত্রর জন্য আমি তাহলে কলকাতায় চলে যাই?

রত্না জবাব দিল, হ্যাঁ। না গেলে আমার এখানে তিন রাত থাকতে অসুবিধে হবে—যিনি চলে গেছেন তাঁর জন্যে এখানে তিন রাত থাকা দরকার। ব্যবস্থা করার কিছু নেই, আমার বাবা কলকাতা চলে গেছেন, সেখানে মামারা ব্যবস্থা করবেন।

কলকাতায় রত্নার মামার বাড়ি। বড় অবস্থা তাঁদের। জগৎ এ-ও বুঝল তার শ্বশুরকে মেয়ে সব জানিয়েছে। এমন অসহায় অবস্থা বলেই জগৎ হঠাৎ রেগে গেল।—আমার বাবার শ্রাদ্ধের খরচ যোগাবেন তোমার বাবা আর মামারা?

ঠাণ্ডা দু-চোখ এবারে তার মুখের ওপর উঠে এলো। বলল, যা খরচ হবে বাবা তার হিসেব রাখবেন। কাজের পর তাঁকে দিলে সে টাকা যেন তিনি নেন আমি বলে দেব।

তেমনি রাগত মুখেই জগৎ আবার বলল, আমিই যখন তোমার আর কেউ না, আমার বাবার জন্য তুমি এত কষ্ট করতে যাবে কেন?

—সেটা আমার রুচি। আপত্তি থাকলে টাকা দেবার দরকার নেই।

এর আধঘন্টার মধ্যে জগৎ কলকাতায় রওনা হল।

বাবার কাজের দিন কালীঘাটে এলো। কাজের ব্যবস্থা, দান-সামগ্রী সবই পরিমিত বটে, কিন্তু পরিচ্ছন্ন সুন্দর। জগৎ অদূরে দাঁড়িয়ে সমস্তক্ষণ কাজ দেখল। কেউ তার সঙ্গে একটি কথাও বলল না।

শ্বশুর বা মামাশ্বশুর বা রত্না তার দিকে একবার তাকালোও না। পুরোহিত মন্ত্র পড়িয়ে গেলেন, অনুষ্ঠান পালন করালেন। রত্না মন্ত্র পড়ছে, যা বলা হচ্ছে, তাই করছে। তার পরণে টকটকে লালপেড়ে গরদ। মাথার খোলা চুল পিঠ বেয়ে কোমর ছুঁয়ে আছে। কপালে সিঁথিতে টকটকে সিঁদুর। জগৎ মিত্রর ভিতর থেকে একটা অব্যক্ত কান্না গুমরে উঠতে লাগল। দু'চোখ খরখরে শুকনো।

কাজ শেষ হল। জগৎ রত্নার এক মামাতো ভাইকে বলল, কত খরচ হল একটু জেনে দিতে হবে।

দু' মিনিটের মধ্যে সে ফিরে এসে দু' পাতার একটা হিসেব তার হাতে দিল। খরচের শুধু মোট অঙ্কটা দেখে নিয়ে জগৎ সে-টাকা রত্নার মামাতো ভাইয়ের হাতে দিয়ে চুপচাপ চলে গেল।

দেশে এলো একমাস বাদে। রত্নার ভরণপোষণের দায়িত্ব যখন আইনত আর ন্যায়ত তার, একটা ফয়সালা করতেই হবে। সে-জন্যেই আসা।

বাড়ি তালা বন্ধ। তাই হবে ভেবেছিল। শ্বশুরবাড়িতে এলো। শ্বশুর বাইরেই বসেছিলেন। ভিতরে ডাকলেন না বা বসতে বললেন না। গলা দিয়ে কয়েকটা শব্দ উচ্চারণ করলেন।—রত্না এখানে থাকে না।

দ্বিধা কাটিয়ে জগৎ জিগ্যেস করল, কোথায়··· ?

—জানার দরকার নেই।

জগৎ চলে এলো। অপমানে মুখ কালি। তার কেন আসা শ্বশুরকে সেটা শুনিয়ে আসতে পারত। তা-ও পারল না।

কলকাতা। জগৎ মিত্রর ষষ্ঠ অনুভূতি প্রখরই বলতে হবে। তার ধারণা, রত্না কলকাতায়। মামাবাড়িতে থেকে কলেজে পড়ছে। ভবিষ্যতে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর ভাবনা থাকলে সেটাই স্বাভাবিক।

এক রবিবারে সেখানে গেল। নীচে রত্নার সেই মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে দেখা। জিগ্যেস করল, রত্না এখানে ?

বিরস মুখে সে মামাতো ভাই মাথা নাড়ল। এখানেই।

—কোন্ কলেজে পড়ছে ?

কোন্ কলেজে বলল।

—একবার ডেকে দিতে হবে। তার খরচপত্র চালানোর দায়িত্ব আমার। সে-সম্পর্কে কথা বলব।

সে চলে গেল। মিনিট তিনেকের মধ্যে ফিরেও এলো।—রত্না বলল, তোমার কোনো দায়িত্ব নেই। তাই দেখা করারও দরকার নেই।

দিন যায়। জগৎ মিত্রর ভিতরটা দিনে দিনে অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে। আর সুমিত্রার তখো মোহ ভাঙছে। তার ইচ্ছেয় লোকটার ছবিতে গান গাওয়া, রেকর্ড করা, সভায় গাইতে যাওয়া, সিনেমা-থিয়েটার দেখা, ওঠা-বসা-চলা-ফেরায় বাধা আসতে পারে এ তার কল্পনার বাইরে। কিন্তু ক্রমে সেইরকমই ব্যাপার দাঁড়াতে লাগল। ফলে একতরফা ঝগড়াঝাটি আর শাসনও বাড়তেই থাকল। সে-ও মেয়েই। মেয়েলি অনুভূতিতে সন্দেহের আঁচড় পড়তে লাগল। বিয়ের পর থেকেই লোকটাকে অন্যরকম দেখছে, বদলে যেতে দেখছে। তার সন্দেহ, এই লোকের মন আর একদিকে পড়ে আছে। তাহলে সেটা আগের বউ ছাড়া আর কার দিকে হবে ? নইলে বিয়ের পর থেকেই এমন হয়ে যাচ্ছে কেন ? এই সন্দেহ মনে এলেই সুমিত্রা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। যা মুখে আসে তাই বলে। গালাগালি করে। অন্যদিকে মুখে রা নেই। তার কানে তুলো, পিঠে কুলো। কিন্তু সে যেমন চলছে, তেমনই চলছে।

মোহ একেবারেই ছুটে গেল, বা আচমকা জগৎ মিত্রই ছুটিয়ে দিল ন' মাসের মাথায়। সুমিত্রার শাসন আর আগের বউ নিয়ে ঠেস সেদিন মাত্রা ছাড়িয়েছে। তার ওপর দিয়ে জগৎ মিত্র হঠাৎ গর্জন করে উঠল। বলল, তুমি আমার সর্বনাশ করেছ—বুঝলে ? এত বড় সর্বনাশ কেউ কারো করে না—যার কাছ থেকে তুমি আমাকে ছিনিয়ে এনেছ তুমি তার পায়ের নখের যোগ্যও নও—বুঝলে ?

বোঝার সেখানেই শেষ। সুমিত্রার বাবা তাকে কেবল গলা ধাক্কা দিয়ে বার করতে বাকি রেখেছেন। আর শাসিয়েছেন, বিয়ে ভাঙিয়ে

কের বিয়ে করার জন্য তিনি তাকে জেল খাটাবেন—আর মেয়ের খোরপোষ আদায় করে তাকে ফতুর করবেন।

শেষ পর্যন্ত কিছুই করেন নি। মেয়ে রেজিস্ট্রি বিয়ে নাকচের ডিভোর্স স্যুট ফাইল করেছে। তাতে অনেক অত্যাচার, অসদাচরণের অভিযোগ। জগৎ মিত্র কনটেস্ট করা দূরে থাক, কোর্টে পর্যন্ত যায় নি। তারা একতরফা ডিক্রি পেয়েছে।

জগৎ মিত্র মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছে।

আরো মাসখানেক অপেক্ষা করে রত্নাকে একখানা চিঠি লিখেছে। তার প্রায়শ্চিত্তের কথা লিখেছে। মুক্তির কথা লিখেছে আর একটিবার দেখা কবার অনুমতি ভিক্ষে করেছে।

চিঠির জবাব মেলে নি।

আরো পনের দিন পরে তাকে কলেজে যাবার পথে ধরেছে রত্না আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। চোখে চোখ রেখে অনুচ্চকঠিন গলায় বলেছে, আর কখনো এ-ভাবে থামালে রাস্তার লোক ডাকতে হবে।

চলে গেছে।

একে একে বছর ঘুরেছে। একটা, তুটো করে ছ'টা। প্রতিবারের পরীক্ষার ফল বেরুলে জগৎ মিত্র গেজেট দেখেছে। রত্না মিত্র আই-এ পাশ করল, ইংরেজিতে ভালো অনার্স পেয়ে বি-এ পাশ করল, তারপর ইংরেজিতেই ভালোভাবে এম-এ পাশ করল। এখন সে একটা নতুন বেসরকারী মেয়ে কলেজে ইংরেজি পড়ায়। জগৎ মিত্রর বয়েস একত্রিশ—রত্নার সাতাশ।

জগৎ মিত্র একটাই আশা বুকে ধরে নিয়ে বসে আছে। রত্নার নামের পরে এখনো মিত্র চলছে, মিত্র বাতিল করে এখনো বাপের পদবী বসুতে ফিরে যায় নি। আর সেই যে রাস্তায় দেখা হয়েছিল তখনো সিঁথিতে খুব সূক্ষ্ম সিঁদুরের আঁচড় দেখেছিল। জগৎ মিত্র গান ছাড়ে নি। গান নিয়ে আছে। নাম ডাকও হয়েছে। রেকর্ডের সংখ্যা বেড়েছে। বাড়ছে। রোজগার ভালো। কিন্তু তার গানের

ধারা বদলেছে। যে গানের স্পর্শ প্রাণের গভীরে পৌঁছয় সেই গানই শুধু গায়। রেকর্ডে, রেডিওয়, উৎসব-অনুষ্ঠানেও তাই। সিনেমায় হালকা চটুল গানের ডাক পড়লে বাতিল করে দেয়।

এইবার সে শেষ চেষ্টার জন্য প্রস্তুত হল। রত্নার কলেজে গেল। দারোয়ানের হাত দিয়ে একটা স্লিপ পাঠালো। স্লিপে শুধু নিজের নাম। তারপর অফিসঘরে বসে অপেক্ষা করতে লাগল।

মিনিট পাঁচ-সাত বাদে হিন্দুস্থানী দারোয়ান সেই স্লিপটাই তার হাতে দিল। ভাঁজ খুলে দেখল, উল্টোদিকে লেখা, দেখা হবে না।

জগৎ মিত্র চলে এলো। তার প্রতীক্ষার শেষ। আশারও।

পরের টানা নয় মাসের মধ্যে জগৎ মিত্রর আর কেউ দেখা পেল না। উৎসব-অনুষ্ঠান, রেডিও, রেকর্ড, সিনেমা—সর্বত্র সে অনুপস্থিত। রেডিও শ্রোতার সন্ধিৎসু চিঠির জবাবে সেখানকার কর্মীরা বেতারেই শ্রোতাদের জানাচ্ছে, জগৎ মিত্র দীর্ঘদিন ধরে নিখোঁজ বলেই দীর্ঘদিন ধরে তাঁর গান বেতারে শোনা যাচ্ছে না। সিনেমার পত্র-পত্রিকা-গুলোতেও জগৎ মিত্রকে নিয়ে কিছু জল্পনা-কল্পনা চলেছে।

ন'মাস বাদে একদিন কলকাতার সব কাগজে বড়বড় হরফে খবর বেরুলো সঙ্গীতশিল্পী জগৎ মিত্রর সন্ধান মিলেছে। দীর্ঘদিন ধরেই তাঁকে হিমালয়ের দুর-দুর্গমের নেশায় পেয়েছিল। চরৈবেতির ডাক শুনে মুসাফিরের মতো তিনি মাসের পর মাস পাহাড়ে ঘুরেছিলেন। এবারে যমুনোত্রী থেকে ফেরার পথে তিনি প্রাকৃতিক দুর্যোগে গুরুতর আহত হন। আশংকাজনক অবস্থায় তিনি এখন দেরাদুন হাসপাতালে।

খবর মিথ্যে নয়। জগৎ মিত্র সব থেকে বেশি চোট পেয়েছিলেন মাথায়। দেরাদুনের ডাক্তাররা সেই কারণেই অবস্থা আশংকাজনক ঘোষণা করেছিলেন। অবশ্য দু'দিন বাদে তাঁরা ফাঁড়া কাটার কথাও বলেছেন।

রাতে ঘুমের ওষুধের ঘোরে জগৎ মিত্র বেশ বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়েছে। চোখ মেলে তাকাতেই মাথার পাশের চেয়ারে যাকে দেখল সে স্বপ্ন না সত্যি—হঠাৎ ভেবে পেল না।

রত্না। সে চোখ মেলে তাকাতে চেয়ারটা আরো একটু কাছে টেনে নিয়ে এলো।

দু'জনে দু'জনার দিকে চেয়ে আছে।

দ্বিতীয় বাসর এখানেই শেষ।

চেয়েই আছে।

মোহিনী সরকারের বলার ফাঁকে তাঁর গেলাসের শেষের হাফ শেষ। আর মহাদেব গাঙ্গুলির তৃতীয় গেলাসও শেষ। তিনি বললেন, আপনি তো খুব মন দিয়েই গল্পটা পড়েছেন দেখছি।

মোহিনী সরকার এখন একটু মেজাজে আছেন। ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন, তাতে কি প্রমাণ হল?

—কিছু না। মহাদেব গাঙ্গুলির গম্ভীর দু'চোখ এবার বিভা সরকারের দিকে।—গল্পটা আপনার গাঁজাখুরি মনে হয়েছে?

একটু ইতস্তত করে বিভা সরকার জবাব দিলেন, উনি যে-রকম বলছেন, সে-রকম নয়। পড়তে তো আমার বেশ ভালোই লেগেছে। .....তবে আপনার অন্য বইয়ের মতো অতটা বাস্তব নয়।

—কোন্ কোন্ জায়গা অবাস্তব?

বিভা সরকার একটু ফাঁপরে পড়লেন। আগবাড়িয়ে জবাব দিলেন মোহিনী সরকার। বললেন, আপনি সত্যি বড় লেখক, কিন্তু এই গল্পের কোথায় অবাস্তব আপনার সত্যি চোখে পড়ছে না? এই গল্পের ভিতটাই তো অবাস্তব। বিবাহিত জগৎ মিত্রর ওভাবে এক মেয়ের পাল্লায় পড়া অবাস্তব, রত্নার মতো বউকে ছেড়ে তাকে বিয়ে করা অবাস্তব, সব থেকে বেশি অবাস্তব আপনার কলমের খোঁচায় রত্নাকে আই-এ, বি-এ, এম-এ ভালভাবে পাশ করিয়ে প্রোফেসারির চেয়ারে বসিয়ে দেওয়া—সেদিক থেকে রবিঠাকুরের সাধারণ মেয়ের অসাধারণ হয়ে ওঠার কল্পনাকে আপনি হার মানিয়েছেন—তারপরে বিরহী নায়কের হিমালয় ভ্রমণ অবাস্তব, অ্যাকসিডেন্ট এত মামুলি বলেই অবাস্তব—মিলনও অবাস্তব। এ সবই লেখকের ইচ্ছেয় হয়েছে।

—বুঝলাম। গম্ভীর মুখে সামান্য মাথা নেড়ে মহাদেব গাঙ্গুলি সায় দিলেন।....মা গঙ্গার আশীর্বাদের অমোঘ ফল বুঝতে পারছি। নড়েচড়ে সোজা হলেন একটু। দু'চোখ সোজা নিজের স্ত্রীর মুখের ওপরে।—তুমি কি বলো?

অন্য দু'জনের এবার খেয়াল হল, সোমা গাঙ্গুলির সমস্ত মুখ টকটকে লাল। ওই মুখে কেউ যেন হালকা করে আবির গুলে দিয়েছে। আগেও মাঝে মাঝে ওই মুখের ভাবান্তর লক্ষ্য করেছিলেন দু'জনেই। তাই তাঁরা অবাকই একটু।

সোমা গাঙ্গুলি বসা থেকে উঠে দাঁড়ালেন। ওদের দুজনের দিকে চেয়ে তেমনি আরক্ত মুখে বললেন, উপন্যাসের সব জায়গায় গায়ক আর গান বদলে লেখক আর লেখা করে নিন, রেকর্ড কোম্পানীর জায়গায় পাবলিশার করুন, ছবির গানের জায়গায় রেডিওর গল্প পড়া করুন—আর.......আর (মুখ আরো লাল) নায়ক-নায়িকার নাম দুটো শুধু বদলে নিন—তাহলে কিছুই অবাস্তব নয়—সবই ঘটেছে।

বলতে বলতে সোমা গাঙ্গুলি ঘর ছেড়ে দ্রুত বারান্দায় চলে এলেন।

মোহিনী সরকার আর বিভা সরকারের অবাক দৃষ্টি প্রথমে বারান্দার দিকে। তারপর হতভম্ব বিমূঢ় চোখে পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল।

সদা-গম্ভীর মহাদেব গাঙ্গুলির ঠোঁটের ফাঁকে টিপ-টিপ হাসি।

২

কুণাল বোস হেসেই বাঁচে না। শিবু কাকার দপ্তরে বসেও হেসেছিল। তাই দেখে শিবু কাকা ধমকেই উঠেছিল। বলেছিল, আমি কি তোকে তোয়াজ তোষামোদ করে চলার পাত্র, যে মিথ্যে তোকে বাড়াতে যাব? না কি আমার কাগজটা আস্তাকুঁড় একটা যে ছাই-ভস্ম যা পাব তাই নিয়ে ছাপার জন্য হ্যাঁ করে থাকব? এত কাল কাগজ চালাচ্ছি, এত লেখা লিখছি কলমের আঁচড় টানা দেখলে কার মধ্যে কি আছে বুঝতে পারি না—আঁচ করতে পারি না? যে লেখা দেখে তোর বাবা অমন আগুন হয়েছে, তোকে কেটে দুখানা করতে পারলে শান্তি হয় বলেছে, আর তারপর মাথার বিকৃতি কিনা দেখার জন্য অত চুপিচুপি ডায়েরিটা আমার কাছে চালান করেছে—সেই সব ছাইভস্ম লেখার মধ্যেও একটা সম্ভাবনা দেখেই তোকে আমার কাছে পাঠাতে বলেছিলাম—নইলে আমার সময় কি কুল গাছ যে তোদের মতো অকাল কুষ্মাণ্ড এসে ঝাঁকালেও ঝরঝর করে পড়বে? বাঁদর কোথাকারের।

নিচের কুচকুচে কালো ঠোঁটটা ছাতলা পড়া দাঁতে ঘষে কুণাল সবিনয়ে আপত্তি জানিয়েছে, ওই জীবটার অসম্মান কেন করছেন। শিবু কাকা—বরং বাঁদরেতর কোথাকার বলুন।

শিবুকাকা আবার রেগে উঠতে গিয়ে হেসে ফেলেছিল। (কি বললি? বাঁদরের থেকে ইতর বাঁদরেতর—) হাঃ হাঃ হাঃ—ওই জন্যই তো বলছিলাম আদা জল খেয়ে লেগে যদি যাস তোর হবে। হলে দুটো পয়সারও মুখ দেখতে পাবি—বাব-দাদার হোটেলে খাচ্ছিস বলে দিন-রাত অত লাথি গুতোও খেতে হবে না। তা বলে ছাই ভস্ম যা হোক লিখে আনলেই তো আর আমি ছাপব না—সে রকম

কিছু থাকলে তবে কথা। সেটা এমনি হয় না, বাঁদরামি ছেড়ে, মানে বাঁদরেতরামি ছেড়ে অনেক কাঠ-খড় পোড়ালে তবে হয়। কালো লম্বাটে বাঁধানো ডায়েরি বইটা শিবুকাকা তার দিকে ছুঁড়ে দিয়েছে। যা এখন অনেক সময় ঢেলেছি তোর জন্যে, আর না।

ওটা হাতে করে কুণাল শিবুকাকার ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। ঝোলানো গোঁফ আর থুতনির নিচের অল্প দাড়ির গোছায় মুখের হাসি ছড়িয়ে পড়ছে। তারপরেই গর্তের প্রায় গোল চোখ দুটো সচকিত। শিবুকাকার ঘরের পার্টিশনের এ ধারে একজন সাব এডিটর আর দু'জন প্রুফরিডার মাথা গুঁজে কাজ করছে। তাদের থেকে একটু দূরের চেয়ারে বেশ সুশ্রী একটি মেয়ে বসে আছে। বয়সে কুণালের থেকে বছর দুই তিন বড়ই হতে পারে···বছর পঁচিশ ছাব্বিশের কম নয়। কপাল ফাঁকা, সিঁথিতে সরু একটু সিঁদূরের দাগ ঝিলিক দিচ্ছে কুণাল শিবুকাকার পার্টিশন দরজার ওধার থেকে বেরিয়ে একটু এগিয়ে আসতেই চোখাচোখি। ও ঘরে ছিল বলেই মেয়েটিকে এদিকের এরা বসিয়ে রেখেছে মনে হয়। কুণালের লুব্ধ দু'চোখ কয়েক নিমেষের মধ্যে নারীদেহ ছিঁড়ে খুঁড়ে আবার মুখের ওপর এসে স্থির হল। এই চাউনি পড়ে নিতে বা বুঝে নিতে কোনো মেয়েরই ভুল হয় না বা সময় লাগে না। তখন কত রকম দেখতে হয়। সুন্দর মুখে বিরক্তির আঁচড় পড়ে। ধারালো হয়, ঘোরালো হয়, চোখে আগুনও ছোটে। কুণালের তখন আরো মজা লাগে। মনে হয় ও যেন চোখ থেকেই দুটো হাত বার করে দিয়ে কোনো মোহিনী তন্নু জাপটে ধরেছে, আর রণ-রঙ্গিনী তাই থেকে বেঁকে চুরে গুমরে দুমড়ে ছিটকে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করছে।

সামনের রমণী মুখ ভালো করে তেতে ওঠার আগেই কুণাল বোস লম্বা পা ফেলে তার দু'হাতের মধ্যে এসে দাঁড়ালো। নিজের চেষ্টায় গড়া চেহারার ছাদ ছিরি যেমনই হোক, গলার স্বর যে এই মূর্তির সঙ্গে বেখাপ্পা রকমের মিষ্টি আর নরম তা-ও জানে। নিঃসংকোচে পিছনের

দরজাটা আঙুল দেখিয়ে বললে, উনি এখন একা আছেন, আপনি যেতে পারেন।

বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় মেয়েটি নড়ে চড়ে ওঠার আগেই কুণাল বোস ঘরের বাইরে। সিঁড়ি পর্য্যন্ত গিয়ে আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়ালো। এখান থেকেও সামনের দরজা দিয়ে সোজা শিবু কাকার পার্টিশন ঘেরা পর্যন্ত চোখ চলে। মেয়েটি ললিত ছন্দে ওই ঘরের দরজা পর্যন্ত পৌঁচেছে। মেয়েদের সামনে থেকে দেখতে বেশি ভালো লাগে কি পিছন থেকে কুণাল বোস ঠিক হদিস পায় না। অনেক সময় খেয়াল করে দেখেছে, যে মেয়েদের সামনে থেকে ভালো লাগে পিছন থেকে তাদের বেশির ভাগই যেন আরো ভালো লাগে। কিন্তু সামনে থেকে দেখতে যাদের হত-কুচ্ছিত লাগে তাদেরও এক-একজনকে পিছন থেকে দেখতে অদ্ভুত ভালো। এমন একটা অভিজ্ঞতার কথা হাতের এই ডায়েরিটাতেই লেখা আছে। ···আজ এক শ্যামাঙ্গী দীর্ঘাঙ্গীকে দেখলাম বিশ গজ আগে আগে হাঁটছে। দেখার সঙ্গে সঙ্গে সেই সুঠাম রমণী অঙ্গ ঘিরে আমার গর্তে ঢোকা আদেখলে চোখ দুটো বন্‌বন্ করে চক্কর খেতে লাগল। পা চালিয়ে ফারাক যত কমিয়ে আনছি, ভিতরের পশুটা ততো থাবা খুলছে। চলার ঠমকে সর্বাঙ্গের জোয়ার ঢেউ খেলে খেলে রেখায় রেখায় তটে তটে পা বেয়ে নেমে আসছে। গা ঘেষে তিন পা এগিয়ে গেলাম, ঘুরে তাকালাম। কি কুচ্ছিত কি কুচ্ছিত। কেউ যেন আমার গালে কষে একখানা থাপ্পর বসিয়ে সব কিছুর ছন্দপতন ঘটিয়ে দিল। তারপর আবার আমি পিছনে। সে সামনে।····দেখে দেখে আমার মনে হচ্ছিল দ্বাপরের মানুষগুলো অনেক অকপট ছিল। যুধিষ্ঠিরকে পর্যন্ত দ্রৌপদীকে কয়েক জায়গায় অগ্নি নিতম্বিনী বলে সম্বোধন করতে দেখা গেছে। কিন্তু এ-কালের দ্রৌপদীরা ওই বচন শুনলে সোজা একখানা চড় বসিয়ে দেবে।

লেখার সময় সেই বাস্তব অনুভূতিটা এমনি প্রত্যক্ষ সত্য হয়ে উঠেছিল, যে হাতের ডায়েরি না খুলেও মুখস্তর মত্তো বলে যেতে পারে।

দ্বিধান্বিতচরণ মেয়েটিকে শিবু কাকার দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে যেতে দেখা গেল। মনে হয় কোনো লেখা-টেখার তদবির তদারকে আসা। শিবু কাকা ঘরে একা। তার দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য কে জানে। বোধ-হয় দুইই। শিবু কাকার বয়েস ষাট, সেইজন্য সুবিধে। সুবিধে ক্যাশ করার বয়েস কিন্তু গতর যখন নেই দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি ?

সিঁড়ি দিয়ে নেমে রাস্তায়। দোকানের ঘড়িতে বিকেল প্রায় চারটে। এক দেড় ঘন্টা সময় খামোখা নষ্ট। একেবারে নষ্টই বা বলে কি করে। হাতের এই গাবদা ডায়েরিটা তো উদ্ধার হল। এটা এ বছরের নয়। তিন বছর আগের। কোনো মেয়ে গুরুকে প্রেজেন্ট করেছিল। গুরু বলতে প্রদীপ ব্যাণ্ডো। ডায়েরিটাতে কালোর চেকনাই ঠিকরে পড়ছিল। তার ওপর জ্বলজ্বল করছিল বড় বড় হরফের সোনালি ছাপ। ভিতরে সিল্কের ফিতে। ডায়েরি রসিকদের পছন্দ হবার কথা। কিন্তু কুণাল তখন পর্যন্ত একটুও ডায়েরি রসিক নয়। ওই কলেজে পড়া মেয়েই বা অমন ডায়রি কোথায় পাবে। বাপ কাকা দাদা কারো কাছ থেকে হাতড়েছে। তারপর যে মুখ করে গুরুকে ওটা প্রেজেন্ট করেছিল, কুণালের মনে হয়েছিল মেয়েটা তার সর্বস্ব ওই হাতে দিয়ে দিলে, ছ'টার শোয়ে সিনেমা দেখার প্রোগ্রাম পাকা করে মেয়েটা চলে যেতেই গুরু তাচ্ছিল্য ভরে ডায়েরিটা টেবিলের ওপর ছুঁড়ে দিয়েছিল, সুন্দর মুখে বিরক্তির হিজি-বিজি দাগ ফেলে বলেছিল, ভাল্লাগে না এ-দেশের মেয়েগুলো সব ভীতুর হদ্দ। অন্ধকারে বসে গা টেপাটেপি করতে দেবে, সিনেমার পর ভালো রেস্তরাঁয় নিয়ে গেলে আর আলাদা ক্যাবিনে নিয়ে ঢোকাতে পারলে বড় জোর একটু জাপটে ধরতে দেবে আর দুটো চুমু খেতে দেবে—তার বেশি এগোতে যাও অমনি হৃৎকম্প। আর নিউইয়র্কের মেয়েগুলো ? শালা বারো বছর বয়সে ছেলেগুলোকে কাচপোকার মত হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যায়—নিজেরা যেমন লোটে তেমনি লুঠতেও দেয়।

গুরুর মুখে নিউইয়র্কের গল্প শুনে শুনে কুণালের দু'কান হেজে

পচে যাবার কথা। কিন্তু উল্টে যেন মজা নদীতে রসের বান ডাকে। আগে তো শুনেই ওর কান গরম হত, সমস্ত শরীর গরম হত। শুনে শুনে গুরুর নিউইয়র্ক কুণ'লের কাছেও স্বর্গ। উত্তেজনার এমন জায়গা পৃথিবীতে আর কোথাও আছে নাকি? সেখানে উত্তেজনারই অন্য নাম জীবন। সেই জীবনের স্বাদ ভালো করে পাবার আগেই গুরুকে চলে আসতে হয়েছে এই খেদ তার যাবার নয়। গুরুর বাপ ছিল সেখানকার ডাক্তার। সেখানে এক একজন ডাক্তার—মানে কি? আইনের জাল-ছেঁড়া ডাকাত। দু'বেলা দু'পকেট বোঝাই করে ডলার আনত। সে কি রাজার হালে থাকা। তিন তিনটে গাড়ি ছিল ওদের। একটা বাবার, একটা মায়ের, আর একটা ওদের তিন ভাইয়ের। বাবার গাড়ি বাবা, মায়ের গাড়ি মা চালাতো। আর ওদের তিন ভাইয়ের গাড়ি 'সফার' চালাতো। সেখানে এক একজন সফারের মাইনে কি তোর ধারণা আছে? এখানকার মাসের দশ হাজারিরাও সেই মাইনেয় ড্রাইভার রাখতে হলে ফতুর হয়ে যাবে।

গুরুর সেই ডাক্তার বাবার আর ভোঁদা মায়ের কি মতি হল—বাড়ি ঘর বেচে দিয়ে কয়েক ঝাঁক-বোঝাই টাকা নিয়ে দেশে চলে এলো। ঢের সুখ করা গেছে এখন ছেলেদের জন্যেই নাকি তাদের চাটি-বাটি তুলে চলে আসা। রাগে মুখ লাল করে গুরু বলত, অনেক সুখ তোমরা করলে, আমাদের কি হল? ছেলে মেয়ের সুখের এমন বারোটা যে বাজায় তারা বাবা-মা না শত্রু। এখানে তারা এসে বিরাট বাড়ি হাঁকিয়ে, দাসদাসী বাবুর্চি খানসামা রেখে দিব্বি পায়ের ওপর পা তুলে দিন কাটাচ্ছে। বাবার প্র্যাকটিসও এখানে নামেই, বিকেলে দুঘণ্টার জন্য চেম্বারে যায়—সন্ধ্যায় মায়ের সঙ্গে হুইস্কি গেলে। আমাদের জন্য আসা, আমরাই বা কি দিগ্‌গজ হলাম। 'আমাকে তো অন্তত বি, এ-টাও পাশ করাতে পারলে না। ভাই দুটো যা-হোক মেজে-ঘষে গ্র্যাজুয়েট হয়েছে।

গুরু মানে প্রদীপ ব্যাণ্ডোর বয়স এখন সাতাশ। কুণালের থেকে চার বছরের বড়। নিউইয়র্ক ছেড়ে কলকাতায় চলে এসেছিল তেরো

বছর বয়েসে। কুণালের পনের বছর বয়েস থেকে সে এই গুরুর চেলা। এদিক থেকে গুরু উদার বলতে হবে। সে বয়েস দেখে না, বশ্যতা দেখে। হুকুম তামিল করার কেরামতি দেখে। সেই পনের বছর বয়েস থেকে এ এলাকার এমন কি পাড়ার কত মেয়ের কাছে গুরুর চিঠি চালান করেছে, জবাব নিয়ে এসেছে-- সন্ধ্যার পর লেকে দূরে দাঁড়িয়ে তাদের পাহারা দিয়েছে, ঠিক আছে? আদর করে কুণাল মাঝে মাঝে শালা গুরু তুমি বলে কথা ঝাড়ে তাতেও গুরু হাসে। আনন্দে পিঠ চাপড়ায়। গুরুর নিজস্ব একটা ছোট্ট গাড়ি ছিল আরো ছ'বছর আগে পর্যন্ত। গুরুই চালাতো। তার পাশে কোনো না কোনো চটকদার মেয়ে থাকতই? আর পিছনে থাকত কুণাল। শুধু কি বাঙালী মেয়ে? বড় বড় রেস্তরাঁ বা তার পাশের রাস্তা থেকে অবাঙালী মেয়ে গাড়িতে তোলার ব্যাপারেও গুরু কি কম ওস্তাদ ছিল। চোখা-চোখি হলেই বুঝতে পারত কে উঠবে আর কে উঠবে না।

ওই রকম মেয়ের পাল্লায় পড়ে আর নেশার রসদ জোগানোর তাগিদে গাড়িটা জলের দরে বেচে দিয়েছিল। গুরুর নেশা তো আর মদ বা বিড়ি সিগারেট নয়। সে তখন থেকেই হাসিস আর মারি-জুয়ানার খদ্দের। বাবা আবার একটা গাড়ি কিনে দেবে ধরেই নিয়েছিল। কিন্তু আজও দিল না। গুরু এ জন্যে যে ভাষায় নিজের বাবা-মাকে গালাগালি করে শুনে কুণাল মুগ্ধ।

গুরুর সব থেকে বড় পাসপোর্ট তার চেহারা। এখনো। কোনো ছেলে যদি মাখনের দলা হয় অনেক ডাঁশা মেয়ে তাকে পাত্তা দেয় না। কিন্তু সেই মাখনের দলা যদি স্মার্ট হয়, একসঙ্গে চোখে আর ঠোঁটে হাসতে জানে, তার কথার থেকে কাজের হাত যদি বেশি এগোয়—তাহলে কিস্তি মাত। গুরুর এই সাতাশ বছর বয়সে এখন কিস্তি মাত্ কম দেখল না কুণাল বোস। ভালো ঘরের কলেজে পড়া একে একে ছ'ছটো মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেখল আর ডিভোর্স দেখল। কোর্টে এ পর্যন্ত তিন তিনটে মেয়ে ফুসলে নিয়ে পালানোর কেস দেখল,

কি সেনসেশন, কি উত্তেজনা কুণালেরই তখন। যে উত্তেজনার নাম জীবন, গুরু হাতে-নাতে ওকে তাই দেখিয়েছে। পাড়ার কোনো মেয়ে এখন গুরুর দিকে তাকালে পর্যন্ত বাপ-মা মেয়েকে শাসন করে। কিন্তু তবু গুরুকে ঠেকায় কে? তার লীলা কি শুধু এই পাড়াটুকুর মধ্যে?

গুরুর মধ্যে অভিজ্ঞতার বীজ বোনা হয়েছে কি আজকে? বীজ বোনা হয়েছে সেই তের বছর বয়সে—নিউ ইয়র্কে। একটু ভালো করে বোঝার আগে বাবা মা যে তাকে কি আনন্দ থেকে বঞ্চিত করেছে, মনে হলে তাদের খুন করতে সাধ যায় ছেলের। এই কলকাতা শহরে কত লোক অসময়ে পটাপট মরছে—আর তার বাবা মা যেন একটা বেঁচে থাকার খুঁটি ধরে বসে আছে। সম্ভব হলে, নিউ ইয়র্ক ছেড়ে চলে আসার জন্যেই বাবা মাকে সে চরম শাস্তি দিত। আর, সেখানকার মেয়েগুলো কি মেয়ে? জলজ্যান্ত আপেল.এক একখানা। ফাঁক পেলে পনের ষোল সতের বছরের সেই মেয়েগুলো ওকে বুকে জাপটে তুলে নিয়ে পালানোর জায়গা খুঁজত। চুমু খেয়ে খেয়ে গালে ঠোঁটে জ্বালা ধরিয়ে দিত—ঝোপঝাড়ের আড়ালে গিয়ে ওকে বুকের ওপরে চেপে ধরে শুয়ে থাকত—আরো কত কাণ্ডমাণ্ড করত শুনলে তোর নোলা দিয়ে জল গড়াবে।

জল যেটুকু শুনতো তাতেই গড়াতো কুণালের।

হ্যাঁ···এই ডায়েরিটার কথা। তিন বছর আগে টেবিলের ওপর গুরু ওটা ছুঁড়ে দিতেই বুকের ভিতরটা চড়চড় করে উঠেছিল কুণালের। ওর ততক্ষণে কেমন যেন বদ্ধ ধারণা, দেবার আগে ওই কালো ডায়েরির চকচকে বোর্ডে অন্তত গণ্ডা আষ্টেক চুমু খেয়েছে মেয়েটা। সেই তাপ ওতে এখনো লেগে. আছে। তখুনি বলে বসেছিল, গুরু এই ডায়েরিটা আমাকে দেবে?

—ওটা দিয়ে তুই কি করবি?

কি বললে গুরু খুশি হবে আর আজ উদার হবে কুণালের অভদিনে ভালোই জানা। জবাব দিয়েছিল, মাঝে মাঝে বুকের ওপর রাখব আর চুমু খাব। আমি আর এর থেকে বেশি কি পাব বলো।

শুনে গুরু হেসে সারা। হাসি আর থামতেই চায় না। শেষে বলেছে, আমার শিষ্য হয়ে তোর এ-রকম আনপ্র্যাকটিক্যাল সেলফ-স্যাটিসফ্যাকশন—অ্যাঁ? আরে কল্পনার ভোগ তো কবিদের জন্য আর স্পাইনলেস ছেলেদের জন্য! আমার শিষ্য হবে মোস্ট রেকলেস্ প্র্যাকটিক্যাল—সাধ গেলে হাতে হাতে আদায়। এই যে ডায়েরি দিয়ে গেল এর ওপরে আমি বিরক্ত কেন? সাধ আছে, সাহস নেই। আরে বাপু রেখে ঢেকে সব দিক বজায় রেখে কতটুকু পাবে—ভিতরে বান যখন ডেকেছে সব দিক তছনছ করে দিয়ে ছোটো না, তবে তো থ্রিল—তবে তো একসাইটমেন্ট তবে তো লাইফ। ডায়েরিটা তারপর ওর দিকে ঠেলে দিয়েছিল, যা নিয়ে যা, দুধের সাধ ঘোলে মেটা।

তার পরেই মাথায় একটা উদার প্ল্যান এসে গেছল। তোকেও ছিটেফোঁটা প্র্যাকটিক্যাল আনন্দ দেবার ব্যবস্থা করছি। তোর জন্যে একটা টিকিট কেটে রাখব আর মেয়েটাকে যা বলার বলে রাখব। ছ'টায় শো, তুই ঠিক সময়ে মেট্রোয় থাকিস।

তিন বছর আগে এই ডায়েরি হাতে করে বাতাস সাঁতরে নিজের ঘরে ফিরে দরজা বন্ধ করে ছিল। ব্যাণ্ডোদা যতই মুখ বাঁকাক আর ছেলে মানুষ ভাবুক ওকে, এটুকুতেই যে এত থ্রিল এত উত্তেজনা এ কি ভেবেছিল! বয়েস তো সবে তখন কুড়ি। বি, এ ফেল করে আর পড়া ছেড়ে সবে গুরুর যোগ্য শিষ্য হয়েছে। তার আগে যেটুকু উত্তেজনার দিন গেছে তার বেশির ভাগ কাল্পনিক। গুরুর চেলাগিরি করে আর তার ভোগ কল্পনা করে যেটুকু আনন্দ। কিন্তু এই ডায়েরিটা বা ডায়েরিতে মেয়েটার স্পর্শ তো আর কল্পনা নয়। ফেরার আগে ওই মেয়ে যে ডায়েরির মলাটে গণ্ডাকতক চুমু খেয়ে নিয়েছে তা-ও কল্পনা বলে স্বীকার করতে রাজি নয় কুণাল। ঘরে এসে ওই ডায়েরির মলাটে গাদা গাদা চুমু খেয়ে বার বার ওটা বুকে চেপে ধরে বেশ একটু নতুন থ্রিল আর উত্তেজনা উপভোগ করেছে। কিন্তু সিনেমা হলে আরো থ্রিল ওর জন্যে অপেক্ষা করছে সেটা ভাবতে গিয়েই শিরায় শিরায় রক্ত গরম। ওর জন্যেও ব্যাণ্ডোদা টিকিট তো

কেটে রাখবে, কিন্তু মেয়েটাকে আবার কি বলে রাখবে? মেয়ের পাশে বসে ছবি যে দেখেনি এমন নয়। আর তখন খুব সংগোপনে আর অন্যমনস্কের মতো এক একবার হাত ঠেকিয়েছে, হাঁটুতে হাঁটু লাগিয়েছে—তক্ষুণি আবার অপ্রস্তুত ভদ্রলোকের মতো গুটিয়েও বসেছে। একবার তো চিত্তির। বার কয়েক ও রকম করার পর হাফটাইমের আলো জ্বলতে দেখে মায়ের বয়সী একজন।

বিকেলে আধঘণ্টা আগেই মেট্রোর সামনে অপেক্ষা করছিল, আর সব থেকে শস্তার সব চেয়ে কড়া সিগারেট টেনে সময় পার করছিল। ঠিক সময় ধরেই ব্যাণ্ডোদা আর সেই মেয়ে হাত ধরাধরি করে হাজির ও সামনে আসতে ব্যাণ্ডোদা (কুণাল অনেক সময় গুরু ছেড়ে ব্যাণ্ডোদা বলে কারণ এই ডাকের মধ্যে একটা নতুনের চমক আছে—অন্তত তখন ছিল) পরিচয় করিয়ে দিল। বলল, এই আমার সেই কচি কাচা লাজুক শিষ্য কুণাল বোস—তুমি আসছ তাই লাজুক তো আসতেই চায় না। সঙ্গে সঙ্গে এক চোখ একটু ছোট করে মেয়েটাকে গুরু একটু ইশারাও করল। ভব্যতার খাতিরে সেই মেয়ে কুণালের দিকে ফিরে একটু মাথা নাড়ল, আর ঠোঁটের কোণে হাসল, আর চোখের কোণে ভালো করে দেখে নিল। গুরুর কি কারসাজি ঠাওর করতে না পারার ফলে কুণাল মুখে একটু লাজুক-লাজুক ভাব টানাই বুদ্ধিমানের কাজ ভাবল।

কিন্তু বুকের ভিতরটা সত্যিই তখন একটা বাস্তব থ্রিলের তৃষ্ণায় ধকধক করছিল। এই মেয়ের উঁচু বুক আর টসটসে ঠোঁট দুটো শুকনো ডায়রি নয়—তার থেকে ঢের-ঢের নরম-গরম বাস্তব।

একেবারে সারির শেষের তিনটে সীটে তারা তিনজন। প্রথমে গুরু মাঝে মেয়েটা শেষে কুণাল। কুণালের পরে সেই রো-তে আর সিট নেই। আলো নিভল। ছবি শুরু হল। মেয়ে পুরুষের মাখা-মাখি লপটা-লপটির হিন্দী ছবি। শুরু থেকে ঢলাঢলি। কিন্তু ছবি দেখবে কি, খানিক বাদেই কুণালের সর্বাঙ্গে কাঁটা। মেয়েটার হাঁটু আর হাঁটুর ওপরের খানিকটা কুণালের একদিকের সঙ্গে ক্রমে সেঁটে

যেতে লাগল। আর কাঁধের ওপরের দিকটা ওর কাঁধের সঙ্গে একটা চাপাচাপির খেলা শুরু করে দিল। মাঝে মাঝে অন্ধকারেই আবার ঘুরে তাকায়। কুণালের গালে গরম নিঃশ্বাসের ছেঁকা লাগে।

হাফটাইমের আলো জ্বলতেই মেয়ে আবার শান্তশিষ্ট। মাঝে ভব্যরকমের ফারাক। এক একবার গুরুর কানে মুখ ঠেকিয়ে ফিসফিস করে বলছে কিছু আর কুঁই কুঁই করে হাসছে। গুরুর তাকানো দেখে মনে হয় মজাটা ওকে অর্থাৎ কুণালকে নিয়েই। রোগাপটকা কুণালের ভিতরে যে তখন মদমত্ত দামাল হাতী দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে সে যদি ওই মেয়ে জানত।

আবার ছবি শুরু হতে একই কাণ্ড শুরু হল। কুণালের শরীরের কণায় কণায় এবারে ডবল সাড়া দেবার ইচ্ছে। কিন্তু ও বুঝে নিয়েছে তাহলে মজা মাটি—ওকে লাজুক ছেলের ভূমিকা নিতে হবে। খানিক এ-রকম চলার পর মেয়েটার একটা আলতো হাত ওর হাতের ওপর এসে পড়ল। পড়ার পর পড়েই থাকল। তারপর উঠল যখন কুণালের হাতখানা সুদ্ধ নিয়ে উঠল। ওর হাতটা গরম হাতে ধরে চেয়ারের হাতলের তলা দিয়ে টেনে নিজের কোলের ওপর ফেলল। তারপরে ওই হাত কোলের ওপর রেখে আর গরম হাতের আঙুলে আঙুলে খেলা চলল।

ছবি শেষ হবার পর বাইরে বেরিয়ে ঠোঁটের কোণে তেমনি হেসে আর চোখের কোণে তেমনি করে চেয়ে মেয়েটা জিজ্ঞাসা করেছিল, ছবি কেমন লাগল কুণাল বাবু?

নিরীহ লাজুক মুখ করে কুণাল জবাব দিয়েছে, ছবি আর দেখতে দিলেন কই।

চারুমুখির দু'চোখ কপালে। আমি আবার কি করলাম।

গুরু হেসে উঠেছিল। বলেছিল, সম্পর্কটা যখন বউদি হতে চলেছে মওকা পেয়ে তুমিও একটু বাড়লে খুব অন্যায় হত না হাঁদা কোথা-কারের।

ওকে বিদায় দিয়ে তারা পার্ক স্ট্রীটের দিকে চলে গেছল। আর

কুণাল সর্বাঙ্গে জ্বলুনি নিয়ে ঘরে ফিরেছে। পরে গুরুর মুখে শুনেছে, মেয়েটাকে বলে রেখেছিল, শিষ্য—তার দারুণ লাজুক আর দারুণ ভালো ছেলে, সিনেমা হলে বসে ওর যদি ঘাম ছুটিয়ে দিতে না পারো তাহলে মজাই মাটি।

হেসে হেসে গুরু জিজ্ঞেস করেছিল, তা তোর ওটুকু বাস্তব অভিজ্ঞতা কেমন লাগল বল্।

কুণাল গলা শুকিয়ে জবাব দিয়েছে, তুমি শালা এক নম্বরের শত্রু গুরু—বুকের মধ্যে এখন সাহারা জ্বলছে—ফের পেলে ওই ভাবী বউ-দিকে আমি না খুন করে বসে থাকি।

ওই ভাবী বউদিটিই ছ'মাস বাদে গুরুর বিরুদ্ধে কোর্টে কেস ঠুকে দিয়েছিল। গুরু নাকি তাকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার সঙ্গে মেলামেশা করত। শেষে একদিন তার সর্বনাশ করে সরে পড়েছে। মেডিক্যাল চেকআপে পর্যন্ত সর্বনাশ প্রমাণ হয়েছিল। কিন্তু সর্বনাশটা শেষ পর্যন্ত কার মারফৎ হয়েছে সেটা প্রমাণ হয়নি। কারণ জেরায় জেরায় সাবালিকা মেয়ের অনেক গলদ বেরিয়ে পড়েছে।

যাক, এই সুন্দর ডায়েরিটার পাতা একটা দুটো করে ভরাটি হতে শুরু করেছে আরো সাত আট মাস পর থেকে। হঠাৎই খেয়ালের বশে ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল। তারপর গুরুর তারিফ পেয়ে উৎসাহ বেড়েছিল। ব্যাপার আর কিছু না, ভিতরে কোনো বাসনা যখন দুর্বার হয়ে ওঠে, বা কোনো শোনা ঘটনায় স্নায়ুগুলো যখন উথাল পাথাল করতে থাকে—তখন ডায়েরির পাতায় সে-সব লেখা। লিখে ফেলে তার ওপরে কিছু মন্তব্য করা।

যেমন প্রথমেই লিখেছিল, এই ডায়রি যার কাছ থেকে পাওয়া সেই ভাবী বউদির মতো একটি মেয়েকে সমস্ত নিষেধের গণ্ডী থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারলে কুণাল বোস কি করে? ওই ভাবী বউদির মতো স্বভাব চরিত্রের মেয়ে নয়, শুধু তার মতো অমন টসটসে দেখতে—কিন্তু তার ভেতরখানা তখন পর্যন্ত কোন সভ্যভব্য সুপুরুষকে নিয়ে কল্পনার জাল বুনছে। অবাধ্যতার জন্য তার ওপর প্রথমে কি ভাবেনির্মম আঘাত

করে তাকে বোবা বানিয়ে দিত আগে তাই লিখেছে। কিন্তু বোবা বাধ্য মেয়ে কোন্ ছেলে চায়? সেই আক্রোশে তাকে কতভাবে নরকের তলায় টেনে নিয়ে চলেছে তার হুবহু বর্ণনা। কিন্তু মেয়েটা যখন শেষে আর বোঝে না, তাকেই যখন নরকের দোসরে মেনে নিয়েছে, আত্মহুতি সম্পূর্ণ ভাবছে, তখন আবার কুণাল বোস নতুন চমক সৃষ্টিতে মেতে উঠেছে। যে সুন্দরের স্বপ্ন দেখত মেয়েটা, যে স্বপ্নের জাল বুনত, নরক ছেড়ে তাকে নিয়ে সেই দিকে এগিয়েছে। সেই সুন্দরের দরজা তারই বুকের তলায়—একটু একটু করে এবারে সেই দরজা খুলে দিয়েছে। তার সেই স্বপ্নের জালে এসে নিজেই ধরা দিয়েছে। মেয়েটা হতভম্ব হয়ে দেখছে, যার একদিক এমন কুৎসিত নরক, তারই আর একদিক কি অনির্বচনীয় সুন্দর! লেখার শেষে মন্তব্য, আমি কুৎসিত আমিই, সুন্দর আমার একটাকে যে নেবে সে আধখানা নেবে। আমার শালা একটাতে ক্লান্তি ধরে যায় বলে আমি ভোগে কখনো সুন্দর কখনো কুৎসিত।

ভাবী বউদির মতো সুন্দর চেহারার মেয়ের ওপর কুণাল বোসের পুরুষের নির্মম অত্যাচার আর তাকে নিয়ে নরকে তলিয়ে যাবার প্রত্যক্ষ বর্ণনা পর্যন্ত গুরুর দারুণ ভালো লেগেছিল। বারবার বাহবা দিয়েছিল। কিন্তু তাকে নিয়ে আবার সুন্দরের অভিসারে যাত্রা-পর্ব শুনে নাক সিঁটকেছিল। —ও আবার কি, ক্লাইম্যাক্স থেকে অ্যান্টিক্লাইম্যাক্স—কেটে দে কেটে দে—যত সব সিলি ডে-ড্রিমিং!

খবরের কাগজ খুললেই রোজ কটা করে ধর্ষণের খবর। কুণাল বোস সে-সব খুঁটিয়ে পড়ে। যে খবর যত নির্মম তার প্রতি ততো আগ্রহ। তার ভিতরে ততো উত্তেজনা। চোখের সামনে সমস্ত ব্যাপারটা কল্পনা করে ভারী আনন্দ পায়। ডায়েরিতে অকপটে সে-সব স্বীকার-উক্তি আছে। সঙ্গে মন্তব্যও—শালার খবরের কাগজগুলো ঘটা করে প্রথম পাতায় এসব খবরগুলো ছাপে কেন? পড়ে সুড়সুড়ি লাগে বলেই তো। আরো মন্তব্য, মেয়ের মতো মেয়ে হলে এ ব্যাপারটা অপছন্দ করার কথা নয়—আসলে ভয় আর লোকলজ্জা। শালার

কুকুর বেড়াল গোরু ছাগলও এ-ব্যাপারে মানুষের থেকে ঢের বেশি অকপট আর সৎ।

এটা পড়েও প্রদীপ ব্যাণ্ডো খুব পিঠ চাপড়েছিল।

...রোমাঞ্চকর ডাকাতির খবর পড়তেও তেমনি ভালো লাগে কুণাল বোসের। ঘটনা যতো বড় দরের হয় উত্তেজনাও ততো বাড়ে। এ-সবেরও স্বাদ তাকে পেতে শিখিয়েছে তার গুরু প্রদীপ ব্যাণ্ডো। পয়সা খরচ করে সেক্স আর ক্রাইমের গায়ে-কাঁটা দেওয়া বই কিনে আগে নিজে পড়ে, পরে ওকে পড়ায়। বলে, এই তো লাইফ্, থ্রিল আর একসাইটমেন্ট যেখানে নেই সে আবার লাইফ। এই সেক্স আর এই ক্রাইমের ব্যাপার কলকাতায়ও এখন কম ঘটছে না। ডায়েরিতে নিজের ভাবনা লেখা শুরু করার পরে মস্ত একটা ব্যাঙ্ক ডাকাতি হয়েছিল। কালো অ্যামবাসাডারে চেপে ছ'জন লোক এসেছিল। সতের মিনিটের আগেই সতের লক্ষ টাকা হাতিয়ে সরে পড়েছিল তারা। এই অপারেশন সারতে গিয়ে মাত্র দু'জন লোক খুন হয়েছিল আর জন পাঁচেক জখম। ডাকাতদের কেউ ধরা পড়েনি।

ঘটনাটা কুণাল বোসের কাছে এত সেনশেনাল মনে হয়েছিল যে তিনবার করে আদ্যোপান্ত খুঁটিয়ে পড়েছে খবরটা। যত ভেবেছে ততো উত্তেজনা বেড়েছে। শেষে ডায়েরি নিয়ে বসেছে।

—মনে মনে আমিও একটা ব্যাঙ্ক ডাকাতি করে উঠলাম। সঙ্গে সেই ছ'জনই লোক। আমি তাদের লিডার। সমস্ত প্ল্যান আমার। অপারেশন ফরমূলা আমার। প্রথমে ভেবেছিলাম পাঁচজনকে খুন করলে আর বারো চোদ্দ জনকে জখম করলেই কাজ হাসিল হবে। তাদের রক্তাক্ত মৃতদেহগুলো আমি আগেই চোখের সামনে দেখলাম। দেখলাম এই দেখাটা মন্দ উত্তেজনার ব্যাপার নয়। কিন্তু শেষে আর ওই প্ল্যান ভালো লাগল না। কারণ লোক মারা আর জখম করার উত্তেজনাটা পুরনো ব্যাপার। তার থেকে ঢের বেশি উত্তেজনার ব্যাপার কারো গায়ে একটা আঁচড় না বসিয়ে কাজ সারাটা। কাগজে এমন ডাকাতি নিয়ে দারুণ হৈ-চৈ হবে—পড়তে পড়তে সকলের বুকের তলায়

একটা ঠাণ্ডা স্রোত বইবে। হ্যাঁ সেই প্ল্যানেই অপারেশন পাকা করলাম। এক-একজনের রিভলভারের মুখে তিনজন করে লোক পুতুল হয়ে থাকল। স্ট্রং রুমের চাবি আমার হাতে। চোদ্দ মিনিট লাগল টাকার বস্তা পিছনের গাড়ির ক্যারিয়ারে ঢোকাতে। পালাবার সময় ছ'টা রিভলবার থেকে মাত্র আঠেরটা ফাঁকা আওয়াজের দরকার হয়েছিল।

—কিন্তু কত টাকার ডাকাতি সেটা ঠিক করতেই সময় লেগেছে একটু। প্রথমে ওই সতের লক্ষ টাকার অঙ্কটাই মাথায় ছিল। কিন্তু পরে চিন্তা করে দেখলাম সতের লক্ষ টাকা আর কত টাকা? ভোগের শেষ দেখতে হলে এ টাকায় আর কদিন চলবে। ডাকাতি তো আমি মাত্র একটাই করেছি বা করলাম। টাকার অঙ্কটা বাড়াতে বাড়াতে সতের লাখ থেকে সত্তর লাখে তুললাম। কিন্তু ওতেও ভোগের শেষ হয় না। ডাকাতি করে সে টাকা তো আর আমি ব্যাঙ্কে রাখতে যাচ্ছি না যে সুদের টাকায় পায়ের ওপর পা তুলে জীবন কাটিয়ে দেব? শেষে সতের কোটিতে এসে থামলাম। কোনো ব্যাঙ্কে সতের কোটি টাকা নগদ থাকে কিনা আমি জানি না। কিন্তু আমার ডাকাতি আমারই। থাকতে হবে! আমি কাগজ কলম নিয়ে হিসেব করে দেখেছি। মাসে দু'লক্ষ করে খরচ করলে (দু'লক্ষ কাকে বলে তা-ও আমি জানি না, কিন্তু আমার মনে হল ওতে ভোগের সমস্ত রাস্তা খুলে দেওয়া যেতে পারে।) এক কোটিতে পঞ্চাশ মাস যাবে। তাহলে সতের কোটিতে আটশ পঞ্চাশ মাস অর্থাৎ সতের বছর দশ মাস চলবে। এখন আমার বয়েস একুশ (তখন একুশই ছিল), তাহলে তখন বয়েস দাঁড়াবে একানব্বুই বছর দশ মাস। তার বেশি ভাবার আর কোনো মানে হয় না। ও....আপনারা ভাবছেন আমার কাঁচা হিসেব—সঙ্গী ছয় জনের ভাগ কি হবে? আসল থ্রিল তো সেইখানে। আমার অপারেশনে লোক মারা নেই মানে ব্যাঙ্কের নিরীহ লোকগুলোকে মারা নেই। তা বলে শত্রু মারব না এমন হলপ কে করেছে। ডাকাতির রাস্তে খেয়ে

দেয়ে ফূর্তি করে ঘুমিয়ে আমার সঙ্গীরা কি আর দিনের মুখ দেখেছে ? কাজটা কত সহজ। মদ খেয়ে সকলের তখন টইটম্বুর অবস্থা। সেই অবস্থায় আমি নিজের হাতে প্রত্যেকের ড্রিংক সাজিয়ে হাঁক দিলাম, 'লাস্ট ড্রিংক ফর দি বেড'। হ্যাঁ ডাকাতির পর কুচকুচে কালো অ্যামবাসাডারের বদলে ধপধপে সাদা অ্যামবাসাডার চেপে আমরা দেড়শ মাইল দূরের এক হোটেলে উঠেছিলাম। একসঙ্গে নয়। আলাদা আলাদা। একে একে। কেউ কাউকে চিনি না। একেবারে শেষে সাদা অ্যামবাসাডার হাঁকিয়ে এসেছি একলা আমি। তখন রাত। অন্য ছ'জন যে যার ঘরে। আমার গাড়ির পিছনের ক্যারিয়ারে সতের কোটি টাকা কে আর জানছে। (ক্যারিয়ারে সতের কোটি টাকা আবার ধরে তো ?) যাক সঙ্গীরাও জানে না আমি শুধু রাতটুকুর জন্যেই আগাম টাকা দিয়ে ঘর বুক করেছি—ভোর রাতে উঠে গাড়ি নিয়ে চলে যাবার কথাও বুকিং ক্লার্ককে বলে রেখেছি। যাক, মনের আনন্দে আমাব ঘরের রাতের আসর শেষে আমার অর্থাৎ লিডারের হাত থেকে সঙ্গীরা লাস্ট ড্রিংক ফর দি বেড্ নিল। প্রত্যেকের গেলাসে (নিজের বাদে) সেই লাস্ট ড্রিংকে আমি কখন কি মিশিয়েছি সজাগ সচেতন থাকলেও তারা টের পেত না। তখন তো নেশায় বুঁদ্। কি মিশিয়েছি সেটা অবশ্য আমি নিজেও এই লেখার সময় পর্যন্ত জান না। এমন কিছু যা মদের গেলাস শেষ হবার পরেও ওরা যে যার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়া পর্যন্ত কোনো কাজ করবে না। তারপরই ওই ড্রিংক লাস্ট ড্রিংকই হবে। আর উঠবে না। আর এই না ওঠাটা যখন জানা-জানি হবে তখন আমি কোথায় আর আমাকে সন্দেহই বা করে কে ?

—তারপর আমার ভোগের পালা শুরু। যত রকমের ভোগ এই পৃথিবীতে আছে সব আমার হাতের মুঠোয়। সদয় ভোগ, নির্দয় ভোগ, হিংস্র ভোগ, অহিংস ভোগ, সচেতন ভোগ, অচেতন ভোগ। আমি এই পৃথিবীর একমাত্র ভোগরাজ।

শেষে মন্তব্য, 'শালা ভোগের কিছু জানো না বলেই এক কথায় নিজেকে ভোগরাজ বানিয়ে শেষ করলে। অমন ভোগে হাবুডুবু খেতেই

যদি পারো—তখন মনের ঘরে মাসে দু'লাখের বদলে দু'শ টাকা খরচের জীবন ঢের বেশি স্বাদের মনে হবে হয়তো—কিন্তু সেটা ওই ভোগের আগে নয়।'

এই শেষের মন্তব্যটা শুধু গুরুর পছন্দ হয়নি। নইলে বাকিটা বেশ লেগেছিল। যাক ডায়েরির আগাগোড়া কুণাল বোসের ভিতরের মনটা এখনি ছড়ানো ছিটানো। শিবুকাকা তার লেখা একটুও ভালো বলেনি, কিন্তু মন্তব্যগুলোর মধ্যে আর সব জিনিস খুঁটিয়ে দেখার মধ্যে কিছু সম্ভাবনা দেখেছে। তবে একটা লেখার প্রশংসাই করেছে। গুরুর মতে যেটা কোনো লেখাই নয়।

লেখাটার নাম 'ওড অন্ এ বারমুডা লিলি'।

পরীক্ষায় ফেল করুক আর যাই করুক চেঁচিয়ে পাঠ্য বইয়ের ইংরেজি বাংলা কবিতা পড়ত, ইংরেজিতে নম্বর পেত একশর মধ্যে বড় জোর তিরিশ। কিন্তু কীট্সএর ওড্-অন এ গ্রীসিয়ান আরন তা বলে কম বার চেঁচিয়ে পড়েনি। কুণাল বোসের কল্পনায় এর বিষয় বস্তুও অনেকটা এক রকম। তবে কুণাল বোসের ভাব আলাদা।

...বারমুডা লিলি হল একটা ফুলের নাম। যা কুণাল কখনো চর্ম চোখে দেখেনি। ঘরের রঙিন ক্যালেণ্ডারে দেখেছে। ক্যালেণ্ডারে লম্বা তকতকে একটা সবুজ ডাঁটার ওপরে ফুটে আছে বারমুডা লিলি। তার লম্বা লম্বা সাদা মসৃণ অদ্ভুত নরম ছ'টি পাপড়ি। ভিতরে রঙ-বেরঙের ছ'টি কেশর। বিলিতি ক্যালেণ্ডারের আর্ট পেপারে ছাপা ভারী সুন্দর একটা জীবন্ত ফুল—দেখলে মনে হবে ওটা শুচিতার প্রতিচ্ছবি। কিন্তু ওই সবুজ ডাঁটা বেয়ে উঠছে রঙিন একটা বীভৎস পোকা। পোকার লুব্ধ দুটো চোখ ডাঁটার মাথার ওই ফুলটার দিকে। ওই পর্যন্ত উঠে ফুলটা কুরে কুরে খেতে পারলে তার জন্ম সার্থক, জীবন সার্থক। ক্যালেণ্ডারের ওই ছবিটার দিকে তাকালেই অদ্ভুত একটা শিহরণ হত কুণালের। ছবিটার দিকে চেয়ে থাকত আর কল্পনায় দেখত ওই রঙিন বীভৎস পোকাটা স্থির অব্যর্থ গতিতে ওই ফুলটার কাছে পৌঁচাচ্ছে—কিন্তু ফুল জানেও না কি শোচনীয় তার পরিণতি।

কল্পনাটা যত ঘন হত ততো যেন গায়ে কাঁটা দিতো কুণালের, একটা অস্বাভাবিক রোমাঞ্চ অনুভব করত। সেটা দুঃখের কি বীৎভস আনন্দের ঠিক করে উঠতে পারত না। যদিও জানা কথাই ছবির ওই লোভী পোকা কোনদিনই ফুল পর্যন্ত পৌঁছুতে পারবে না।

ওই ছবিটা দেখে দেখে মাথায় হঠাৎ একদিন একটা অদ্ভুত খেয়াল চাপল কুণালের। ডায়েরির পাতার মাপের এক টুকরো আর্ট পেপার কেটে নিয়ে ওই ক্যালেণ্ডার আর কাগজ, তার এক আর্টিস্ট বন্ধুর কাছে দিয়ে এলো। ক্যালেণ্ডারের ওই রঙিন ছবি আর্ট পেপারে হুবহু তুলে দিতে হবে। ক্যালেণ্ডারের ওই রং ফুল পোকা সব একরকম হওয়া চাই। ঠিক ঠিক হলে একটা ছোট বোতল তাকে প্রেজেণ্ট করবে। বোতলের লোভে না হোক তাগিদের চোটে আর্টিস্ট বন্ধু তাই করে দিল। রং ফুল পোকা এক রকমই হয়েছে। সেই আঁকা আর্ট পেপারটা এনে কুণাল ডায়েরির বাঁ দিকের পাতায় সাটল। তারপর ডান দিকে ওড্ অন্ এ বারমুডা লিলি লিখল।

—বারমুডা লিলি, আসলে তুমি এক অনন্তযৌবনা অক্ষতসুন্দর নিষ্পাপ মেয়ে। তুমি নিশ্চিন্তে রূপের ডালি ছড়িয়ে বসে আছ। জানোও না কে তোমাকে গুটিগুটি খেতে আসছে—শেষ করতে আসছে। ও এসে পৌঁছুলে তুমি কি করবে—কেমন চমকাবে? আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করে। ভয়ের ছায়া তো আগে চলে। কিন্তু সুন্দরী, তোমার মনে কি ভয়ের ছায়াও পড়ে না? এ যৌবন ছড়িয়ে অমন নিশ্চিন্তে আনন্দে বসে আছ কি করে?…নাকি তুমি জানো, ওই নির্মম যম কোনদিন তোমার কাছে পৌঁছুতে পারবে না—ওর লুব্ধ চোখ আর জ্বলন্ত ক্ষুধা নিয়ে ও. যেমন আছে চিরকাল সেই রকমই থেকে যাবে?….তাই ঠিক বোধহয়। বাসনার চূড়ান্ত স্বপ্নের নাগাল আমরা কে কবে পেয়েছি? যার পরে আর কিছু নেই এমন ভোগবতীর কাছে কে কবে পৌঁছুতে পেরেছি? হয়তো তার হদিস পেয়েছি, ওই ভীষণ রঙিন পোকাটার মতো লুব্ধ চোখে তাকে দেখেছি, লোভে হাত চেটেছি, গুটিগুটি সেদিকে এগোতে চেয়েছি। কিন্তু ওই, বাসনার

ডালি মরীচিকার মতো যেমন দূরে তেমনি দূরে। অনন্তযৌবনা বাসনার বারমুডা লিলি লোভের ডগার শেষ মাথায় চিরকালই ওমনি অক্ষত-সুন্দর।'

···আর ডায়েরির শেষ লেখাটার পরের মন্তব্য পড়ে শিবুকাকা একটু ঘুরিয়ে প্রশংসা করেছিল। বলেছিল, ঠিকই তো বুঝেছিস দেখি, তোকে গাধার মতো গোরু কে বলে? জেনে শুনে উল্লুক হয়ে বসে থাকলে কে তোকে ঠেলে তুলবে? শিবুকাকা নাকি প্রাচীন ইতিহাস আর সংস্কৃতির স্কলার ছিল। নিজের কাগজে নিজে লেখেও ওই ছাইভস্ম নিয়েই। কিন্তু তার জিভ যখন নড়ে তখন মনে হয় সে প্রাণিবিদ্যাবিশারদ ছিল। যাক, ওই শেষে কুণাল বোস লিখেছিল তার পরের মন্তব্য পড়লে গুরু নিশ্চয় তেড়ে মারতে আসত।

—আমরা জীবন খুঁজছি। জীবনের অর্থ খুঁজছি। গুরু খুঁজছে। সঙ্গে আমিও। ভোগের তলকূল দেখতে না পেলে জীবনের কি অর্থ? ল, এথিকস্, ডিসেন্সি—এসব অসার কথার লাগাম ছিঁড়তে যদি না পারো তো ভেড়া হয়ে থাকো। ও-সব আবেগ টাবেগের আমরা ধার ধারি না। আমাদের জীবন মানে সেনসুয়াল প্লেজার। এক ভোগ ছাই করো, অন্য ভোগের পিছনে ছোটো। থ্রিল আর উত্তেজনা জীবনের সার কথা। সেটাই জীবন। তাই মেয়েমানুষের পিছনে ছুটি, তাকে ভালবাসার ফাঁদে ফেলি, নাচি (গুরুর খরচে হোটেলের এক মেয়েমানুষের কাঁধ ধরে দাঁড়কাকের মতো সত্যি আমি খাসা নেচেছিলাম —উঃ, সে কি থ্রিল!) মদ খাই, ম্যারিজুয়ানা টানি। এই থ্রিল আর উত্তেজনার লোভেই শুধু একবার আমি বাবার পকেট থেকে তার মানিব্যাগটাই হাপিস করে দিয়েছিলাম। এমনি থ্রিল আর উত্তেজনার মধ্য দিয়েই আমরা জীবন খুঁজে চলেছি।'

মন্তব্য: জীবন খুঁজছ না এই করে তুমি শালা জীবন থেকে পালাচ্ছ সেটা তলিয়ে ভাবার সাহস নেই কেন?

···কুণাল বোসের এই সম্পদখানা অর্থাৎ এই ডায়েরিটা হারিয়ে গেছল। আর সেই কারণে চোখে একটু আধটু সর্ষেফুলও দেখছিল।

হারানো ঠিক নয়, চুরি গেছল জানা কথাই। ওর ঘরে বাড়ির কেউই ঢোকে না। রুচি হয় না বলে ঢোকে না। রুচি যাতে না হয় কুণাল নিজেই সে-ভাবে ঘরখানা রাখত। ডায়েরিটা থাকত তার সুটকেসে। গোড়ায় গোড়ায় ওই ডায়েরিটা লোকচক্ষুর আড়ালে রাখার জন্যই চাবি দিত। কিন্তু পরে আর চাবি দেওয়া দরকার মনে করত না। কে আসছে তার ঘরে আর কে-বা দেখছে।···কুণাল খুব ভালো করেই জানে ডায়েরি সরানোটা কার কাজ। বড় বউদি ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। বড় বউদি কুণালের থেকে ন'বছরের বড়। কুণাল তার আওতার মধ্যে ছিল যখন, একটু শাসন-টাসনও করত। সে অবশ্য আট দশ বছর আগে। এখন কাছেও ঘেঁষে না। দূর থেকে সন্দিগ্ধ চোখে দেখে। কুণাল নিজের কানে শুনেছে, দাদাকে একদিন বলছিল, ও যে-রকম মরা মাছের মতো চোখ করে তাকায় ওর কাছে যেতেই ভয় করে। ওর হাড়ে মাংসে শয়তানি ঢুকেছে বলে দিলাম।

কুণাল বোস রাগ করেনি। বরং মনে মনে হেসেছে। ওর কাছে যা জীবন—থ্রিল, এদের বিচারে তা শয়তানি হতেও পারে। যাক, তার কয়েক দিনের মধ্যে সুটকেস খুলে দেখে ডায়েরিটা নেই। নেই তো নেই-ই। খোঁজ, খোঁজ, খোঁজ। শেষে বুঝল, কেউ সরালে আর খুঁজে লাভ নেই। সরিয়েছে যে তার আর ভুল কোথায়। বাড়ির লোকের মুখের দিকে চেয়েই বুঝেছে সকলের সব চিন্তার বাইরে বিষম কিছু ঘটে গেছে। বাবা শেষ পর্যন্ত কি করে কুণাল সেই অপেক্ষায় ছিল। যতই ক্ষেপে যাক না কেন, মার-ধোর করতে সাহস করবে না। আর দাদারা তো নিরীহ গোছের ভীতু মানুষ। ভাইয়ের পয়সা-অলা গুরুর খবর তারা রাখে, কিন্তু তলায় তলায় কোন গ্যাঙ ট্যাঙের সঙ্গে মেশে কে জানে। বাড়ির এই অনিশ্চিত অবস্থাটাও মন্দ উপভোগ্য মনে হত না শেষের দিকে। এতেও যেন একটু থ্রিল আছে।

অবশ্য গুরু ব্যাণ্ডোদাকে ব্যাপারখানা বলে রেখেছিল। বাড়িতে ঠাঁই এর পর আর হবে কি হবে না ঠিক নেই। গুরু ঠোঁট উল্টে নিশ্চিন্ত করেছে ওকে। বলেছে, আমাদের ডিকশনারিতে আবার

ভাবনা বলে কোনো কথা আছে নাকি। তাড়িয়ে দেয় চলে আসবি।

শেষে দেখা গেল ভেবে-চিন্তে বাবা এই কাণ্ড করেছে। ডায়েরিটা শিবুকাকার হাতে তুলে দিয়েছে। বাবা আর শিবুকাকা ক্লাসফ্রেণ্ড ছিল, সেই সুবাদে কাকা। একেবারে উল্টো মানুষ দুজনে। বাবা এমনিতে ঠাণ্ডা ভীতু স্বভাবের। হঠাৎ হঠাৎ ক্ষেপে গেলে বাড়ি মাথায় করে তোলে। তারপর আবার বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় চুপসে যায়। নানা রকম ভাবনাচিন্তা মাথায় ঢোকে। কুণালের বেলায়ও তাই হয়েছে কোনো সন্দেহ নেই। আর শিবুকাকা হাসি-খুশি মেজাজী মানুষ, খেতে ভালবাসে, গাল মন্দ করে জিভের ঝাল ঝাড়তে ভালবাসে। তার সবেতে উৎসাহ, সবেতে কৌতূহল। এমন না হলে কুণালের এই ডায়েরি পড়েও কিছু সুসম্ভাবনার কথা তার মনে আসে।

ডায়েরি হাতে কুণাল একটা বাসে উঠে পড়ল। এমন খবরটা গুরুকে না দিলেই নয়। ডায়েরি ফিরে পাওয়ার থেকেও 'শিউলি' মাসিক-পত্রের মালিক আর সম্পাদক শিবু আচার্যি ওর মধ্যে এক ভাবী-কালের লেখককে আবিষ্কার করেছে এটাই আরো মজার খবর। তাছাড়া, আর এক তৃষ্ণা ভিতর থেকে সুড়সুড় করে ওপরের দিকে উঠে জিভটাকে বার বার শুকিয়ে দিচ্ছে। সেটা সিগারেটের তৃষ্ণা নয়। শিবুকাকার দপ্তর থেকে বেরিয়ে সিগারেট তো পর পর দুটো খেল। এটা তার থেকেও ঢের কড়া তৃষ্ণা। মারিজুয়ানার তৃষ্ণা। গুরু হয়তো তাই টেনে তার নিচের ঘরের ফরাসে চিৎপাত হয়ে পড়ে আছে।

···বিকেল ছ'টায় প্রায় নিয়মিত একবার করে ঘণ্টা দুই আড়াইয়ের জন্য পার্ক স্ট্রিটে হানা দিতে হয়। আজ আর হয়তো সেটা হয়ে উঠবে না। বাড়ির লোক বেকার ভাবে কুণালকে। কিন্তু নিজের খরচ, নিজের ছোটখাট নেশার খরচ (বড় নেশার খরচ তো গুরু গৌরী সেনের কাছ থেকেই আসে), এমন কি নিজের জামা কাপড়ের খরচের জন্যও কারো কাছে তাকে হাত পাততে হয় না। এই রোজগারের ব্যবস্থাও গুরুর কল্যাণেই হয়েছিল অবশ্য। এখন নিজের চেষ্টায় পসার

বেড়েছে। তাদেরও মতো জীবন খুঁজছে অথচ ভিতরে ভীতুর ডিম এমন লোকের কি অভাব আছে? এই লোকেরা তার খদ্দের। তাদের মধ্যে বাঙালী আছে, অবাঙালী আছে।...বছর খানেক আগে গুরুর সঙ্গে একবার বম্বে আর গোয়ায় বেড়াতে গেছল। সেখান থেকে গুরু গাদা গাদা ব্লু-পিকচার আর ব্লু-ফিল্ম্ কিনেছিল। ততদিনে সে-সব দেখে-দেখে গুরুর তো বটেই, কুণালেরও চোখ পচে গেছল—রক্ত-মাংসের জ্যান্ত মেয়েগুলোর—মধ্যেই এখন আর আগের মত থ্রিল খুঁজে পায় না—এ-তো ছবি আর ফিলম্! কিন্তু তবু গুরু কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ করে এত ছবি আর ফিল্ম্ কিনছে কেন মাথায় ঢোকেনি। পরে গুরুই বলেছে কেন? কলকাতায় এগুলোর দারুণ ডিম্যাণ্ড—যে দুটো দোকান থেকে গুরু পর্ণোগ্রাফির বই কেনে বা পয়সা দিয়ে বাড়ি এনে পড়ে, আসার আগে সেই দুটো দোকান থেকেই বলে দিয়েছে ভালো মাল পেলে ভালো দামে কিনবে। হ্যাঁ, গুরুর পর্ণোগ্রাফি পড়ার ঝোঁক এখনো আছে। বলে, মানুষের ভোগের নিত্য নতুন যত রকমের বৈচিত্র্য আছে, কোনো কোনো লেখায় তা মেলে। এতে দস্তুরমতো মাথা-খাটানোর স্কোপ আছে। স্টিল ছবি বা ফিল্ম-এর থেকে বইয়ের মতো বই হলে ঢের বেশি ইন্টারেস্টিং।

গুরু বলল, এগুলো কেমন মোটা লাভে ঝেড়ে দিই দেখিস—তোকেও লাভের কিছু ভাগ দেব। আর ওই দুটো দোকানের মালিকের সঙ্গেও তোর আলাপ করিয়ে দেব। খদ্দের আনার চৌকস লোক তো তাদের সব সময়ই দরকার হয়। কুণাল বোস এখন এই দালালির কাজে পাকা হয়ে গেছে। কাঁচপোকার মতো খদ্দের ধরে নিয়ে আসে। আবার নিজেও ঘুরে ঘুরে বেশি লাজুক খদ্দেরের কাছে সাপ্তাহিক ভাড়ায় ছবি আর পর্ণোগ্রাফির বই পৌঁছে দেয়। এই খদ্দেররাই আবার ক'দিন গেলে পরদায় মুভি ব্লু ফিল্ম দেখার আশায় ওকে তেল দেয়।

অকাতরে এর জন্যে তারা মোটা টাকা খরচ করে। কুণালের ঝোপ বুঝে কোপ, অর্থাৎ খদ্দেরের পকেটের ওজন বুঝে মাশুল আদায়। এই করে দালালির রোজগার বাড়ছেই। অথচ এক বছর আগেও কি

জানত ওই দুটো দোকানেরই গোপনে মুভি ব্লু ফিল্ম দেখানোর এমন পরিপাটি ব্যাবস্থা আছে।

যা ভেবেছিল তা নয়। গুরু চিৎপাত হয়েই তার 'এক্সক্লুসিভ' নিজের ঘরের ফরাসে শুয়ে আছে। তার পাশে দুটো পোস্টকার্ড সাইজের ফোটো পড়ে আছে, হাতেও একটা খুব মনোযোগ দিয়ে সেই ফোটো দেখেছে গুরু।

কুণাল শব্দ না করে পাশে বসল। আলতো হাতে ওই বাকি ফোটো দুটো তুলে নিল। দুটো ফোটোই একটা মেয়ের। ফুটফুটে সুন্দর কচি মুখ। বড় জোর বছর সতের আঠারো হবে বয়েস। ডাগর চোখ। চোখের পাতা ফেললে বোধহয় নাকের ডগা অনেকটা ছাড়িয়ে যাবে। মোটাও নয়, রোগাও নয়। সব থেকে চোখে পড়ার মতো মেয়েটার মুখের কমনীয়তা। কেউ যেন ছাঁচে গড়ে কমনীয়তার রস উপুড় করে ঢেলেছে।

হাতের ছবিটা সামনে রেখে গুরু আড় চোখে কুণালকে দেখছে আর টিপটিপ হাসছে। চোখা-চোখি হতে বলল, দেখে ফেললি তো! তোকে অবাক করে দেব বলে একমাস ধরে চেপে আছি।

—কি ব্যাপার গুরু, এ আবার কোথাকার হুরী পরী? কিন্তু এ তো একেবারে কচি!

তেমনি হেসে গুরু জবাব দিল, বাগবাজারের। হাতের ফটোটা এগিয়ে দিল। দেখে ফেলেছিস যখন এটাও ছাখ্।

অর্থাৎ এটা কচি বলার জবাব। একটু আড় হয়ে মেয়েটা বাঁ-হাত মাথার পিছনে তুলে খোঁপা ঠিক করছে—সেই সময়ের ছবি। ফলে পিছনের খানিকটা আর বুকের এক দিকের সুডোল মাধুরী যেন উপছে পড়েছে। চোখ ফেরানো যায় না।

গুরু হৃষ্ট মুখে জানান দিল, এ ছবিতে কোন কায়দায় কি তুলেছি ও মেয়ে নিজেও জানে না।...তা কি রকম মনে হচ্ছে?

দারুণ।

চোখে দেখলে রাতে তোর ঘুম হবে কিনা সন্দেহ। দেখবি?

বাগবাজারে গিয়ে ?

ইদানীং তো আমি প্রায় রোজই যাচ্ছি। এই ফোটোটা আমার থাকবে, আজ ওই ফোটো দু'টো দিয়ে আসতে যাব। চল্…।

কুণাল বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত থাকে পার্ক স্ট্রীটে। সে-সময় গুরুর কোন্ লীলা চলছে জানবে কি করে। লোভ হচ্ছে বটে, আবার নেশার লোভ নিয়ে এসেছিল তা-ও বাতিল করতে মন চায় না। বলল, একটু বড় গাঁজার ইচ্ছে ছিল যে গুরু….।

বড় গাঁজা অর্থাৎ মারিজুয়ানা। গুরু আমল দিল না। বলল, ও-সব এসে হবে, আগে বড় গাঁজার রাণী দেখবি চল।

গুরু তৈরী হয়ে রাস্তায় বেরুলো। ট্যাক্সি নিল। হুকুম করল, বাগবাজার।

ডায়েরি ফেরত পাওয়া বা কুণালের লেখক হবার সম্ভাবনার মজার খবরটা আর দেওয়াই হল না। ওর হাতের সেই কালো ডায়েরিটা গুরুর চোখে পড়েও পড়ল না। ট্যাক্সি ছুটেছে আর এদিকের রসের ব্যাপারখানা কি থেকে কি গড়াচ্ছে ব্যাণ্ডোদা মনের আনন্দে সেই ফিরিস্তি শোনাচ্ছে শিষ্যকে। …ওই ফোটোর মেয়ের মা গুরুর মায়ের ছেলে বেলার খুব বন্ধু ছিল। একদিন দুজনের দুজন'কে না দেখলে চলত না এমন নাকি। হঠাৎ এর মধ্যে একদিন কার মুখে শুনেছে সেই ছেলে-বেলার বন্ধু আজ চৌদ্দ বছর ধরেই কলকাতায়। আমেরিকায় নয়। সে দিন-আনা দিন-খাওয়া গরীবের বউ আমেরিকা ফেরত এত বড়লোক বান্ধবীর কাছে আসবে কি আসবে না সেই দ্বিধা ছিল। শেষে ইচ্ছেটাই বড় হয়েছে। ফোন গাইডে ঠিকানা দেখে ছোট মেয়েকে সঙ্গে করে এক-সন্ধ্যায় চলেই এসেছে। নিচে তখন গুরু ছিল। তার সঙ্গেই মা-মেয়ের প্রথম দেখা। সে-যে কি দেখা গুরুই জানে। এত বড় বাড়িতে পা ফেলে দু'জনেই তারা বেশ জড়সড়। চন্দনা মানে ফোটোর মেয়ে সেদিন একখানা ঘন নীল শাড়ী পরে এসেছিল। গুরুর মনে হচ্ছিল, নীলের মধ্যে আকাশের চাঁদখানা মুখ বাড়িয়ে আছে।

কাকে চাই শুনে সঙ্গে করে দোতলায় নিয়ে চলল। বাবা মা তখন মুখোমুখি বসে মদ গিলছে জেনেও। ছেলে-বেলার বান্ধবী শুনে আর নিরাভরনা মহিলার একেবারে সাদামাটা বেশ বাস দেখেই তার মগজে একটা আশা উঁকি ঝুকি দিয়ে গেছে। বান্ধবীকে স্বামীর সঙ্গে মদের বোতল আর মদের গেলাস নিয়ে বসা দেখেই তো মহিলার হয়ে গেল। ওদিকে বাবা-মাও অবাক। গুরুই ভিতরে ডাকল, আসুন মাসিমা ভিতরে আসুন। মা-কে বলল, তোমার ছেলেবেলার বন্ধুকে চিনতে পারছ না?

নাম বলার পরেও ব্যাণ্ডোদার মায়ের চিনতে সময় লাগল একটু। বাবা সাহেবী কায়দায় নিজে উঠে ওদের বসতে আপ্যায়ন করল। তারপব অন্য ঘরে চলে গেল। ওরা জড়সড় হয়ে বসল। ব্যাণ্ডোদা বাইরে থেকে লক্ষ্য করল, চেনার পরেও মা তেমন আগ্রহ দেখালো না। ভদ্রতার খাতিরে জিগ্যেস করল, ড্রিংক চলে কিনা। মহিলা এমন মাথা নাড়ল যে বাইরে থেকে ব্যাণ্ডোদা হেসেই ফেলল। সে যেন উঠে ওই ঘব ছেড়ে ছুটে বেরুতে পারলে বাঁচে। দু'চার কথায় মা তার ঘরের খবর নিল। মহিলা বাগবাজারে থাকে। চন্দনারা চার বোন। চন্দনা ছোট। বড় তিন বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। স্বামী পোস্ট অফিসের চাকরি থেকে এ বছরেই রিটায়ার করেছে, এখন ডায়বেটিসে প্রায় শয্যাশায়ী। মায়ের জেরার মতো প্রশ্নে দুই এক কথায় এইসব জবাব এসেছে। একটু বাদেই মহিলা বলল, উনি গেলাস রেখে চলে গেলেন, আমি অসময়ে এসেছি, আজ উঠি। ব্যাণ্ডোদার মা আপত্তি করল না, মাথা নাড়ল। ওরা উঠতে বলল, তোর এই ছোট মেয়েটা তো বেশ সুন্দর হয়েছে বিয়ের চেষ্টা করছিস নাকি? মহিলা মিনমিন করে জবাব দিল, সে-রকম কিছু না, সবে এবার হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষা দিল···এখনো ফল বেরোয়নি···বয়েস মাত্র সতের।

তারা নামার আগেই ব্যাণ্ডোদা সরে গেছল। তার বাবাকে বলেছে, তোমার গাড়িটা নিয়ে ঘণ্টাখানেকের জন্য বেরুচ্ছি। রাতে তার বাবা কলেও বেরোয় না গাড়িরও দরকার হয় না।

মা মেয়ে খানিকটা এগোবার পর পিছন থেকে গাড়ি থামিয়ে ব্যাণ্ডোদা তাদের ধরেছে। নেমে এসে পিছনের দরজা খুলে দিয়ে মহিলাকে বলেছে, উঠুন মাসিমা—পৌঁছে দিচ্ছি।

মা মেয়ে দুজনেই খুব হকচকিয়ে গেছে। মহিলা বলেছে, আমরা তো বাগবাজারে থাকি—

ব্যাণ্ডোদা বলেছে, গাড়িতে বাগবাজারে আর কতক্ষণের পথ। আর বলেছে, পুরনো বান্ধবীর সঙ্গে বাগবাজার থেকে এসে আপনি কেমন দেখা করলেন আমি দেখেছি, আর বুঝেছি, এমন জানলে আপনি আসতেন না। তাই আমিই যেটুকু পারি প্রায়শ্চিত্ত করি—উঠুন উঠুন পিছনে গাড়ি দাঁড়িয়ে গেছে।

মহিলা তাড়া খেয়ে উঠে বাঁচল। মেয়েটা আদব কায়দা জানে না বলে সেও মায়ের পিছনে উঠল। গাড়ি হাঁকিয়ে সামনে চোখ রেখেই ব্যাণ্ডোদা আলাপ জুড়ে দিল। আর ফাঁকে ফাঁকে রিয়ার গ্লাসে মেয়েটাকে দেখতে লাগল। সংকোচ কাটিয়ে মহিলা বলল, তুমি এভাবে গাড়িতে আমাদের পৌঁছে দিতে চললে, তোমার মা হয়তো অসন্তুষ্ট হবেন।

ব্যাণ্ডোদা বেশ গলা ছেড়ে হাসল (ওটা সরলতার লক্ষণ জানে), জবাব দিল, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মাসিমা, আমাদের কারো ব্যাপারে কারো ইন্টারফিয়ার করা রীতি নয়—একদিক থেকে আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীন। তা আমার মায়ের সঙ্গে এক কালে খুব ভাব ছিল বুঝি আপনার ?

—খুব। এই জন্যেই তো····

কিছু বলতে গিয়ে থমকালো। আবারও হা-হা হেসে ব্যাণ্ডোদা বলল, আপনাকে কিচ্ছু লজ্জা পেতে হবে না, আমি এক-নজরেই সব বুঝে নিয়েছি। মা অনেক বদলেছে, অনেক বড়লোক হয়েছে। তবে আমার শুধু অনুরোধ বাবা মাকে দেখে আপনি তাদের ছেলেকে বিচার করবেন না। মায়ের আচরণে আজ আমি কোথায় আঘাত পেয়েছি জানলে আমার জন্য আপনার কষ্ট হত।

মহিলা বলেছে, সে-কি কথা বাবা আমি এরই মধ্যে বুঝেছি তুমি সোনার ছেলে।

বাড়িতে পৌঁছে দিতে গিয়ে ব্যাণ্ডো দেখেছে, নিতান্তই দীন দশা তাদের। ভদ্রলোক হয়তো বড় তিন মেয়ে পার করতেই ফতুর হয়েছে। মেয়েগুলোর চেহারা খাসা বলে তবু পার হয়েছে। ভদ্রলোক সত্যিই প্রায় অথর্ব। একবার ডায়বেটিক স্ট্রোক পর্যন্ত হয়ে গেছে· তাকে দেখার কর্তব্যেই ব্যাণ্ডোদা এরপর ঘন ঘন এসেছে। তাদের চোখে সে তখন আর সোনার ছেলে নয়, হীরের টুকরো ছেলে। হ্যাঁ মহিলা ততদিনে তারও খোঁজ খবর সব নিয়েছে বইকি। অবশ্য ব্যাণ্ডোদার কাছ থেকেই। গেলেই একরাশ ফল মিষ্টি নিয়ে যায়। মহিলা কিছু বলতে গেলে অভিমান করে, আমাকে ছেলে ভাবলে কিছু বলবেন না, আমার মা আছে, কিন্তু আপনাকে দেখার আগে আমি মা পাইনি।

পাঁচ দিন আগে ব্যাণ্ডোদা তিন হাজার টাকা জোর করে মহিলার হাতে গুঁজে দিয়েছে—মেসোমশাইয়ের সব থেকে ভালো চিকিৎসা হওয়াই চাই। মহিলা তিন হাজার টাকা একসঙ্গে দেখেছে বলে মনে হয়নি ব্যাণ্ডোদার। তার যে দেবার অধিকার আছে তার দু'দিন আগে মহিলাকে সে সেটা স্পষ্টই বুঝিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, আমাকে যদি খুব অপছন্দ না হয়, তাহলে যেদিন বলবেন সেদিন আমি গাড়ি নিয়ে এসে আপনাকে আমার মায়ের কাছে নিয়ে যাব···অবশ্য আমার ব্যাপারে আমার ডিসিশনই ফাইন্যাল, তবু একটা ফরম্যালিটির ব্যাপার আছে তো। আমি মা-কে বলেই রেখেছি, ওঁদের আপত্তি না হলে চন্দনাকে বউ করে ঘরে তোলার জন্য রেডি থেকো।

মহিলা তো আকাশের চাঁদ হাতে পাবেই। মা রাগ করেছে কিনা জিজ্ঞেস করতে ব্যাণ্ডোদা আবার সেই হা-হা হাসি হেসেছিল বলেছিল, এবারে গিয়েই দেখতে পাবেন—তাছাড়া জানেন তো কারো ব্যাপারে ইণ্টারফিয়ার করা আমাদের রীতি নয়।

যাক্, ব্যাণ্ডোদার অভিমান দেখেই মহিলা সেই তিন হাজার টাকা

হাত পেতে নিয়েছে। তারপর এইসব ছবি-টবি তুলতে দিতে আর বাধা কোথায়। ব্যাঙোদার আফসোস, ওই দুটো খুপরি ঘর, চন্দনাকে সেভাবে একলা পাচ্ছে না—তবে পাবার চান্স এবারে একটু হয়েছে। ব্যাঙোদা বলল, মেয়েটা এখনো এমন চেয়ে থাকে না, যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না কি হতে যাচ্ছে। তখন ইচ্ছে করে, ওকে বুকের মধ্যে নিয়ে একেবারে পিষে ফেলি, আর টসটসে চোখ দুটো দাঁতে করে ছিঁড়ে আনি।

ওরা পৌঁছুলো। কুণাল দেখল মেয়েটাকে। ছবি অত সুন্দর, কিন্তু এর বুঝি তুলনা নেই। দেখামাত্র সদ্যফোটা যুঁই ফুলের মতো মনে হল কুণালের। আড় চোখে কুণালকেও দেখল। ঠোঁটের ফাঁকে হাসির দাগ পড়ল একটু। ছাগলদাড়ি দেখে হাসি পাচ্ছিল বোধহয়। যে-লোকের বন্ধু, কুণালেরও আদর যত্ন কম হবে কেন? যতক্ষণ ছিল ওরা, চন্দনার মায়ের অস্থির অস্থির ভাব। এরই মধ্যে ফাঁক বুঝে ব্যাঙোদা বার দুই চোখে চোখে কথা কইতে চেষ্টা করল চন্দনার সঙ্গে। কিন্তু চন্দনার আয়তগভীর কালো চোখে আর দুটো ঠোঁটের ফাঁকে একটু হাসির আভাস খেলা করে গেল শুধু। আর খেয়াল না করে ব্যাঙোদা একটু কাছাকাছি হতে চেষ্টা করলেই তেমনি খেয়াল না করেই যেন ওই মেয়ে একটু তফাতে সরে যায়। দু'বার হয়েছে এমন। আ-হা-হা, কুণালের চোখে পলক পড়ে না—কি যে দেখাচ্ছিল না মেয়েটার মুখখানা তখন—যেন একখানা কালো মেঘের সঙ্গে চাঁদের লুকোচুরি খেলা। উপমা ঠিক হল না। চাঁদ হাসে। এই মেয়ের মুখে শুধু একটু হাসির আভা ছড়ায়।

ওঠার সময় চন্দনার মা ব্যাঙোদাকে জিজ্ঞেস করল, কাল আসছ, তো বাবা? কুণালকেও নিয়ে এসো।

ব্যাঙোদা বলল, কাল হয়ে উঠবে না....দেখি। আপনাকে আমাদের বাড়ি কবে নিয়ে যাচ্ছি বলুন?

—যেতে তো হবেই, শিগগীরই যাব...তবে আমার কেমন ভয় করে বাবা।

জবাবে কুণাল ব্যাগোদার হা-হা হাসির একটা নমুনা দেখল।

আবার ট্যাক্সি। ব্যাগোদা বলল, কি রকম বুঝলি ?

কুণাল ঝুঁকে পায়ের ধুলো নিতে গেল।—তোমার জবাব নেই গুরু, পায়ের ধুলো দাও। দারুণ—দারুণ—আমার বুকে চিতার আগুন জ্বলছে।

গুরু খুশি।

—তোমার মাকে সত্যি বলে রেখেছ ?

—না বলার কি আছে! বলতে তো হবেই। তা কেমন লাগল বল্।

—বললাম তো জবাব নেই। বয়েস সতেরো হলেও খুব বাড়ন্ত গড়ন।

—বয়েস সতেরো নয়, আঠারো। আমার সাতাশ শুনে ওর মা-ই স্বীকার করেছে। আঠোরো না হলে সব-দিকে অমন ডবকা হয় ?

—তুমি কাল আসছ না বললে, ফের কবে আসছ ?

—পরশু। মুচকি হাসল।—তবে পরশু তোকে আনা যাচ্ছে না।

—কেন ?

—চন্দনার বাবাকে নিয়ে ওর মা পনের দিনে একদিন পোলি-ক্লিনিকে দেখাতে যায়···পরশু শনিবার, যাবে আমি ক'দিন আগেই শুনেছিলাম। ঘণ্টা কয়েকের মামলা। পুরনো ঝি'টা অবশ্য বাড়ি আগলে বসে থাকে, তবু এই মওকায় তাকে এদিক ওদিক সরিয়ে চন্দনাকে তুই একবার বুকে চেপে তো ধরতে পারব আর কষে দু'চার বার চুমুও খেতে পারব—এবারে কোন্ শালা ঠেকায়। —তা তোর ভিতরটা খুব চড়চড় করছে ?

—খাঁ-খাঁ করছে।

—সত্যি বলছিস ?

—এই দেখানোর আগে আমার চোখ দুটো তুমি অন্ধ করে দিলে না কেন গুরু ?

প্রদীপ ব্যাগো হাসতে লাগল। খানিক বাদে হঠাৎ বলল, যা এত এখন···ছ'মাস এক বছর বাদে সুবিধে বুঝে তোকেই দিয়ে দেব।

কুণাল আঁতকে উঠল।—দিয়ে দেবে!

—না তো কি। কোন একটা মেয়েকে নিয়ে আমি জীবন কাটাবো ভাবিস নাকি? ঐ আগের অন্য বউ দুটোর মতো হবে না —সাপের মতো ফোঁস-ফোঁস করবে না···ঠিক ঢিট করা যাবে। তোকে নিয়ে আমার একটা দায়িত্ব আছে না?

রাত ন'টা নাগাত কুণাল বাড়ি ফিরে দেখে শিবুকাকা বসে আছে। সামনে বাবা আর দাদারাও আছে। ওকে দেখেই শিবুকাকা বলল, তোর কথাই এদের বলছিলাম এতক্ষণ। তোর সাবজেক্ট ঠিক করে ফেলেছি—

বাবা আর দাদাদের মুখ দেখে মনে হল তারা আশার কথাই শুনছিল কিছু। বাবা বলে উঠল, আগে কাকার পায়ের ধুলো নে, হারামজাদা পায়ের ধুলো নে।

কুণাল পিতৃ আদেশ পালন করল।

শিবু কাকা বলল, ওই বাঁদরেতরদের নিয়েই তোর ফীচার স্টার্ট করব। মানে 'তরুণের মন' নাম দিয়ে তুই মাসে একটা করে ফীচার লিখবি। এক এক পর্যায়ের এক-একটা তরুণ বেছে নিবি—তার মনের কথা সুখ দুঃখের কথা শুনবি তারপর লিখবি। শেষে তোর মন্তব্য জুড়ে দিবি। মন্তব্য ওই রকম সরস হওয়া চাই—বুঝলি কোন রকম?

কুণাল সুবোধ ছেলের মতো মাথা নাড়ল, বুঝেছে।

—প্রত্যেকটা লেখার জন্য পঁচিশ টাকা আর ঘোরাঘুরির জন্য পাঁচ টাকা করে পাবি। সেরকম উতরোলে বই ছাপার ব্যবস্থাও আমি করে দেব। বাবাকে বলল, তুমি কিছু ভেব না ভায়া, ওর ভার আমি নিলাম—আজ পর্যন্ত অনেক গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করেছি।

বাবা কৃতজ্ঞতায় গদগদ।

আরো রাত্রি।

ঘুম থেকে ধড়মড় করে একেবারে বিছানায় উঠে বসল কুণাল।

বেডসুইচ টিপে আলো জ্বালল। ঘেমে গেছে। এ কি অদ্ভুত স্বপ্নরে বাবা! ঘুরে ঘরের কোণের সুটকেসটার দিকে তাকালো। না, থাক —স্বপ্ন ছাড়া আর কি। কিন্তু বুকের ভিতরটা ধপধপ করছে এখনো। হাত বাড়িয়ে ড্রয়ারটা খুলল। ছোট হুইস্কির বোতলটা খুলে কাঁচাই গলায় ঢেলে দিল। দুই একবার গা ঝাঁকানি দিয়ে টেবিলের গেলাস থেকে অল্প একটু জল খেল। বোতলটা ড্রয়ারে রেখে আলো নিভিয়ে আবার শুয়ে পড়ল। কিন্তু ঘুম আর আসে না। যতবার চোখ লেগে আসে, গুরুর মুখ আর চন্দনার মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠছে। …চন্দনাকে বুকে চেপে গুরু চুমু খেতে যাচ্ছে। কাল বাদে পরশু দুপুরে যা ঘটবে।

বার কয়েক এ-রকম হতে আবার বেডসুইচ টিপে উঠে বসল। নিজের উদ্দেশে গাল পাড়ল, শালা পেট জ্বালিয়ে দিয়ে তোর জেগে খোয়াব দেখা বার করছি। ড্রয়ার খুলল। হুইস্কির বোতলটা এবারে গলায় ঢেলে শেষই করে দিল।

পরের দিন।

দুপুর তিনটেয় একটা রিকশ চেপে কুণাল বোস বাড়ি ফিরল। এই দুপুরে ঘরের বাইরে কেউ নেই, নইলে ওকে দেখলে হাঁ হয়ে যেত। ট্রাউজারের ওপর ওর গায়ে শুধু একটা সুতির গেঞ্জি। জামাটা এক হাতে গোল করে দলা পাকানো।

রিকশা ভাড়া দিয়ে নিঃশব্দে নিজের ঘরে চলে এলো। দলা পাকানো জামাটা চৌকির কোণে ছুঁড়ে ফেলে দিল। সুটকেস খুলে কালো ডায়েরিটা বার করল। ড্রয়ার হাতড়ে একটা পুরনো ব্লেড নিয়ে বসল। ওড্ অন বারমুডা লিলির পাতাটা খুলল। তকতকে সবুজ ডাঁটার ওপর বসা রঙিন বীভৎস পোকাটার মাথাটুকু শুধু ব্লেড দিয়ে কেটে দিল। তারপর নতুন পাতায় চলে এলো। কলম বার করল। শিবু কাকার কাগজের জন্য 'তরুণের মন'এর প্রথম বা শেষ ফীচার এক্ষুনি লিখে ফেলবে। বারমুডা লিলির লেখাটা

পছন্দ হয়েছিল যখন, এ লেখাটা নিশ্চয় আরো ঢের বেশি পছন্দ হবে।

—আমি এক্ষুনি গুরুর বাড়ি থেকে ফিরলাম। বেলা বারোটা থেকে পৌনে তিনটে পর্যন্ত তার ওখানে তার সঙ্গেই ছিলাম। গুরু পরের দিনের অপেক্ষায় মশগুল। আর আমি? না, জীবনে এত থ্রিল আর এমন উত্তেজনার স্বাদ আমি পাইনি। গ্র্যাণ্ড—যাকে বলে সুপার গ্র্যাণ্ড। অথচ নেশা কেবল একলা গুরুই করছিল। আমি যোগান দিয়ে চলেছিলাম। গুরুর তখন আমার দিকে মন দেবার চোখ কোথায়। ভাবে মশগুল। তার থেকে ঢের বেশি নেশায় মশগুল। আমার নেশা যোগানদারির ব্যাপারটা তো আর খেয়াল করে দেখেনি। কেবল টেনেই চলেছে।… তারপরে একসময় মাথা আর তুলতে পারছে না। চোখ আর খুলতে পারছে না। আমার থ্রিল আর উত্তেজনা বেড়েই চলেছে। গ্র্যাণ্ড গ্র্যাণ্ড গ্র্যাণ্ড!

সময় হয়েছে মনে হতে গুরুর ড্রয়ার খুললাম। খাপ থেকে তার সোনালি বাঁটের বিলিতি ক্ষুরটা বার করলাম। গুরু বরাবর নিজের এই ক্ষুরে কামাতে ভালবাসে। গুরুর পাশে বসলাম। বাঁ হাতে তার বালিশটা ঘাড়ের একটু তলার দিকে নিয়ে এলাম। তারপর সেই হাতেই থুতনিটা একটু ওপরের দিকে ঠেলে বললাম, গুরু মুখখানা একটু ওপরের দিকে তোলো তো—

চোখ খুলতে না পেরে গুরু খুব অস্পষ্ট গলায় জড়িয়ে জড়িয়ে বলতে চেষ্টা করল, কি করবি…

—তোলোই না, যা করব তুমি টেরও পাবে না। থুতনি আরো ঠেলে তোলার কাজটা আমিই করলাম। তারপর চেপে ধরে চোখের পলকে যা করার করে ফেললাম। ফিনকি দিয়ে এক ঝলক রক্ত আমার চোখে মুখে দাড়িতে আর জামায় লাগল। কিন্তু নিশ্চিন্ত না হওয়া পর্যন্ত আমি থামি কি করে? ক'সেকেণ্ডই বা লাগল। গুরু বার কয়েক মাত্র হাত-পা ছুঁড়ল। আধ-কাটা খাসীকে আমি এর থেকে ঢের বেশি পা ছুঁড়ে দাপাতে দেখেছি। নেশার জন্য অত পারে

নি কি কি জন্য আমি জানি না। আমার দু'হাতে লালে লাল। ফরাস রক্তে ভেসে যাচ্ছে। গুরুর রক্ত যে এমন বিষম লাল আর এত গরম কে জানত। ছুটে বাথরুমে এলাম। ভালো করে মুখ হাত ধুলাম। জামাটা খুলে পুঁটলি করলাম। আমার হাতে সময় খুব নেই জানি। পুলিশ ধাওয়া করার আগে বাড়ি গিয়ে শিবু কাকার তরুণের মন লিখে ফেলতে হবে।

রিকশা চেপে বাড়ি চলে এলাম। লিখতে বসলাম।....যা বলছিলাম, ওই বীভৎস রঙিন পোকাটা বারমুডা লিলির কাছে পেঁাছে যাবে এ কেমন করে হয়? কি করে হয়। অথচ পরশু মাঝরাতে আমি সেই স্বপ্নই দেখে উঠলাম। দেখলাম সেই সবুজ ডাঁটা বেয়ে বেয়ে ওটা সত্যি উঠছে। উঠছেই। যত উঠছে ততো ওটার দু'চোখ আরো লোলুপ বীভৎস হয়ে উঠছে। প্রায় ডগা পর্যন্ত উঠতে একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়ে আমার ঘুম ভেঙে গেল। তারপর সকালে গুরুর ওখানে যাওয়া পর্যন্ত জেগে জেগেই কতবার যে ওই স্বপ্নের দৃশ্যটা দেখলাম ঠিক নেই। বাঁকা চোরা আটদশটা লিকলিকে পা বার করে ওটা উঠেই, চলেছে।

কিন্তু তা কি কখনো হয়? হতে পারে? এখন আমি নিশ্চিন্ত। ওই লোলুপ বীভৎস রঙিন পোকাটা কোনো দিন আর বারমুডা লিলির নাগাল পাবে না।

কোনদিন না। কখনো না।

৩

এই পরিণাম আমার জানা ছিল। সেটা কবে আসবে, কখন আসবে, কোন পথ ধরে আসবে বা শেষের আসর ঠিক এই রকমই জমে উঠবে কিনা আমার বিক্ষিপ্ত চিন্তার মধ্যে সেটা তেমন বড় হয়ে ওঠে নি। জীবনের শুরুতে কোনো ভ্রষ্টলগ্নে আমি কক্ষচ্যুত হয়েছিলাম। তখন থেকে নিজের গোচরে হোক বা অগোচরে হোক, একটা লক্ষ্যবর্তিকা আমার মনের তলায় উঁকি-ঝুঁকি দিত। মনে হত, ওই বাতিটা হাতে নিতে পারলে দস্যুর মতোই আবার সেই হারানো কক্ষের একান্ত নিভৃতে নিজের জায়গাটি অধিকার করে নেব।

ওই বাতি হাতে পাওয়াটাই লক্ষ্য, সেটাই পরিণাম। এই লক্ষ্য পরিণামকে বেষ্টন করে একটা ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে পড়ে কেবলই পাক খেয়ে চলেছিলাম। তাই ওই আলোর দিকে আমার হাত বাড়ানোটা এত বিসদৃশ, এমন অস্বাভাবিক। অন্ধ আবেগে সেটা ভয়াল নিষ্ঠুর কুটিল। আমার সত্তা দ্বিখণ্ডিত, সেই আক্রোশে নিজের মধ্যে আমি এক আত্মধ্বংসী ঘাতক পুষেছি, এক হিংস্র পশুকে লালন করেছি। ওই আলো দিয়ে আমার খণ্ডিত সত্তা কোনো আলো জ্বালতে চায় নি, কারো বুকের তলার অন্ধকার দূর করতে চায় নি। মশাল জ্বালতে চেয়েছে, আগুন জ্বালাতে চেয়েছে।

সেই মশালের আগুনে হিংস্র ক্ষমাশূন্য উল্লাসে নিজের তাণ্ডব নৃত্য কত দেখেছি, ঠিক নেই। শব্দশূন্য চিৎকারে প্রতিশোধের একটা জ্বলন্ত গোলা এক রমণীর বক্ষ লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিয়েছি—মা ইন্দুমতী, তুমিও দেখো, তোমার ছেলে কেমন জ্বলছে আর পুড়ছে, দেখো! দেখো দেখো দেখো!

আজ যখন ওই আলোর কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছি, হাত বাড়ালেই ধরা যায় এতকাছে—তোমরা শিউরে উঠছ, ওই পরিণামের গহ্বর

থেকে আমাকে টেনে ফেরাতে চাইছ। তোমাদের বেদনার্ত মুখ দেখে আমি অট্টহাসি হেসে যাব, ভেবেছিলাম। কিন্তু তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। আমি অবাক হয়ে দেখেছি এ কোনো মশাল নয়, ক্ষত-বিক্ষত জীবনের এ কোনো রক্তের আখরে লেখা মাশুলও নয়। এই পরিণামের মুখে পা ফেলামাত্র সর্বগ্রাসী পঙ্কিলতার সেই ঘূর্ণাবর্ত ছায়ার মতো মিলিয়ে গেছে। ভয়াল দুঃস্বপ্ন ঘুমের ঘোরে যেমন অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে তোলে, কিন্তু চোখ মেলে তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যায়, তেমনি। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাসে বুক ভরে ওঠে তখন। আমারও তাই হয়েছে, তাই হচ্ছে। এই অস্তিত্ব যেন এক স্বস্তির সমুদ্রের ওপর হালকা ভেলার মত ভাসছি। তার প্লাবনে পৃথিবী বিহ্বল বুঝি।

পরিণামের এই আলোর রঙে আমার চোখের সামনে সমস্ত দুনিয়ার রঙ বদলের উৎসব শুরু হয়েছে। আমার এই জড় দেহের শিরায় শিরায় সেই অলক্ষ্য দক্ষশিল্পী তীব্র বেদনার মিড় টেনে চলেছে। তাই দেখে বারবার তোমরা শিউরে উঠছ। কিন্তু বিশ্বাস করো, এক আসন্ন প্রত্যাশার নিবিড়তায় আমার এই নিথর দেহের সমস্ত শিরা উপশিরার তলায় তলায় এক অদ্ভুত স্পন্দন চলছে। খণ্ডকালের এই ছোট পিঞ্জরটার মধ্যে আর আমি কুলিয়ে উঠছি না দেখে তোমাদের এমনি আতঙ্ক কেন? এত আকুলতা কেন?

নিজের আনন্দে বিভোর, তাই তোমাদের করুণ মুখগুলো আমি ঝাপসা দেখছি। মা ইন্দুমতী, তোমার মুখখানা এমন পাথর কেন? এত সব সেরা অভিনয় করার পর একটা সাদা মাটা অঙ্কে এসে এই কাণ্ড তোমার! তুমি কি বুঝতে পারছ না, মরীচিকাতে প্রেতের নাচ শেষ করে তোমার সুমন অনেক অনেক ব্যবধান পেরিয়ে যেখানে ছিল ঠিক সেইখানেই ফিরে এসেছে। তুমি শিল্পী, আর ওই অলক্ষ্য শিল্পীর কাজ দেখে তুমি মুগ্ধ হতে পারছ না? তাহলে তোমার পাশে তাকাও, বাবার মুখখানা দেখো, আর তার পাশে নতুন মায়ের মুখখানাও। এবারে পারছ মুগ্ধ হতে? ওই শিল্পী রসিক কতো, বুঝতে পারছ?

যশোদা, তুমিও এসে গেছ। কী কাণ্ড, ঘরে তোমার গোপাল কাঁদছে না? আর শোভা মিতা তোমরাই বা খবর পেলে কি করে? রেডিও আর খবরের কাগজগুলো সব দেশ থেকে তুলে দেওয়া যায় না!

দোহাই তোমাদের, তোমরা আর যাই করো, শোক করো না। আমার এই স্তব্ধ অনাবিল মুহূর্তগুলিকে শোকের শেকল পরিও না। এই কপালে শোকের তিলক কেটে দিয়ে তোমাদের অতি সাধারণ সুমনকে অসাধারণ করে তুলতে চেও না। মিনতি রাখো, শোক করো না—শোক করো না।

*　　*　　*　　*

চোখ বুজলে এমন কি চোখ চেয়েও অনেক সময় সাত বছরের কালো-কুলো একটা মিষ্টি-মুখ ছেলেকে আমি দেখতে পাই। ওই ছেলেও চেয়ে চেয়ে দেখে আমাকে, কারণ আমি তাকে অহরহই ডাকি। দুষ্টু দুষ্টু ডাগর চোখ, এক-মাথা ঝাঁকরা চুল, ফোলা-ফোলা দুই গালে যেন টোকা দিলেই অভিমান ঝরবে। আমি ওকে বলি, হ্যাঁ রে, তুই কি কোন দিন বড় হবি নে, কাছে আসবি নে?

ওই ছেলেটা আমি নিজেই। ওর নাম সুমন।

ও আমার ডাক শোনে, কথা শোনে না।

আমি ওকে বলি, দেখ্ সুমন, আসলে তো তুই আর আমি এক, তুই ছোট সুমন আমি বড় সুমন। কিন্তু তুই আলাদা হয়ে গিয়ে আমার ভিতরটা আধখানা করে রেখেছিস। তুই কাঁদিস, ককিয়ে উঠিস আর সেই যন্ত্রণায় আমিও অস্থির হয়ে উঠি। তুই নিজে অমনি ছোট হয়ে থেকে আমাকেও পঙ্গু করে রাখিস কেন? তার থেকে তুই আমার কাছে চলে আয়, দুজনে এক হয়ে যাই—তোরও মুক্তি, আমারও মুক্তি।

ও গাল ফুলিয়ে চোখ পাকিয়ে বলে, আসলে নিজের মধ্যে নিয়ে তুমি আমাকে মেরে ফেলতে চাও। তুমি তো একটা খুনে—দিন-রাত কেবল মাকে মেরে ফেলার বুদ্ধি আঁটছ মাথায়, যে-ই তাকে মারার জন্য হাত তোলো আমি আর্তনাদ করে উঠি, আর তখন তুমি হাত

গুটিয়ে নাও। সেই জন্যেই নিজের মধ্যে নিয়ে গিয়ে আমাকে মারার মতলব তোমার।

কচি মুখের ওই কথা শুনে আমার তাজ্জব লাগে। বলিস কি রে! আমি তো শুধু মাঝে মাঝে নিজেকেই মারতে চাই!

একই কথা। সেই মারও শেষ পর্যন্ত মায়ের বুকে গিয়ে লাগবে, তুমি ভালই জানো। আমার সঙ্গে তোমার অনেক তফাত, আমি মায়ের জন্য কেঁদে মরছি, আর তুমি মায়ের ওপর কেবলই ফুঁসছ।

কিন্তু তোর ফোঁস-ফোসানি জমা করে করেই তো আমি এত বড় হয়েছি, আর আমার এই হাল হয়েছে! এখনো এই দুর্দশাই চলেছে। বোকার-মতো নিজেও ভুগছিস, আমাকেও ভোগাচ্ছিস। তার থেকে চলে আয় আমার কাছে, আমার মধ্যে থেকেও এভাবে আলাদা হয়ে থাকিস নে।

না না না! ও মাথা ঝাঁকিয়ে ক্ষোভটা আমার দিকে ছুঁড়ে দেয়। আমি আলাদা বলেই আমাকে তুমি কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ। আমার জন্যে তুমি আধখানা হয়ে না থাকলে এতদিনে তুমি ক'টা খুন করে বসতে ঠিক নেই। মায়ের কথা ছেড়ে দাও, আমি না থাকলে ওই যশোদা আর শোভা আর ওই মিতাকেই কি তুমি আস্ত রাখতে? মরে কালি মেরে যেত না ওরা এতদিনে?

আমি যখন ওকে আদর করে ডাকি, ও আমাকে তখন এমনি করেই নাস্তানাবুদ করে। বললাম, তুই তো ওই ছোটটিই হয়ে আছিস, ওরা কে কেমন, বা আমার কাছে কি চেয়ে ছিল আর কোন মৃত্যুর স্বপ্নে বিভোর হয়েছিল, তুই জানবি কি করে?

ও মুখ মুচকে জবাব দিল জানার দরকার কি। মেয়েছেলে দেখলেই তুমি তার মধ্যে ভর-ভরতি মেয়ে দেখো আর ওমনি অপমানের আগুনে তাকে দগ্ধে মারতে চাও। আর আমি তাদের মধ্যে মা-কে খুঁজি, মা-কে খুঁজে বার করে তোমার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে তবে তুমি হাত গোটাও। শোভা-মিতারা ভাবে, বাইরে তুমি যেমনই হও, ভিতরটা তোমার কত সুন্দর দরদের পাতে মোড়া। ওদের

ছেড়ে নিজের পঁয়তাল্লিশ বছরের মাকে তুমি কোন্ মূর্তিতে দেখো এক এক সময় জানো না? সেদিন থিয়েটার হলে গ্রীনরুমের একগাদা মেয়ের সামনে মায়ের গলা টিপে ধরার জন্য তোমার হাত নিশপিশ করে ওঠেনি? সেদিনও আলাদা হয়ে তোমাকে না আটকালে কি হত?

ওর সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। আমারই বুদ্ধি নিয়ে ও এঁচড়ে পেকেছে। না, হাত যতই নিশপিশ করুক, রক্ত যতই মাথায় উঠুক—কিছুই আমি করতাম না। ওই খুদেটা আমার ভিতর দেখতে পায় বলে ভয় পায়।

হ্যাঁ, মনে আছে। নতুন চমক লাগানো নাটক 'চক্র' দেখতে আমিও গেছলাম। অনেক আগে থেকে চেষ্টা করে টিকিট সংগ্রহ করতে হয়েছে অন্যের মারফত। অপরের মারফত কারণ, সিনেমা রাজ্য আর থিয়েটাব জগতের প্রায় সমস্ত কর্মকর্তারাই মায়ের দৌলতে আমাকে চেনে। এও আমার এক বড় রকমের দুর্ভাগ্য। দেখে ফেললে আর চিনে ফেললে সকলেই খাতির করে, ঘটা করে আপ্যায়ন জানায়।

চক্র নাটকে নামধন্যা নায়িকা বিপাশা দেবীর রঙ্গমঞ্চে দ্বিতীয় দফা এই বৃহৎ আবির্ভাব। প্রথম বার প্রায় এক বছর ধরে 'বিজয়িনী' নাটকে অভিনয় করে থিয়েটারের মালিকদেয় টাকার তহবিল ফাঁপিয়ে তুলেছে। সেটা ছিল ইতিহাসভিত্তিক আখ্যান। এটা সামাজিক।

মা ইন্দুমতী চিত্রজগতের যশস্বিনী নায়িকা বিপাশা দেবী। আজ অনেক বছর হযে গেল ওই নামের সঙ্গে দেবী যুক্ত। ব্যক্তিজীবনে বার কয়েক পদবী বদল হয়েছে কিন্তু শিল্পী-জীবনে দেবী স্থায়ী আসন নিয়েছে। গোড়ায় ছিল বিপাশা সরকার—ঘরে যখন ইন্দুমতী সরকার।

বাইশ থেকে উনচল্লিশ—এই দীর্ঘ আঠার বছর সে ছিল ছায়াচিত্র জগতের সাম্রাজ্ঞীর মতো। উদ্ধত আত্মচেতন অনন্যাগোছের কেউ নয়। বরং উল্টো। মার্জিতরুচি, সরলবুদ্ধি, বিনয়নম্র, নির্ভরশীল

আচরণ সকলের সঙ্গে। এটাই তার বড় আকর্ষণ, এতবড় সাফল্যের পিছনে এটুকুই বড় পুঁজি। আমি তাকে কাছ থেকে দেখেছি, দূর থেকে দেখেছি। তার কোন আচরণ অভিনয় আর কোনটা নয়, তা আজও আমার কাছে স্পষ্ট নয় খুব। বাঘা সমালোচকরা তার সম্পর্কে বলে থাকে, মহিলা কোনো সময় অভিনয় করে না বলেই, এত বড অভিনেত্রী সে। এক বড় অভিনেত্রী সে। এক-একসময় মনে হয়, খুব অতিশয়োক্তি নয়। ছবিতে যেমন, ছবির বাইরেও তেমনি। শান্ত স্নিগ্ধ, ঠোঁটের ফাঁকে মৃদু মৃদু হাসি, ডাগর সরল চাউনি—আবার প্রয়োজনে অটুট গম্ভীর তীক্ষ্ণ কঠিন অচপল অচঞ্চল। ছবিতে তার এই দুই রূপ, ঘরেও। অবশ্য আমি যে ঘরের কথা বলছি সেটা আমাদের ঘর—উনিশ বছর আগের আমাদের সেই ঘর। তারপরেও এ যাবত বহুবার তাকে দেখেছি, তার ঘরে দেখেছি, ঘরের বাইরেও দেখেছি। আমার ধারণা ওই রূপের রকমফের খুব একটা হয় নি। তার ভিতরে বাইরে ওইরূপ মিশে আছে। ওই দুটো রূপ তার ঘর ভেঙেছে আবার নতুন ঘরের হাতছানি আর আশ্বাসও জুগিয়ে এসেছে! তার থেকেও বড় কথা—ওই দুটো রূপই তার এতবড় প্রতিষ্ঠার মূল ভিত। তাই এমন এক সার্থক রূপের আজও খুব একটা রং-বদল হয়েছে বলে মনে হয় না।

এত বড় অভিনেত্রী ইদানীং রঙ্গমঞ্চের দিকে ঝুঁকেছে কেন, সে সম্পর্কেও আমার একটা সাদা-সাপটা ধারণা আছে। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের দাগটা ক্যামেরায় ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়। উনচল্লিশ বছর পর্যন্ত প্রসাধন আর মেক-আপ-এর দৌলতে টেনেটুনে চালানো গেছে। চালানো গেছে বলতে নায়িকার ভূমিকা উতরে দেওয়া গেছে। তারপর আর সেটা সম্ভব হয়ে উঠছিল না, বয়সের ছাপ পড়ছিলই। ফলে এখন আর নায়িকা নয়, নায়িকাসদৃশার ভূমিকা তার। আজও বক্স-অফিস আর্টিষ্ট হিসেবে বিপাশা দেবীর নামটা তুচ্ছ নয়, কিন্তু প্রযোজক বা পরিচালকের তাগিদে গল্পের লেখককে তার কাহিনীতে নায়িকাসদৃশা দিদি বা বউদির ভূমিকা বুনে দিতে হয়।

ছোট ছেলে বা মেয়ে বা মায়ের গুরুত্বপূর্ণ কোনো রোল্ থাকলেও সবার আগে তার ডাক পড়ে।

কিন্তু এ-দেশের ছবির গল্পে অক্ষত কুমারীকন্যার চাহিদা যতো, ততো আর কিছু নয়। ছবিতে প্রেমের কাহিনী রূপায়ণ একমাত্র বাণিজ্যিক বস্তু। সেই প্রেম কোনো বিধবার অথবা কোনো বিবাহিতা রমণীর (স্বামী-প্রেম নয়) হলে সেটা পরিত্যাজ্য। টাকা ঢেলে কোনো প্রযোজক ছবিতে সেই জটিল প্রেম সচল করার ঝুঁকি নেবে না। ছবির প্রেম নিতান্তই বিশুদ্ধ নিকষিত হেম হওয়া চাই।

ফলে যত নামজাদা অভিনেত্রীই হোক, ছবির বাজারে বিপাশা দেবীর চাহিদা স্বাভাবিকভাবেই কমে আসছিল। কিন্তু শুধু সেই কারণেই কি মঞ্চের দিকে ঝুঁকেছে সে? আমার মনে হয় না। কারণ এই আকর্ষণের পিছনে আর্থিক অপ্রাচুর্য অথবা মোহ কিছু থাকার কথা নয়। একটানা দশ বছর ছবির বাজারে সব থেকে চড়া দামের শিল্পী ছিল সে। শুনেছি, ওই ক'টা বছর ছবি পিছু খুব কম করে এক লক্ষ টাকা দেবার ক্ষমতা না থাকলে কোনো প্রযোজক তার দিকে এগোতেও সাহস করত না। মহিলার সঞ্চয়ের পরিমাণ নিয়ে কখনো মাথা ঘামাই নি, তবু ধারণা, ফেলে ছড়িয়ে পঁচিশ তিরিশ লক্ষ টাকার কম হবে না। এছাড়া নিজের বাড়ি-গাড়ি-সোনা-গয়না তো আছেই।

না টাকাটা বোধহয় কোনদিনই তার অভিনয়-জীবনের একমাত্র কাম্য বস্তু ছিল না। এ-দেশের ছবির রাজ্যে ওই শিল্পীর মাথায় যখন অনন্যার মুকুট ঝলমল করছে, বোম্বাই বা মাদ্রাজের ধনকুবের হিন্দী ছবির প্রযোজকরা তখন তার কাছে হামেশাই ছুটে এসেছে। সে-খবর কাগজে আর সিনেমার মাসিক সাপ্তাহিকে ছাপা হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্তও কোনো হিন্দী ছবির চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করার খবর বেরোয় নি। যে স্বাক্ষরের রূপালি মূল্য বাংলা ছবির পাঁচ-সাত গুণ বেশি।

আর সেই সূত্রে সিনেমার মাসিক সাপ্তাহিকগুলোতে শিল্পীর মাথায় যে কতভাবে স্তুতি আর প্রশংসা বর্ষণ করা হয়েছে, ঠিক নেই।

অত্যুৎসাহী গুণমুগ্ধ চিত্র সাক্ষাৎকারের বিবরণও ফলাও করে ছাপা হয়েছে।

প্রশ্ন, হিন্দী ছবিওয়ালারা এভাবে ডাকাড়াকি করছে, আপনি যাচ্ছেন না কেন?

হিন্দী জানি নে।

সেটা কোনো সমস্যাই নয়, কত আর্টিষ্ট তো দিব্বি শিখে-পড়ে কাজ চালিয়ে নিচ্ছে।

জবাব, তাঁরা আমার থেকে ঢের বড় গুণী হবেন।

চিত্র সাংবাদিক (সহাস্যে): এটা যে ঠিক বললেন না, এও আপনি নিশ্চয় জানেন?

জবাব (সহাস্যে): নিশ্চয় জানি না। তবে মনে হয়, শিখে পড়ে ফুলের ওপর রচনা লেখা যায়, ফুল ফোটানো যায় না।

মুগ্ধ চিত্র সাংবাদিক: তাহলে এটা ধরে নিতে পারি, শিল্পী-জীবনে টাকাটা আপনার আদৌ বড় লক্ষ্য নয়, আপনার শিল্প প্রতিভা কোন-রকম জোড়াতাপ্পির সঙ্গে আপোসে নারাজ?

স্মিত জবাব: ধরে নিয়ে ও-কথা কাগজে লিখে দিলে বেশ বাহবা পাব। কিন্তু আসলে সেটা ডাহা মিথ্যে—নতুন কোনো পরীক্ষার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাই না ভয়ে।

চিত্র সাংবাদিক (সবিস্ময়ে): এত দিনের এত অভিজ্ঞতার পরেও আপনার ভয়। এটা কি বিশ্বাসযোগ্য কথা!

বিশ্বাস না করলে আমার সুবিধে। (এই জবাবে মিষ্টি হাসির আধিক্য ছিলই মনে হয়)।

চিত্র সাংবাদিক (নাছোড়বান্দা তবু): কিন্তু ভয় কেন?

সরল সুললিত জবাব: আসলে তো আমি খুব একটা সাধারণ মেয়ে। প্রতিভার চটকদার বোঝা যত আপনারা মাথায় চাপাচ্ছেন ভিতরে ভিতরে ততো ভয়। তবু আপনাদের দেওয়া ওই সার্টিফিকেটের প্রতি লোভ তো আমার আছেই, তাই মনে হয়, নতুন কিছুর মধ্যে গিয়ে ধরা পড়ে মরি কেন!

জবাব শুনে শুধু কি ওই চিত্র সাংবাদিক মুগ্ধ হয়েছিল? না, পড়ে আমিও মুগ্ধ হয়েছিলাম। আগে কত শত সহস্র জন মুগ্ধ হয়েছিল, ঠিক নেই। বিপাশা দেবী তোমার অস্তিত্ব থেকে মা ইন্দুমতীকে সরাতে পারলে আমিও যে তোমার কত বড় এক ভক্ত, জানো না। মানুষকে মুগ্ধ করার সহজাত কৌশল তোমার স্বভাবের সঙ্গে মিশে আছে। তাই ভাবতে অবাক লাগে, এ কৌশল তুমি একজনের ওপর খাটালে না কেন, খাটাতে পারলে না কেন? খাটাতে পারলে না, না কি খাটাতে চাইলে না? সেই জন্যেই লোককে মুগ্ধ করার তোমার এই সহজ কৌশলই আমার অভিনয় মনে হয়।

কোনো বোঝাপড়া হবে, হবেই, সেইদিন আমি বুঝে নেব, তুমি শিল্পী বড় কি অভিনেত্রী বড়। ঠিক এই গোছের কথা শুনে শোভা গাঙ্গুলি একদিন বড় অবাক হয়েছিল, মনে আছে। বলেছিল, শিল্পী কি অভিনেত্রী নয়, না কি অভিনেত্রী শিল্পী নয়, দুইয়ে তফাত কি?

জবাব দেব কি, এই গোছের বোকা বোকা প্রশ্নের জবাব হয় না, আপনা থেকে না বুঝলে বোঝানো যায়! নিজের বুকে একটা আঙুলের টোকা মেরে বলেছিলাম, এইখানটায় একটু তফাত আছে।

তফাত বোঝার আগ্রহে শোভা গাঙ্গুলি একটা স্থূল জাল ফেলতে চেষ্টা করেছিল আমার চোখের সামনে। টেবিলে দুই কনুই ভর দিয়ে দু'হাতের চেটোয় দুই গাল রেখে আমার দিকে একটু ঝুঁকে বসে বেশ নিবিষ্ট মাধুর্যে কথা কইছিল আর কথা শুনছিল। এবারে বাঁ হাতটা গাল থেকে নামিয়ে চাঁপার কলির মতো মধ্যমা বার দুই-তিন নিজের বুকে ঠুকে আবার জিজ্ঞাসা করেছিল, অভিনেত্রীদের কি এই জায়গাটা নেই।

বেচারী শোভা গাঙ্গুলি। আমার হাসি পেয়েছিল অবশ্য, কিন্তু চাউনিটা বোধহয় খরখরে হয়ে উঠেছিল। বলেছিলাম, আমার মা হলে কি করত জানো? গাল থেকে হাত দুটো নামিয়ে একটু নড়েচড়ে বসার ফাঁকে শাড়ির আঁচলটা আর একটু ভালো করে টেনেটুনে দিত তারপর সাদামাটা হোমিওপ্যাথিক বিস্ময়ে মুখের দিকে

চেয়ে থাকত খানিক, তারপর চোখের পাতা দুটো শুধু একবার নীচের দিকে নামিয়ে ঠিক তোমার মতো করেই জিজ্ঞাসা করত, অভিনেত্রীদের কি ও-জায়গাটা নেই ?

শোভা গাঙ্গুলির কান-মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। ওর রং ফর্সা। মায়ের তুলনায় ঢের বেশি সুশ্রী। ওর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য না করেই যেন বক্তব্যটা আর একটু নরম আর প্রাঞ্জল করে তুলতে চেষ্টা করেছিলাম। চটকদার অভিনেত্রী আর জাতশিল্পীর মধ্যে এও একটা বড় তফাৎ, বুঝলে ? চটকদার অভিনেত্রীর চমক বেশি, প্রকাশ বেশি, আর জাতশিল্পী যেটুকু অনাবৃত করে, তার থেকে যেন ঢেকে রাখে বেশি—উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে দেখতে লোভ জাগে।...তবে আমি যে তফাতের কথা বলছিলাম সেটা অন্য ব্যাপার। একটা ধরো ডালিয়া আর একটা রজনীগন্ধা।

যাক, কথা হচ্ছিল মায়ের মঞ্চাভিনয়ের প্রতি আকর্ষণ আর তার লেটেষ্ট অবদান চক্র নাটক প্রসঙ্গে। আমি নিঃসংশয়—এ-ঝোঁক অর্থের তাগিদে নয়। টাকা তার প্রচুর আছে এবং আরো একশ' বছর বেঁচে থাকলেও ওতে টান ধরবে না। তাছাড়া ইচ্ছে করলে দিদি-বউদি অথবা কিশোর-কিশোরীর মায়ের বাছাই করা রোল-এ তাকে পাবার নামী পরিচালক প্রয়োজকরা এখনো হামেশাই তার কাছে ছোটাছুটি করে। তাদের ডাকে সাড়া দিলে এখনো মঞ্চের বিশ তিরিশ গুণ বেশি রোজগার হতে পারে। কিন্তু বেশির ভাগ পরিচালক প্রযোজককেই সে ফিরিয়ে দিয়ে থাকে।

এতটা উৎসাহ আর উদ্দীপনা নিয়ে মঞ্চে নেমে আসার দুটো কারণ বোধহয়। প্রথম এর মাদকতা ভিন্ন স্বাদের। কবির কাজ অভিনেতা অভিনেত্রী আর কলাকুশলীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ক্যামেরার আর শব্দ-যোজনার কারসাজিতে অনেক ফাঁক আর ফাঁকি ভরাট করে দেওয়া যায়। কিন্তু মঞ্চে সোজাসুজি রসপিপাসু খদ্দেরের যাচাই বাছাইয়ের মুখোমুখি এসে দাঁড়ানো। এখানে কোনো ফাঁকির কারবার নেই। গোটাগুটি নগদ বিদায়ের ব্যাপার। সে বিরূপ

হলে তার অভিব্যক্তি মুখের ওপর ছুঁড়ে মেরে দেবে, খুশি হলে সরব উচ্ছ্বাসের অর্ঘও পাঠাবে।

বিপাশা দেবীর মঞ্চপ্রীতির আড়ালে এটাই একমাত্র কারণ মনে হয় না। আসল কারণ, বয়েস যেমনই গড়াক, নিজের কাছে নিজে সে এখনো দ্বিতীয় রহিতা। তাই প্রথম সারিতে এখনো স্থান চাই তার। সে বিশ্বাস করে এই পঁয়তাল্লিশেও তার দেবার বস্তু ফুরিয়ে যায় নি। এই দেবার সংজ্ঞায় ভিতরের সম্পদ এখনো পঁচিশ তিরিশের মতো তাজা আছে। এখনো সে ফলভারে আনত, ক্যামেরার ভ্রূকুটিতে নিস্ফলা হয়ে যেতে রাজি নয়। ক্যামেরায় বয়সের দাগ পড়ে, কিন্তু সুপটু প্রসাধনে হল-ভরতি সারি সারি স্থূল চক্ষুগুলোতে তার দাগ পড়ে না। এই মরুভূমিতে সে যে রূপ নিয়ে এসে দাঁড়াবে, সে তাই। তার দেবার বস্তু নেবার জন্যেই সাগ্রহে বসে আছে সব, যতদিন দিতে পারবে ততদিন বুক ভরে আর মন ভরে নিয়ে যাবে।

বিজয়িনী নাটকে তাই নিয়ে গেছে সব। এই পঁয়তাল্লিশেও সম্পূর্ণ বিজয়িনী হয়ে ফিরেছে সে। যে বিজয়িনীর কোনো বয়েস স্থূল হিসেবের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ নয়, যে বিজয়িনার নিভৃতের অন্তঃপুরিকাটি শাশ্বত চির যৌবনা।

সামাজিক চক্র নাটকেও ওই বিজয়িনীকেই স্বতঃস্ফূর্ত করে তোলার দ্বিতীয় অভিযান তার। ভিন্ন রূপ আর আরো একটু বিশ্বাসযোগ্য আঙ্গিকে ওই বিজয়িনীর স্বাক্ষর অপ্রতিহত রাখার অটুট অভিলাষ।

আমার বিবেচনায় বা বিচার বিশ্লেষণে চক্রের কাহিনী এমন কিছু বর্ণোজ্জ্বল নয়। বরং মামুলি আখ্যান বলা যেতে পারে। কিন্তু নাটক লোক-চক্ষুর সামনে মঞ্চস্থ হবার আগেই বিজ্ঞাপনের চটকে অভিনবত্বের ছাড়পত্র পেয়েছে। এসব ক্ষেত্রে রামের আগে রামকাণ্ড রচনার মতো প্রচারের আবহাওয়া সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। কাগজে সে সব চুটকি ব্যাপারগুলো ফলাও করে ছাপা হয়।...যেমন, শুধু ছায়াচিত্রের নয়, মঞ্চেরও অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী অভিনেত্রী দিনের পর দিন মাসের মাস নাট্যকারের সঙ্গে বসে নিজের ভূমিকা গঠনের কাজে বিপুল সহায়তা

করেছেন। সংযোজন এবং পরিবর্জনের তুলাদণ্ড হাতে বসে আপন ভূমিকাটি আত্মিক সম্পদ করে তুলেছেন। অতএব অনন্যা শিল্পীর এ যে এক স্মরণীয় সৃষ্টি হয়ে থাকবে তাতে আর সংশয়ের অবকাশ কোথায়?

নাটকের কাহিনী তখনো অজ্ঞাত আমার। বিজ্ঞাপনের ওই চমকের জবাবে মার্কা মারা এক তেরছা চরিত্রের কাগজে স্বনামে আমি একটা চিঠি লিখেছিলাম। লিখেছিলাম, আমাদের সাহিত্য আর নাটক অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সঙ্গগুণে আর সহৃদয় সহযোগিতায় কোন্ সার্থকতার দিকে গড়াতে চলেছে? যে নাট্যকার কোনো অভিনেত্রীর সঙ্গে বসে তার সহযোগিতায় সৃষ্টি পথে বিচরণ করেন, নাট্য সরস্বতী তার ওপর কতটুকু নির্ভর করতে পারেন; আর নামী অভিনেতা অভিনেত্রীরাই বা এই সহযোগিতা দেবার স্পর্ধায় এগিয়ে আসেন কোন্ গুণে? কাব্য সাহিত্যের এই বন্ধ্যা যুগের কান্না শুনে গিরীশ ঘোষ কি আবার রমণীর রূপ ধরে পুনর্সম্ভবামি হয়েছেন?

বলা বাহুল্য, চিঠিখানা ওই তেরছা মুখো চরিত্রের কাগজে ছাপা হয়েছিল। চিঠির গুণে নয়, ছাপা হয়েছে আমার গুণে। আমার সঙ্গে ওই অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী অভিনেত্রীর সম্পর্কটা কাগজের কর্মকর্তাদের জানা আছে বলে। ছাপা কাগজের এক কপি যে ডাকে ওই অভিনেত্রীর কাছেও চলে গেছে তাতেও কোনো সন্দেহ থাকলে ও চিঠি ছাপাই হত না।

নাটকের মূল কথা স্বল্পপরি সরে পংক্তিবদ্ধ করা যেতে পারে।... গরিবের ঘরের এক ছেলে ডাক্তার হয়ে বসার পর এই কালের লোভের বলি হতে চলেছে। সেবার বদলে সে মৃত্যুবাণ হাতে নিয়েছে। যত তার পসার বাড়ছে, ততো তার লোভ বাড়ছে, আর কালো রাস্তাটি প্রশস্ত হয়ে উঠছে। বাধা কোথাও নেই, বাধা শুধু তার ঘরে।

বাধা তার ঘরের অতি সাধারণ বিবাহিতা স্ত্রীটি। প্রথম অধ্যায়ে সে স্বামীর গরবে গরবিনী, অর্থাগমের প্রাচুর্যে সুহাসিনী। কিন্তু ক্রমে কাঁটার মতো একটা সংশয় বিঁধতে শুরু করেছে তার হৃদয় নামে কোমল

বস্তুটির ওপর। আর তারপর যত দিন যাচ্ছে, সেই কাঁটা ছুরির ফলা হয়ে তার বুকের তলায় কাটা ছেঁড়া করে চলেছে। স্বামীর লোভের ব্যাধি এতদূর গড়িয়েছে যে তাকে ফেরানোর সকল চেষ্টা ব্যর্থ। শেষে কোনো রোগিনীর মর্মান্তিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে আদালতে এক চাঞ্চল্যকর বিচারের অনুষ্ঠান। আসামী ওই ডাক্তার, আর প্রমাণসহ তার বিরুদ্ধে প্রধান সাক্ষী তার স্ত্রী। দুনিয়ার একটি মাত্র ভালবাসার মানুষকে কঠিন সঙ্কল্পে শুচিশুদ্ধ করে তোলার সাদা নজির রেখে গেল যে রমণী, আর সে অতি সাধারণ নয়, বড় বিচিত্র।

বলা বাহুল্য, আজকের দিনের লোভ পাপ ব্যাভিচার আর হানা-হানির ঝড়ো হাওয়ায় এই গোছের এক ভাবপ্রবণ নাটকের সাফল্যের সবটুকু অভিনয়। কিন্তু মিথ্যে বলব না, আত্মস্থ অভিনয়গুণে ওই রমণী দর্শকের চোখে ক্রমশ বিচিত্র রুপিনীই হয়ে উঠেছিল। তার প্রথম দিকের হাসিখুশি আর স্বামীর প্রতি সরল বিশ্বাস আর নির্ভরতা পুরুষ মাত্রেরই লোভের বস্তু যেন। তার রোষ তার ঘৃণা তার বিদ্বেষ তার নীরব যন্ত্রণাও শুদ্ধ অনুরাগ আর অব্যক্ত আকুতির তাপে মহিমান্বিত। এই মহিমার সামনে দাঁড়িয়ে পুরুষ মুগ্ধ হতে আর অবনত হতে বাধ্য।

আমি জানি, রঙ্গালয়ের এত শত দর্শকের মধ্যে আমার মতো নির্মম-ক্রুর সমালোচনার চক্ষু নিয়ে আর একজনও বসে নেই। অথচ আশ্চর্য, আমিও যেন অবিশ্বাস থেকে এক লোভনীয় বিশ্বাসের দুনিয়ার দিকে পা বাড়িয়েছি। ওই রমণী যেন অভিনেত্রী নয়, যা ঘটছে তার সব-কিছুর সঙ্গে বুঝি তার জীবনের যোগ। সেই জীবন যত ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে, তার চোখে মুখে আচারে আচরণে রমণীসত্তার ওই দুর্লভ দুর্লঙ্ঘ্য মহিমা ততো বেশি এঁটে বসছে।...পুরুষকে ফিরতে হবে, সে না ফিরে যাবে কোথায়?

তিন অঙ্কের নাটক। দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে দর্শকের বিপুল করতালি আর স্বতস্ফূর্ত উচ্ছ্বাসের ডালি নিয়ে দপ্ত সংহত নায়িকা মুগ্ধ দর্শকের

চোখের আড়ালে চলে গেছে। ড্রপ সীন নেমেছে। সমস্ত আলো জ্বলে উঠছে।

আমার ভিতরে ভিতরে সেই থেকে কী একটা যন্ত্রণা শুরু হয়েছিল। নিভৃতের কোন পাতাল থেকে একটা আক্রোশ ঠেলে। উঠে শিরায় শিরায় ছড়িয়ে পড়েছিল। উঠলাম। বাইরে এলাম। তারপর অনেকটা নিজের অগোচরে যেন উইংস-এর দরজা দিয়ে পিছনের অন্দরে চলে এলাম। ভিতর থেকে শব্দশূন্য অব্যক্ত গর্জন করে উঠছে একটা।—এই যদি সত্যি হয়, পুরুষ যদি কল্পনায়ও এ-ভাবে ফিরতে পারে তাহলে যে-ঘরে আমি ছিলাম, সেই ঘর এভাবে ভেঙে গেল কেন? পুরুষ ফেরানোর এই সঙ্কল্প সেদিন তোমার কোথায় ছিল? সাত বছরের একটা ছেলেকে হত্যা করে আজ তুমি রমণীর মহিমা দেখাতে এসেছ? তোমার এই মহিমা দেখে যারা ভুলছে ভুলুক, আমি তোমাকে ক্ষমা করব না, তোমার ক্ষমা নেই—

পিছনে পাশাপাশি তুটো সাজঘর। একটা পুরুষদের, অপরটা মেয়েদের।

আসুন আসুন, মা-কে খুঁজছেন বুঝি? মেয়েদের ঘরের দরজার কাছ থেকে আপ্যায়ন জানালো যশোদা। ফিরে দাঁড়িয়ে ডাকল, মা, কে এসেছে দেখুন!

যশোদা তিন-চার বছর যাবৎ চেনে আমাকে। দেখলে যতটা সম্ভব মুখে খুশিব ভাব ফোটায়, কিন্তু ভিতরে ভিতরে একটু যেন বিব্রত বোধ করে। ডাকসাইটে অভিনেত্রীর স্নেহ কেড়েছে, তাকে ভালবাসে, মা বলে ডাকে। তার কাছেই থাকে। আমাকে দেখলেই বোধহয় মনে হয়, ও আমার জায়গা জুড়ে বসে আছে। বেশ মিষ্টি মেয়ে, মিষ্টি কথা-বার্তা। মিষ্টি মিষ্টি হাবভাব। কোথা থেকে কি-ভাবে এসে অতবড় অভিনেত্রীর বুকের কাছে একটু জায়গা করে নিয়েছে সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ। শিল্পী হবার সাধ যত ছিল সাধ্য ততো ছিল না। রূপ সাধারণ, প্রতিভাও তাই। ছবিতে বা মঞ্চে দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় সারির শিল্পীর কাজ জোটে তার। নিজেই বলে, মায়ের

আশ্রয় না পেলে কোথায় ভেসে যেতাম ঠিক নেই, কেউ একটা ঝিয়ের রোল দিয়েও জিগ্যেস করত না। এখন যেটুকু শিখেছি তাও মায়ের দয়াতেই।

বড় শিল্পীর সুপারিশে অনেকের ভাগ্য ফেরে, সেটা নতুন কিছু নয়। কিন্তু যশোদার মাতৃভক্তি দেখলে আমার কেমন হাসি পায়। ওর এই ভক্তিটা অন্ধ অকৃত্রিম মনে হয় বলেই হয়তো। ওই মা ওর কাছে শুধু গুরু নয়, দেবীও।

কিন্তু সেদিন আমার হাসি পাচ্ছিল না।

ওর ডাক শুনে শিথিল চরণে দরজার কাছে এগিয়ে এলো যে রমণী, সে অনন্যা শিল্পী বিপাশা দেবী, কি চক্রের অন্তঃপুর সীমন্তিনী, কি আর কেউ—সেটুকুই যেন আগে যাচাইয়ের বিষয় আমার।

কি রে, তুই এসেছিস। নাটক দেখছিস নাকি?

এতক্ষণের নিভৃতের সেই গর্জনের অনুভূতিটা আমার দুটো হাতের মধ্যে এসে আকুলি-বিকুলি করতে লাগল হঠাৎ।

এই হাত দুটো যা চাইছে এখন তাই যদি হয়, রমণীর ওই নরম গলার ওপর যদি আস্তে আস্তে উঠে আসে, ধীর অব্যর্থ অমোঘ নিষ্পেষণে, ওই আত্মস্থ নরম দেহের প্রাণটুকু যদি এই দুটো হাতের মুঠোয় টেনে বার করে নিয়ে আসে—তাহলে কে যাবে? শিল্পী বিপাশা দেবী, না চক্রের অন্তঃপুর সীমন্তিনী, না কি আর কেউ?

মাথা নেড়েছিলাম। নাটক দেখছি।

নিজে না আসিস, একটা ফোন করেও তো জানালে পারতিস, দেখতে আসবি, আমি ব্যবস্থা করে রাখতুম।...কেমন লাগছে?

খুব ভালো।

হুঁঃ, তোর ভালো আমি জানি না, কালই হয়তো কাগজে দেখব হুল ফুটিয়ে চিঠি লিখেছিস।....কোথায় বসেছিস, ঠিক মতো দেখতে শুনতে পাচ্ছিস তো?

মোটামুটি। দু'টাকার পেছনের দিকের সীট, কথা কিছু কিছু মিস হবেই।

চকিতে আমার আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে নিল একবার। পরনের জামা কাপড় ধোপ দুরস্ত নয় তেমন। পলকের ভ্রূকুটি। আমার ঠাণ্ডা মূর্তিও হয়তো চোখে শুকনো শুকনো ঠেকল। খাবি কিছু?

হাত দুটোকে সংযত করার জন্যই পকেটে ঢোকালাম। ঠোঁটে হাসি টেনে আনার চেষ্টাটা সেদিন এমন শক্ত লাগছিল কেন, জানি না। তবু চেষ্টার কসুর করিনি। পিছনের আধখানা আড়ালে দাঁড়িয়ে যশোদাও আমাকে দেখছিল। আমার মধ্যে সর্বদাই ও যেন দেখার খোরাক পায় কিছু।

মাথা নাড়লাম, খাবার বাসনা নেই।

পরের অঙ্কের প্রথম ঘণ্টা বাজল। বিপাশা দেবী ঈষৎ ব্যস্ত গাম্ভীর্যে ঘর থেকে আধা-আধি বেরিয়ে এদিক ওদিক তাকালো। ফলে আমার গায়ের সঙ্গে তার গা ঠেকল

এই মুহূর্তে ওই স্পর্শটুকু আচমকা নিষ্ঠুরভাবে নিবিড় করে ফেলতে পারি, অবাধ্য হাত দুটোকে স্বাধীনতা দিতে পারি।....তারপর কে থাকবে? বিপাশা দেবী, না চক্রের অন্তঃরপুর-সীমন্তিনী, না আর কেউ?...মা ইন্দুমতী থাকবে বোধহয়, একটা দুর্বার লোভ দমন করে হাত দুটো শক্ত করে পকেট দুটোর মধ্যে আটকে রাখলাম।

দু'দিক থেকে দু'টো লোক হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো একসঙ্গে। চক্রের এই নায়িকার হাতে তাদেরও দণ্ডমুণ্ডের চক্র যেন।

একে একেবারে প্রথম রো-তে বসিয়ে দিন তো।

লোক দুটোই মাঝখান থেকে আচমকা বিপাকে পড়ল যেন। মুখ কাঁচুমাচু করে একজন বলল, প্রথম দিনের প্রথম শো, হাউস একেবারে প্যাক্ট আপ......

শোনামাত্র মুখে বিরক্তির আভাস। কিন্তু সেও অশোভন মাত্রায় নয়।—যা বললাম ব্যবস্থা করুন, দরকার হলে এক্সট্রা চেয়ার দিন। আমার দিকে ঘুরল। ঈষৎ তপ্ত একটা নিঃশ্বাসের স্পর্শ মুখে এসে লাগল।

এদের সঙ্গে যা। শো-এর শেষে দেখা না করে পালাস না যেন।

ভিতরে ঢুকে গেল। দ্বিতীয় বেল বেজে উঠবে এক্ষুনি।

অসুবিধের কথা বলে ফেলে লোক দুটো আরো বেশি বিব্রত যেন। তাদের একজন সবিনয়ে ডাকল, আসুন স্যর—উইংস্-এর বাইরে আসতে আসতে আবার বলল. কিছু মনে করবেন না স্যর, এক্সট্রা চেয়ার যে কত পড়ে গেছে, উনি তো জানেন না....

বললাম, ব্যস্ত হবেন না, কিছু দরকার নেই।

না না না, তা কি হয়। উনি আদেশ করেছেন যখন, কে আর কি বলবে, আপনি আসুন।

মুখ দেখে মনে হল, তার সঙ্গে সম্মানের আসনে গিয়ে না বসলেই বরং লোকটা বিপদে পড়বে। আলো নিভতে শুরু করেছে। শশব্যস্ত তৎপরতায় অনেকের অসন্তোষ উপেক্ষা করে একেবারে সামনের সারির দুই রো-র ফাঁকে চেয়ার পেতে বসিয়ে দিল আমাকে।

ড্রপ সীন ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় নাটক আবার জমে উঠল। আখ্যানের নায়ক নায়িকা এক অমোঘ পরিণতির দিকে বেগে ছুটেছে। নায়িকার বুকের তলায় এবার এক আপোসশূন্য নিষ্পত্তির আগুন জ্বলে উঠেছে। ফলে দর্শকের চোখে আরো দৃপ্ত, আরো মহীয়সী হয়ে উঠেছে সে।

কিন্তু আমার ভিতরের সুরটা কেটে গেছে। দুই অঙ্কের সেই জমাট-বাঁধা মানসিকতা থেকে আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। স্টেজের গা-ঘেঁসা চেয়ারে বসে আমিই শুধু উসখুস করছি।

ঠিক সেই মুহূর্তটাই আমি বেছে নিলাম। যে মুহূর্তে নায়িকা তার চরম ঘোষণাটি জ্বলন্ত আগুনের মতো ভ্রষ্ট নায়কের মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে স্টেজের একেবারে সামনে.দর্শকদের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। তার পিছনে ভ্রষ্ট নায়কের স্তব্ধ ভয়াল মূর্তি, পাদপ্রদীপের সামনে পাষাণ-স্ফুলিঙ্গ রমণীর মূর্তি, তার সামনে দুরুদুরু বক্ষ মন্ত্রমুগ্ধ দর্শক। ঠিক ওই মুহূর্তটি বেছে নিয়েই আস্তে আস্তে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম আমি। আশপাশে থেকে আর পিছন থেকে বিরক্তিসূচক চাপা শব্দ উঠল একটা। এ-ভাবে উঠে দাঁড়িয়ে যা আশা করেছিলাম

তাই অবধারিতভাবে ঘটল। পার্ট ভুলে, স্থান-কাল ভুলে ওই অনন্যা নায়িকা বিমূঢ় কয়েক মুহূর্ত। সম্ভব হলে সেও আমাকে বাধা দিত, বসতে বলতো।

কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে নির্লিপ্ত মুখে আবছা অন্ধকার পেরিয়ে আমি দরজার দিকে এগোলাম।

পরদিনের কাগজে চক্র নাটকের প্রথম দিনের প্রথম অভিনয় প্রসঙ্গে সাড়ম্বর প্রসংশা ছাপা হল। প্রসংশা অভিনেত্রী বিপাশা দেবীরই বেশি। কিন্তু তার মধ্যে দুটো কাগজ অন্তত লিখেছে, দ্বিতীয় অঙ্কের গোড়ার দিকে নাটকের সঙ্কট মুহূর্তে স্বনামধন্যা শিল্পীর অভিনয়ে স্বল্পক্ষণের জন্য অন্তত কিছু ত্রুটি দেখা গেছল। তখন দুই-একবার তার পার্টও ভুল হয়েছিল, যা কখনো হয় না। অবশ্য পরের অভিনয়ে সেই ত্রুটিটুকু তিনি পুষিয়ে দিতে পেরেছেন।

* * * *

আমি কি জাতিস্মর? চোখ বুজে তন্ময় হলে পূর্বজন্মের দৃশ্য দেখতে পাই?

চোখ বুজে তন্ময় হওয়ার ধাতটা আমার ন'বছর বয়েস থেকেই। কত সময় মালতী মাসি ঠেলা মেরে সেই তন্ময়তা ভঙ্গ করেছে। মনে মনে মালতী মাসির ওপর রেগে আগুন হয়ে গেছি। অথচ মুখে কিছু বলতে পারি নি। সেইজন্যই রাগ হলে আমার কষ্ট আরো বেশি হত। আমার ধারণা নিছক একটা রাগারাগির ফলে একজনকে হারিয়েছি। সেটা বাবা আর মায়ের রাগারাগি। সেই থেকে জিনিসটাকে আমি বিলক্ষণ ভয় করি। বাবা যখন মালতী মাসিকে রাগের সুরে কিছু বলে তখনো ভিতরে ভিতরে আমার কেমন কাঁপুনি ধরে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা মালতী মাসির পিছনে তখন ঘুর ঘুর করি। স্কুলে বসেও সেদিন মালতী মাসির জন্য ভিতরটা উদ্বেগে অস্থির হয়ে পড়ে কেমন। কেবলই মনে হয়, বাড়ি ফিরে যদি দেখি, মালতী মাসিও আর নেই?

বিমনা হওয়ার দরুণ মাষ্টারমশাইদের বকুনি খাই। বাড়ি ফিরে

মালতী মাসিকে না দেখা পর্যন্ত সেই অস্থিরতায় বুকটা সর্বক্ষণ ধুকপুক করতে থাকে।

অথচ আশ্চর্য, রাগকে ভয় করি, রাগকে ঘৃণা করি, কিন্তু কারণে অকারণে রাগ বোধহয় আমারই সব থেকে বেশি হয়, বাবার ওপর রাগ। হঠাৎ একদিন রাত থেকে আর তারপর দিনের পর দিন ধরে যাকে আর বাড়িতে দেখলাম না তার ওপর রাগ, মালতী মাসির ওপর রাগ, নিজের ওপর রাগ, এক এক সময় দুনিয়ার সকলের ওপর আর সকল কিছুর ওপর রাগ। দিনের পর দিন ওই রাগের প্রকোপ আমার মধ্যে বেড়েই চলেছে, প্রকাশ না করে সেটা হজম করে ফেলতে চেষ্টা করার দরুণ কষ্টটাও বেড়েই চলেছে। সেও আমার নিজস্ব একেবারে একলার কষ্ট, কেউ টের পায় না।

আমার অনেক কিছু জ্ঞান আর ধারণার গুরু মালতী মাসি। আমি তাকে সবজান্তা ভাবতাম। পূর্বজন্ম ইহকাল পরকালের সমাচার তার কাছ থেকেই জেনেছি। আমার মনের তলায় কত সময় কত রকমের উদ্ভট প্রশ্ন জাগত ঠিক নেই। শিশুকাল থেকে শহরের এক অভিজাত এলাকায় বাস আমাদের। ছবির মতো সুন্দর সাজানো গোছানো বাড়ি। আশপাশে যারা থাকে তারাও রীতিমতো সভ্যভব্য। এর মধ্যে কয়েক ঘর মাত্র বাঙালি, বেশির ভাগ বাসিন্দারা নানা রাজ্যের পয়সাঅলা মানুষ। তাই ঠিক বাড়ি বসে সর্বসাধারণের বাস্তবরূপ বা বাস্তব জীবন-যাপনের চিত্র খুব বেশি দেখতে পেতাম না। মাঝে সাজে বেড়াতে বেরিয়ে বা স্কুলে যাওয়া আসার সময় যেটুকু দেখতাম, তাই এক এক ধরনের কৌতূহলের উদ্রেক করত।

মনে আছে, মায়ের সঙ্গে এক বিকেলে গাড়ি করে যাচ্ছিলাম কোথায়। পুলিশ হাত দেখানোর দরুণ গাড়িটা থেমে গেছে। সামনে পর পর অনেকগুলো গাড়ি। চেয়ে দেখি ফুটপাথের ওপর শুয়ে আছে কতকগুলো নোংরা ছেলে মেয়ে আর বউ। আমার মতো বয়সের হৃষ্ট কুচ্ছিত ছেলেও আছে দুটো। আর কয়েকটা মানুষ খালি গা, পরনে নোংরা খাটো ধুতি, গাড়িগুলোর সামনে হাত বাড়িয়ে ভিক্ষে চাইছে।

আমাদের গাড়ির সামনের বুড়ো মতো লোকটা মায়ের সামনে হাত পেতে করুণ সুরে পয়সা চাইতে লাগল, আর কত কি বলতে লাগল।

মা-গো, এই ছেলে মেয়েগুলোর দিকে চেয়ে দেখুন, সমস্ত দিন কিছু খায় নি মা, চার আনা পয়সা ওদের মুখ চেয়ে দিয়ে যান মা, খিদের জ্বালায় মরে যাচ্ছি মা-গো, মা মা-গো মা মা—

গাড়িটা চলতে শুরু করার পরেও লোকটা মা মা করে খানিক এসে তারপর থেমে গেল।

আমি অবাক বিস্ময়ে একবার ওই লোকটাকে দেখছিলাম আর একবার মা-কে দেখছিলাম। গম্ভীর বিরক্তিতে মা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসেছিল।

আমার ঠিক ছ'বছর বয়েস তখন। এরমধ্যে কত সময় মাকে কত কি দিতে দেখেছি লোককে, অথচ এত কাকুতি মিনতি শুনেও মা অমন নির্বাক থাকল কি করে, আমার কাছে সেটাই বিস্ময়।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, মা ওই লোকটা পয়সা চাইছিল কেন?

মা ছোট জবাব দিল, ভিক্ষে করছিল।

ভিক্ষে করছিল কেন?

খেতে পায় না বলে।

খেতে পায় না কেন?

খাবার কেনার পয়সা নেই বলে।

তোমার কাছে তো পয়সা আছে, অত করে চাইল, তুমি দিলে না কেন?

মা এবারে বিরক্ত হয়ে ধমকে উঠল, চুপ করে বসে থাকো!

খানিক বাদেই আবার আর এক কাণ্ড দেখলাম। তখনো ভিড়ে আমাদের গাড়িটা দাঁড়িয়ে গেছে। পাশের ফুটপাথ ঘেঁষে কতকগুলো লোক আর একটা লোককে খাটে শুইয়ে বিকট স্বরে বলো হরি, হরি বোল—বলো-ও হরি, হরি বোল বলে চিৎকার করতে করতে চলেছে। মা-ও একবার তাকালো সেদিকে, তারপর অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

আমি শুনেছিলাম, কেউ মরে গেলে তাকে ওভাবে খাটে শুইয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়, নিয়ে গিয়ে কি করা হয়, জানি না।

জিজ্ঞাসা করলাম, মা খাটের ওই লোকটা মরে গেছে ?

হুঁ।

লোকটা মরে কোথায় যাচ্ছে ?

হরি ঠাকুরের কাছে।

ওই লোকগুলো ওভাবে চেঁচাচ্ছে কেন ?

হরি নাম শোনাচ্ছে।

হরি নাম এরকম বিচ্ছিরি কেন ?

মায়ের আবার ধমক, চুপ করে থাকো।

কিন্তু বেশিক্ষণ চুপ করে থাকা গেল না। আবার জিজ্ঞাসা করলাম, যে মরে গেছে, ওই লোকেরা তাকে হরি ঠাকুরের কাছে পৌঁছে দিতে যাচ্ছে ?

হুঁ।

হরি ঠাকুর কোথায় থাকে ?

স্বর্গে।

এরোপ্লেনে করে নিয়ে যাবে ?

চুপ করবি তুই, না কি ? কেবল বকর-বকর, বকর-বকর—

দু'কথার পর তিন কথাতেই মা ওমনি করে ধমকে থামিয়ে দিত আমাকে। কিন্তু মালতী মাসি ঠিক উল্টো তার। প্রশ্নের জবাব দিয়ে দিয়ে আমার হাজারো রকমের কৌতূহল মেটানোর ব্যাপারে তার ক্লান্তি নেই, বিরক্তি নেই। বাবার সঙ্গে রাগারাগি করে মা ছেড়ে চলে যাবার পর থেকে মালতী মাসি প্রায়ই আমার ঘরে শোয়। বাবা টের পেলে রেগে যাবে সেই ভয়ে নিজের চৌকিটা এ-ঘরে নিয়ে আসে না, আমি ঘুমিয়ে পড়লে মেঝেতে শোয়। এক একদিন আবার নিজের ঘরে চলে যায়। মোট কথা ঘুমিয়ে পড়ার আগে আমি তাকে কোনদিন ছাড়ি না। রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে মালতী মাসির বুক

ঘেঁষে শুয়ে গল্প শোনাটা আমার একটা নেশার মতো হয়ে উঠেছিল। এর ব্যতিক্রম হলে কিছুতে ঘুম আসত না, অনেক রাত পর্যন্ত ছটফট করতাম।

মানুষ মরে গেলে স্বর্গে হরি ঠাকুরের কাছে কি করে যায়, সেই কৌতূহল মালতী মাসিই মেটাতে চেষ্টা করেছে। শরীরের মধ্যে নাকি আত্মা থাকে, সে যায় হরি ঠাকুরের কাছে।

মড়া নিয়ে যাবার দৃশ্য আমি তার মধ্যে আগে দুই একটা দেখেছি। হরি বোল করতে করতে শরীরটাকে ওই লোকগুলো তাহলে কোথায় নিয়ে যায়?

কেন শ্মশানে, শ্মশানে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলে।

আমি আঁতকে উঠি। পুড়িয়ে ফেলে, মানে আগুনে পুড়িয়ে ফেলে? লাগে না?

মাসি হাসে। দূর পাগলা, প্রাণ না থাকলে আবার লাগবে কি।

কিছুই বোধগম্য হয় না, অস্বস্তি বাড়তে থাকে। মরে গেলে সব্বাইকে পুড়িয়ে ফেলা হয়?

পুড়িয়ে না ফেললে শরীরটা পচে গলে নষ্ট হয়ে যাবে না।

এই চিন্তাটাই মাথার মধ্যে অনেক দিন পর্যন্ত ঘুরপাক খেয়েছে আমার। মৃতদেহের এই শেষ গতি মনঃপুত হয়নি একটুও। পরিচিত মুখগুলো চোখের সামনে ভেসে ওঠে, বিশেষ করে রাতে বিছানায় গা ঠেকালে। মায়ের মুখ, বাবার মুখ, মালতী মাসির মুখ, স্কুলের ছেলেদের আর মাষ্টারদের মুখ, নিজের মুখও। সকলের জ্বলন্ত দেহ আমি কল্পনায় দেখে আঁতকে উঠেছি, নিজেরটা আর মায়েরটা সব থেকে বেশি দেখেছি। দৃশ্যটা ঠেলে সরাতে চাই অথচ সরে না।

এই মালতী মাসির কল্যাণেই ক্রমশ পূর্বজন্ম ইহকাল পরকাল সম্পর্কে আমার বেশ জ্ঞান লাভ হয়েছে। এই তিনকালের যাবতীয় কিছু যেন চোখের সামনে তার। যেমন আমরা সব এক ধার থেকে জন্মে জন্মে যাচ্ছি। এ পর্যন্ত যে কত ঘরে কতবার জন্মেছি তার ঠিক ঠিকানা নেই। পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত শুনতে মজাই লাগত। চোখের

সামনে যত লোক দেখছি তাদের মধ্যে কত জনে কোন জন্মের বাবা ছিল বা মা ছিল বা ভাই ছিল বা বোন ছিল তার ঠিক আছে। অথচ এমনই মজা যে কেউ কাউকে চিনতেও পারছি না।

হঠাৎ বুকের তলায় মোচড়ও পড়েছিল একটা। সেই যে রাস্তার ভিখিরিগুলো খাবার জন্য পয়সা চেয়েছিল আর মা তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ছিল, এমন যদি হয় ওদের মধ্যে কেউ একজন পূর্বজন্মে আমার মতই মায়ের ছেলে ছিল, তাহলে? সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে কে যেন চিন্তাটাকে পূর্বজন্ম থেকে এই জন্মেই ঠেলে নিয়ে এলো। আমি যদি না খেযে অমনি যন্ত্রণা পেতে থাকি, মা কি করে ?···আ-হা এমন যদি হয়, আমি না খেয়ে আছি আর মা সেটা জানতে পারছে। আশ্চর্য মায়ের সেই ছটফটানি কল্পনায় দেখে আমার এমন আনন্দ হয়েছিল কেন!

এ-জন্ম সম্পর্কে মালতী মাসির বক্তব্য, ভালো হয়ে থাকতে হয়, ভালো চিন্তা করতে হয় আর সর্বদা লোকের উপকাব করতে হয়—তাহলেই পরের জন্মে আব সুখের অন্ত থাকবে না। শয়তান লোকেরা মরে গিয়ে ভূত হয়, তারপর ভগবানের কাছে সাঙ্ঘাতিক সব শাস্তি পায়। কাউকে আগুনে পোড়ানো হয়, কাউকে ফুটন্ত তেলে ভাজা হয়, কাউকে মলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখা হয় আর কাউকে বা করাত দিয়ে কাটা হয়। শাস্তির শেষে আবার তারা ইঁদুর বেড়াল শেয়াল কুকুর হয়ে জন্মায়।

এ-জন্মের সঙ্গে পরের জন্মের যোগ। তাই এ-জন্ম নিয়েও আমার দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না। নিজের কোনো কাজের মধ্যে তেমন ভালো কিছু চোখে পড়ত না, আর কিছু একটা অন্যায় করে বসলে তারপর পরের জন্মের শাস্তির কথা মনে হলে দস্তুর মতো ভাবনা ধরে যেত। কুকর্মের কথা মাসিকে চুপিচুপি বলে জিজ্ঞাসা করতাম, পরের জন্মের আগে খুব শাস্তি পাব, তাই না। মাসি সর্বজ্ঞের মতই অম্লান বদনে অভয় দিত তখন। বলত, দোষ করে স্বীকার করলে আর পাপ থাকে না।

ফলে অন্যায় কিছু করলে (আমার মতে হামেশাই করতাম) কোনো এক ফাঁকে মালতী মাসির কাছে অন্তত সেটা স্বীকার করতাম।

যাক, এই শিক্ষাগুণেই মাঝে মাঝে আমার মনে হত পূর্বজন্মের এক একটা দৃশ্য যেন আমি হঠাৎ দেখতে পাই। তন্ময় হয়ে দেখিও। দেখি, ছোট্ট তিন বছরের একটা ছেলেকে সামনে বসিয়ে মা আদর করে তার চুল আঁচড়ে দিচ্ছে, সাজিয়ে দিচ্ছে, তারপর আদর করে চুমু খাচ্ছে, দুষ্টুমি করলে বকছে আবার আদর করে বুকে টেনেও নিচ্ছে তক্ষুনি। আদরে আদরে সেই ছোট্ট ছেলেটা যেন ভরাট হয়ে আছে। এরকম কত কি স্বপ্ন দেখি।

মাসি শুনে হেসে বাঁচে না। বলে, পূর্বজন্ম কি রে, এ-সব তো এ-জন্মেরই কথা তোর। কি ভালই না বাসত তোকে, স্যুটিং-এর পর বাড়ি ফিরে মা তোর পাঁচ মিনিটও তোকে ছেড়ে থাকতে চাইতো না। সন্ধ্যা আর রাত্তিরেও তো হামেশা লোকজন আসত দেখা করতে, তাই তোকে নিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়েই যেত এক একদিন—বাবু মাঝে মাঝে সে-জন্য কম রাগ করত।

আমি লালায়িত হয়ে শুনতাম। বাবা কেন রাগ করত বুঝতাম না কিন্তু বাবার রাগের কথা শোনামাত্র তার ওপর কেমন একটা নির্মম প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছে করত। মায়ের আদরে আদরে আমার সেই ভরাট চিত্রটা এ-জন্মেরই ব্যাপার, এ যেন সহজে বিশ্বাস হত না। আবার অবিশ্বাসই বা করি কি করে। সেই মিষ্টি মিষ্টি মায়ের মুখখানা তো অবিকল এই জন্মের মায়ের মুখের মতই।

ন'দশ বছরের সেই ছোট ছেলেটার বুকের তলায় সে-কি যন্ত্রণা। দু'বছর আগে মা এ-বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। পূর্বজন্মের ভেবে যে চিত্রটা দেখতাম সেটা কত আর আগের? এত ভালোবাসত যে মা, সে আমাকে ছেড়ে চলে গেল কেন? যেতে পারল কি করে?

কেন গেল, যেতে পারল কি করে, আমি জানি। মালতী মাসি মায়ের থেকেও কম করে তিন বছরের বড়। মনে হয় তার বুকের

তলায়ও অনেক ক্ষোভ অনেক যন্ত্রণা অনেক বাসনা পুঞ্জীভূত ছিল। মা চলে যাবার পরেই তাকে আমি কাছে পেয়েছি, এত কাছে বোধহয় জীবনে আর কাউকে পাই নি। আমার তেরো বছর বয়সের সময়ও সে আমাকে হঠাৎ-হঠাৎ এক-একদিন বুকে টেনে নিয়ে এমন আদর করা শুরু করত যে আমার ভয়ানক লজ্জা করত। তেরো বছর বয়সে ওই মালতী মাসিকে আমার জীবন থেকে বিদায় নিয়ে সরে যেতে হয়েছে। তার আগে পর্যন্ত মালতী মাসির সব থেকে কাছের জীবিত প্রাণী আমি। বুঝি না বুঝি, ফাঁক পেলেই অনর্গল গল্প করত আমার সঙ্গে। বেশির ভাগই নিজের দুর্ভাগ্যের কথা বলত, মায়ের আর বাবার গল্প করত। পরে, অনেক পরে মনে হয়েছে, ওই রকম গল্প করে করে মাসি তার নিজের ক্ষোভ আর যন্ত্রণা হাল্কা করত। আর মনে হয়েছে, ধাপে ধাপে মা কি করে অত বড় আর্টিষ্ট হয়ে উঠল, সেই গল্প যে করত তাও মাসির নিজের অপূর্ণ বাসনার একটা বিপরীত দিক, নইলে ওই বয়সের ছেলের কাছে মায়ের বড় হবার চিত্রটা অমন প্রত্যক্ষ গোচর করে তোলার কথা নয়। অনেক কিছুই বুঝতাম না তখন কিন্তু আমার শোনার আগ্রহ থেকে মাসির বলার আগ্রহ কিছুমাত্র কম মনে হয় নি।

তখন না বুঝলেও পরে বুঝেছি। পরে বলতে খুব পরে নয়। পনের বছর বয়সেই আমার ভাবনা চিন্তাগুলো অন্য ছেলেদের তুলনায় অনেক পরিণত আকার নিয়েছে। সেটা সম্ভব হয়েছে সাত বছর বয়সে আমার সত্তার ওপর যে ক্ষমতা সৃষ্টি হয়েছিল, তারই যন্ত্রণার ফলে।

এদিকের ঘরে মা আর আমি শুই। ওদিকের বড় ঘরটায় বাবা থাকে। আমাদের ঘর থেকে বাবার ঘরে যেতে হলে বারান্দা দিয়ে ঘুরে যেতে হয়, কারণ মাঝের দরজাটা বরাবর বন্ধ থাকে। দিনের বেলায় কখনো-সখনো খোলা হয়, তাও বাবা বাড়ি না থাকলে।

ধু-ধু মনে পড়ে, কবে যেন সকলেই আমরা বাবার ওই বড় ঘরে শুতাম। বোধহয় বছর তিনেক আগে পর্যন্ত। মস্ত বড় খাটের

একদিকে বাবা শুতো, মাঝে মা আর মায়ের পাশে আমি। আর মনে পড়ে মায়ের সঙ্গে বাবার প্রায়ই কি নিয়ে যেন ঝগড়াঝাটি কথা কাটাকাটি হত। মা কোনদিনই বেশি কথা বলা বা চেঁচামিচি করার লোক নয়। ঝগড়াঝাটি বাবার সঙ্গে মায়ের ওই এক রাতের আগেও প্রায়ই হয়েছে। আমি কখনো সভয়ে, কখনো বা সকৌতুকে লক্ষ্য করেছি, বাবা একধার থেকে বকাবকি রাগারাগি করে চলেছে, মা বেশির ভাগ সময় চুপ—আর তারপর এমন একটা দুটো কথা বলল যে বাবার রাগ মুহূর্তের মধ্যে একেবারে মাথায় উঠে গেল। তখন ডবল গর্জন বাবার। বাবার সেই তর্জন গর্জন দেখলে বা শুনলে ভেতরে ভেতরে ভয়ে কাঁপতুম আমি। মনে হত, বাবা বুঝি এই মেরেই বসল মা-কে। কিন্তু অবাক লাগত মায়ের মুখের দিকে তাকালে। তার চোখে মুখে ভয়-ডরের লেশমাত্র নেই। বাবার রাগারাগি চেঁচামিচির জবাবে বেশির ভাগ সময় খুব ঠাণ্ডা চোখে তার দিকে শুধু তাকাতো এক-একবার। অবশ্য সামনে থেকে দেখতাম না, আড়াল থেকে দেখতাম। কারণ ওই ঝগড়ার সময় আমি কাছে থাকলে মা আমাকে ধমকে তাড়াতো। যাই হোক মায়ের মুখ দেখে এটুকু বেশ স্পষ্ট বুঝতাম বাবার এত রাগারাগি তর্জন গর্জনের মা একটুও পরোয়া করে না। মা এত জোর পায় কোথা থেকে ভেবে অবাক লাগত আমার।

ঠিক কবে থেকে আর কি উপলক্ষে আমি আর মা এই আলাদা ঘরে শুচ্ছি এখন আর একটুও মনে নেই। বাবার সঙ্গে বাবার ঘরে শুতে হয় না, এটা যেন একটা পরম শান্তির ব্যাপার আমার কাছে। মনে মনে ধারণা, বাবা কি সব বিচ্ছিরি জিনিস খায় আর মুখ দিয়ে গা দিয়ে বিচ্ছিরি গন্ধ বেরোয়, আর বাবা তখন যা মুখে আসে তাই বলে গালাগালিও করে, এই সব কারণেই মা আমাকে নিয়ে এই ঘরে সরে এসেছে। আর ওই জন্যেই দু'ঘরের মাঝের দরজাটা ওইরকম বন্ধ থাকে।

ঘুমুবার সময় মা-কে বিশেষ কাছে না পেলেও মাঝরাত্তিরে অনেক দিনই ঘুম ভেঙে যেত আমার। তখন আবছা অন্ধকারে মা-কে পাশে

দেখতাম। একদিন উঠে বসে দু'চোখ রগড়ে সামনে ঝুঁকে মায়ের মুখখানা দেখতাম। নয়তো ঘুম জড়ানো চোখে সন্তর্পণে মাকে জড়িয়ে ধরে আবার ঘুমিয়ে পড়তাম। কিন্তু ওই করতে গিয়ে মায়ের ঘুম এক-একদিন ভেঙেও যেত। তখন পাশ ফিরে আমার দিকে শুতো, আলতো করে একখানা হাত আমার গায়ের ওপর ফেলে রাখত। কিন্তু তা সত্বেও আমার কেমন মনে হত, মা-ও যেন একটু একটু বদলাচ্ছে। মনে হত, কবে যেন মা বেশ জোরেই আমাকে বুকে চেপে শুয়ে থাকত। সে-রকম আর হয় না।

একদিনের কথা মনে আছে। ওই রকম ঘুম ভাঙতে উঠে বসে দেখে নিলাম, মা পাশে ঘুমুচ্ছে। সেদিন আমার একটু বাড়তি উদ্বেগের কারণ ছিল। সন্ধ্যার পরেই বাবা আর মা-তে তুমুল এক পশলা ঝগড়া হয়ে গেছে। সেদিন শুধু থমথমে মুখ নয়, মায়ের চোখ দুটোও যেন নিঃশব্দে জ্বলতে দেখেছি দরজার আড়াল থেকে। আর বাবাকে চিৎকার করে বলতে শুনেছি, ওই রকম করে চেয়ে থাকলে যাদের টনক নড়ে তাদের কাছে যাও—আমার ওপর ওই কায়দা ফলাতে এলে চোখ দুটো কোনদিন আমি উপড়ে ফেলে দেব, জেনে রেখো। চোখের খেলা দেখাতে এসেছে আমাকে—

তারপর থেকে মাকে অনেকবার লক্ষ্য করেছি। ওই কঠিন মুখের দিকে তাকাতে আমারও কেমন ভয়-ভয় করেছে। খানিক বাদে মায়ের কাছে কারা আসতে আমিও যেন একটু স্বস্তি বোধ করেছি। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মা মুখের ওপর আলতো করে একটু পাউডার পাফ বুলিয়ে আর নিজের আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে নীচে নেমে গেল। আমার আশা, বাইরের লোকের সঙ্গে একটু গল্প-সল্প করে মায়ের মেজাজ হয়তো ভালো হবে একটু।

তারপর ওই বেশি রাতে ঘুম ভাঙার আগে মায়ের সঙ্গে আর দেখা হয় নি। আলো না জ্বেলে বাথরুমে থেকে ঘুরে এসে কোনরকম শব্দ না করেই বিছানায় উঠলাম আবার। তারপর উপুড় হয়ে মায়ের দিকে ঝুঁকলাম, রোজকার মতই ঠাণ্ডা ঘুমন্ত মুখ কিনা দেখব।

আবছা অন্ধকারে একটু চোখ বসতেই ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলাম। মা ঘুমোয় নি, আমার দিকে চেয়ে আছে চুপচাপ।—কি দেখছিস?

লজ্জা পেয়ে আমি মায়ের বুকে মুখ গুঁজলাম। কেন যেন আশা হয়েছিল এভাবে ধরা পড়ার ফলে আমাকে একটু আদর করবে, নিবিড় করবে। কিন্তু মা তা করল না। আবার জিজ্ঞাসা করল, কি দেখছিলি?

তোমাকে। তুমি আজকাল আর আমাকে আগের মতো ভালবাসো না।

শিথিল দেহ ছড়িয়ে মা শুয়ে আছে। তার একটা হাতও আমার পিঠের ওপর উঠে এলো না। বলল, রাত দুপুরে এখন আর ভাল-বাসতে হবে না, ঘুমো—

তার বুকের কাছ থেকে মুখ তুলে সোজা হয়ে বসলাম একটু।—বাবার সঙ্গে তোমার এত ঝগড়া হয় কেন? বড় হলে বাবাকে আমি কেটে কুচিকুচি করে ফেলব।

অস্ফুট কঠিন স্বরে মা ধমকে উঠল, তুই ঘুমুবি এখন?

সরে এলাম। মাকে কষ্ট দেয় আর গালাগালি করে বলে বাবার ওপরে অফুরন্ত রাগ ঘৃণা বিদ্বেষ। মন্ত্রগুণে শক্তি অর্জন করে মনে মনে বাবাকে যে কতদিন কতরকমের শাস্তি দিয়েছি, ঠিক নেই। কিন্তু কে জানে কেন, এই মুহূর্তে মায়ের ওপরেও আমার অভিমান কম নয়।

তারপর সেই একটা রাত। যে রাতে সাত বছরের একটা শিশু বিছানায় শুয়ে ভয়ে কাঁপছিল ঠক্ ঠক্ করে। তার ছোট বুকটা যেন ভেঙে দুমড়ে একাকার হয়ে যাচ্ছিল আর তার সত্তার ওপর গভীর একটা ক্ষত সৃষ্টি হয়েছিল।

রাত কত হবে তখন জানি না। মালতী মাসি কখন আমাকে ঘুম পাড়িয়ে উঠে গেছে টের পাই নি। আমি মায়ের কাছেই শুই বটে কিন্তু ঘুমুবার সময় মা-কে আরো কম পাই আজকাল। এক-একদিন বেশি রাত করে বাড়ি ফেরে, নয়তো লোকজন বাড়িতে আসে। এ-দিকে ঠিক ন'টা বাজলেই মালতী মাসি আমাকে চেপেচুপে ঘুম পাড়াবেই।

ঘুমুবার আগে আজ গায়ে কাঁটা দেওয়া একটা দৈত্যের গল্প কেঁদেছিল মালতী মাসি। এক রাজার মেয়েকে সাঁ সাঁ করে বাতাস সাঁতরে নিজের পুরীতে নিয়ে এসেছিল।

হঠাৎ একটা বিকট গর্জন কানে আসতে ভয়ানক চমকে উঠলাম আমি। নিঃসংশয় দৈত্যটা এসেছে রাজার মেয়েকে ধরে নিয়ে যেতে। কিন্তু অবাক লাগছে, আমি তো বিছানায় শুয়ে, ঘরে আলো জ্বলছে।

কি বললে? কি বললে তুমি?

আবার সেই গর্জন। ঘুমের শেষ বেগটুকুও কেটে গেল। মশারির ভিতর থেকে ছু'চোখ টান করে আমি সভয়ে দেখলাম দৈত্য নয়, বাবা, তার হাতে বোতল একটা, রাগে বীভৎস দেখাচ্ছে বাবার সমস্ত মুখ। আর উল্টো দিকের কোণের আলমারিটার কাছে মা দাঁড়িয়ে, তারও ছু'চোখ যেন ধক ধক করে জ্বলছে।

বাবার গর্জনের জবাবে খুব চাপা অথচ অদ্ভুত কঠিন গলায় মা বলল, চেঁচিও না, ছেলে ঘুমুচ্ছে। তুমি শয়তান, তুমি পিশাচ।

সঙ্গে সঙ্গে হাতের বোতলটা বাবা প্রচণ্ড জোরে মায়ের পায়ের দিকে ছুঁড়ে মাড়ল। বোতল ভাঙার সেই ঝনঝন শব্দে সমস্ত ঘরটাই বুঝি কেঁপে উঠল। তার ক'টা টুকরো মায়ের গায়ে পায়ে গিয়ে লাগল কিনা জানি না।

গল্পে শোনা সেই দৈত্যের থেকেও ভয়ঙ্কর মুখ যেন বাবার। গলা দিয়ে অস্ফুট আগুন ঝরাতে ঝরাতে মায়ের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। আমি শয়তান···পিশাচ আর তুমি মস্ত সতী, কেমন?

মনে হল, বাঘের মতো ছুটো থাবা মায়ের ছুই কাঁধে বসে গেল। তারপরই ছু' কাঁধ ধরে বিষম ঝাঁকুনি গোটা ছুই তিন। মশারির ভিতর থেকে আমার মনে হল, ওরকম ঝাঁকুনি দিয়েই বাবা বুঝি মাকে মেরে ফেলবে। সম্ভব হলে আমি আর্তনাদ করে উঠতাম। কিন্তু আমার গলা দিয়ে শব্দ বেরুলো না।

ঝাঁকুনি খাবার পরেও মায়ের ছু'চোখ জ্বলছে তেমনি। সেই জ্বলন্ত চোখ মশারি ফুঁড়ে একবার আমার দিকে ফিরল। সেই মুহূর্তে এক

হ্যাচকা টানে মা দু'-তিন হাত সামনে সরে এলো, হাতটা বাবার শক্ত হাতের মুঠোয় ধরা না থাকলে মা ভাঙা কাচের ওপরেই মুখ থুবড়ে পড়ত। টাল সামলাবার আগেই খপ্ করে মায়ের কোমরটা অন্য হাতে জড়িয়ে ধরে চোখের পলকে বাবা আসুরিক বলে দরজার বাইরে টেনে নিয়ে গেল, মা এতটুকু বাধা দেবারও ফুরসত পেল না। দু'জোড়া জুতোর চাপে ঘরে ছড়ানো কাচের টুকরো মচমচ শব্দে গুঁড়িয়ে গেল।

আমি বিছানায় উঠে বসলাম। বুকের ওপর যেন ঠক ঠক করে হাতুড়ি পিটছে কেউ। ঘেমে গেছি। ভয়ে ত্রাসে গলা শুকিয়ে কাঠ। আমি কি করব এখন? বাবা কি মাকে মেরে ফেলার জন্য নিয়ে গেল? মেরে ফেলছে? মায়ের আর্তনাদ কানে আসে কিনা শোনার জন্য দু' কান উৎকর্ণ আমার। মাঝের দরজাটা বরাবরকার মতই বন্ধ। বারান্দা দিয়ে যাবার দরজাটা খোলা। ছুটে গিয়ে মাকে উদ্ধার করে আনতে চেষ্টা করব? মারলে বাবা না হয় দু'জনকেই মারবে।

মশারি টেনে সরিয়ে মাটিতে নামলাম। কি করব আমি? একটা টুঁ শব্দও কানে আসছে না কেন? মা-কে তাহলে শেষ করেই দিল? চিৎকার করে মালতী মাসিকে ডাকব?

উঃ! বারান্দার দরজার দিকে এগিয়ে ছিলাম, বেশ বড় একটা কাচের আধখানাই পায়ে বিঁধে গেল বোধহয়। কোনরকমে বিছানায় এসে বসলাম আবার। পায়ের তলা রক্তাক্ত। কি করব ভেবে না পেয়ে আমি হতভম্বের মতো বসে রইলাম।

খানিক বাদেই আবার পায়ের যন্ত্রণা মনেও থাকল না। পা বেয়ে রক্ত বিছানার ধপধপে চাদরটায় লাগছে তাও খেয়াল নেই। এক-একবার মায়ের বন্ধ দরজার দিকে তাকাচ্ছি আর এক-একবার বারান্দার খোলা দরজার দিকে। সমস্ত বাড়িটা যেন এক নিঝুম পুরী হয়ে গেছে। দৈত্যের মতই মাকে বাবা ধরে নিয়ে গেছে, দৈত্য রাজকন্যাকে প্রাণে মারে নি, কিন্তু বাবা....বাবা কি করবে? বাবাকে এই মুহূর্তে দৈত্যের থেকে ভয়ানক মনে হয়েছিল আমার।

কতক্ষণ ওই রকম ত্রাসে বোবার মতো বসেছিলাম জানি না। পনের মিনিটও হতে পারে, আধঘণ্টাও হতে পারে। কিন্তু আমার কাছে এক যুগ যেন। হঠাৎ সামনের আঙিনার দিকে চোখ পড়তে মনে হল পিছনের জানলার ওধারে আবছা অন্ধকারে কেউ এসে দাঁড়িয়েছে। তাড়াতাড়ি ঘুরে তাকালাম। মালতী মাসি। গলা দিয়ে একটা অস্ফুট স্বর ডুকরে বেরুলো যেন।—মাসি শীগ্‌গির এসো!

মালতি মাসি বারান্দায় দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেল। মেঝেময় কাচ ছড়ানো অবস্থাটা দেখল চেয়ে চেয়ে! বোতল ভাঙার শব্দ আগেই শুনেছিল নিশ্চয়। ইশারায় আসছে জানিয়ে চলে গেল। এক মিনিটের মধ্যেই রাবারের চপ্পল পায়ে গলিয়ে ফিরে এলো।

ইস, কি সর্বনাশ! করেছিস কী! তাড়াতাড়ি কাটা পা'টা নিজের হাঁটুর ওপর তুলে নিয়ে খুটিয়ে দেখল, কতটা জখম হয়েছে। রক্তাক্ত চাদরটার দিকেও তাকালো একবার।

আমি বলে উঠলাম, মাসি বাবা মা-কে হিঁচড়ে টেনে ঘর থেকে বার করে নিয়ে গেল, এতক্ষণে মেরেই ফেলল বোধহয়, তুমি শীগ্‌গির গিয়ে দেখো!

মাসি থমকে তাকালো আমার দিকে। আমার উদ্বেগ আর ত্রাস দুই-ই অনুভব করল বোধহয়। কিন্তু অবাক। এতবড় সংবাদ শুনেও মাসি নির্বিকার, মায়ের কাছে ছুটে যাবার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না। উল্টে আমার ভয় দেখে তার ঠোঁটের ফাঁকে একটু হাসির মতো দেখা গেল কিনা ঠিক বুঝলাম না।

বিছানায় রক্ত না লাগে এই ভাবে পা'টা নামিয়ে রেখে মাসি ঘরের দুরবস্থাটা আর এক প্রস্থ দেখে নিল!

তারপর চটপট বেরিয়ে গিয়ে একটা ঝাঁটা আর জলের বালতি হাতে ফিরে এলো তক্ষুনি। আগে ঘরটা ঝাঁট দিয়ে ভাঙা কাচগুলো সব এক কোণে জড় করতে লাগল।

তাই দেখে আমার রাগ হয়ে গেল, বলে উঠলাম, তুমি যাচ্ছ, না কেন? মায়ের কি হল দেখে আসছ না কেন?

দ্রুত ঘর ঝাঁট দিতে দিতে মাসি জবাব দিল, তোর মায়ের কিছু হয় নি।

হয়েছে, নিশ্চয় হয়েছে। তুমি দেখো নি বাবা কিভাবে মাকে টেনে নিয়ে গেল! মা এখনো আসছে না কেন? বাবা নিশ্চয় মেরে ফেলেছে।

না রে না, আদর-টাদর করছে বোধহয়।

মাসির মুখ দেখা যাচ্ছে না, শব্দ না করে খুব তাড়াতাড়ি ঘর ঝাঁট দেওয়া শেষ করছে। এত বড় সঙ্কটের মুখে এ-কথা শুনে আমি তাজ্জব। বাবা মা-কে আদর করতে পারে এমন অসম্ভব কথাও আর যেন শুনি নি।

ঘর ঝাঁট দেওয়া শেষ করে ভাঙা কাচের স্তূপ এককোণে জমিয়ে রাখল। তারপর তেমনি চটপট হাতে বালতির ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে সমস্ত মেঝেটা মুছে ফেলল। নইলে কাচের কুচি পড়ে থাকতে পারে। শেষে জল-ন্যাতার বালতি বাইরে বার করে দিয়ে তুলো আর ডেটলের শিশি হাতে আমার সামনে মোড়া টেনে বসল।

শুশ্রূষা শুরু হবার আগেই আমি চমকে ফিরে তাকালাম। মা নিঃশব্দে ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে। সমস্ত মুখ বিবর্ণ কিন্তু থমথমে। শুকনো চুলের কয়েক গোছা একদিকের গালের সামনে চলে এসেছে।

খরখরে দু'চোখ ঘরের মেঝেতে বুলিয়ে নিল একবার। তারপর মালতী মাসির দিকে তাকালো। খসে পড়া শাড়ির আঁচলটা গায়ে জড়াতে জড়াতে আমার দিকে তাকালো। তারপর আস্তে আস্তে সামনে এসে দাঁড়াল।

মা-কে বাবা মেরে ফেলে নি। মস্ত নিশ্চিন্ত ব্যাপার এটা আমার কাছে। কিন্তু এই মুখ দেখেও আমার কেমন ভয় ভয় করছে। মনে হচ্ছে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বাবা যেন মারধর করেছে মা-কে।

ঝুঁকে আমার পায়ের ক্ষত দেখল। রক্তাক্ত চাদরটা দেখল। তারপর আচমকা ঠাস করে আমার গালে চড় বসিয়ে দিল একটা। এত জোরে যে আমি বিছানায় উল্টে পড়েই যাচ্ছিলাম। অস্ফুট কঠিন গলায় বলল, মাটিতে নামতে গেছলি কেন?

আমি জবাব দিলাম না। মুহূর্তের মধ্যে একটা অভিমান যেন শরীর বেয়ে উঠে চোখ বেয়ে নামতে চাইল। যে মায়ের জন্য এত দুর্ভাবনা এত ত্রাস আমার, তার কিনা এই ব্যবহার! কিন্তু মায়ের দিকে চেয়ে আমি কি দেখলাম! মুখে আর গলার কাছে কয়েকটা দাগের মতো, আর জামার কাঁধটা ছেঁড়া—কিন্তু আসলে আমার চমক লেগেছে মায়ের চাউনি দেখে। সাত বছরের শিশু সেই রাতের চাউনি বিশ্লেষণ করতে পারে নি, কিন্তু পরে পেরেছে। আরো পরে ওই আচমকা চড় মারার আসল হেতুও আমার কাছে স্পষ্ট হয়েছে। সেই রাতে মায়ের চোখে আমি দগদগে ঘৃণা দেখেছিলাম। আমি ওই বাড়ির ছেলে তাই ঘৃণা—মায়ের চাউনি থেকে ঠিক ওই রকম ঘৃণা আমি বাবার দিকে একাধিক দিন ঠিকরে পড়তে দেখেছি।

ক্ষত জায়গা থেকে দু'তুটো বেঁধা কাচ মালতী মাসি টেনে তুলল। ভয়ানক যন্ত্রণা সত্ত্বেও আমি শক্ত হয়ে বসে রইলাম। ডেটল দিয়ে পরিষ্কার করার পর পা দুটো বেশ করে ব্যাণ্ডেজ করে দেওয়া হল। মা ততক্ষণ বিছানায় অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে রইল। হাতের সরঞ্জাম রেখে এসে আর একটা ধপধপে পরিষ্কার চাদর নিয়ে মালতী মাসি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল খানিক। সাহস করে মাকে উঠতে বলতে পারছে না।

মা আস্তে আস্তে ঘুরে তাকালো তার দিকে। চেয়েই রইল খানিক। তারপর চুপচাপ উঠে দাঁড়াল।

মালতী মাসি রক্তমাখা চাদরটা তুলে ফেলে হাতের চাদরটা চোখের পলকে যেন টানটান করে পেতে দিয়ে ঘরে থেকে চলে গেল। গুমরনো অভিমান সত্ত্বেও আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম, মালতী মাসি একবারও মায়ের দিকে সোজাসুজি তাকালো না।

অনেক রাত পর্যন্ত আমার ঘুম হয় নি। ঘরের আলো নেভানো। মা অনেকক্ষণ বাদে তার জায়গায় এসে শুয়েছে। আমি ছটফট করছিলাম, এ পাশ ও পাশ করছিলাম। তখনো যদি মা কাছে এসে

দু'হাত বাড়িয়ে আমাকে বুকে টেনে নিত আমার অভিমান জল হয়ে যেত। মনের রাগ তখন শুধু বাবার ওপরেই বর্ষাতো।

কিন্তু মা তা করল না। স্থাণুর মতো বিছানায় পড়ে থাকল। তার নিঃশ্বাসের শব্দও কানে এলো না।

পরদিন।

সকাল থেকেও মায়ের ওই রকমই থমথমে মুখ। অভিমানের থেকে আমার বুকের তলার অজানা ভয়টাই যেন বেশি এখন। মাস্টার এসে দের ঘণ্টা আটকে রাখল আমাকে! বার বার বিমনা হবার ফলে পড়া বলতে না পেরে বার কয়েক ধমক খেলাম তার কাছে। মাস্টার চলে যাবার পরের রুটিন চান খাওয়া তারপর স্কুল। খুব আশা করতে লাগলাম মা যদি বলে কাটা পা নিয়ে আজ আর স্কুল যেতে হবে না। কিন্তু মা তা বলল না।

গাড়ির হর্ণ বেজে উঠতে একটা জমাট বাঁধা রাগ নিয়ে ব্যগটা কাঁধে ফেলে আমি মায়ের কাছে এসে দাঁড়ালাম। মা যেন শক্ত একখানা পাথরের মতো বিছানায় বসে।

দু'বছর হল আমার এই শাস্তি অর্থাৎ স্কুল শুরু হয়েছে। আর এই দু'বছর ধরেই গাড়িতে ওঠার আগে আমি মাকে আদর করি আর মা আমাকে আদর করে। একদিনও এর ব্যতিক্রম হয় নি।

আমি মায়ের দিকে তাকালাম। মা-ও আমার দিকে চেয়ে আছে। কালকের মতো না হলেও এই চাউনিতেও যেন একটুও দরদ নেই। আমি গিয়ে আদর করলেও মা আমাকে ফিরে আদর করবে কিনা সন্দেহ।

রাগ আর অভিমান বুঝি একসঙ্গে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল আমার। এক ঝটকায় ঘুরে দাঁড়িয়ে দুপদাপ পা ফেলে আমি নীচে নেমে চলে এলাম। গাড়িতে এসে উঠে শব্দ করে দরজাটা বন্ধ করলাম। কিন্তু গোঁ সত্ত্বেও দোতলার বারান্দার দিকে একবার না তাকিয়ে পারা গেল না। গাড়ি চোখের আড়াল হবার আগে মা ওই বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাত নাড়ে।

আজ আর ওখানে দাঁড়াবেও না ধরে নিয়েছিলাম। কিন্তু না, দাঁড়িয়েছে। আমার দিকেই চেয়ে আছে।

আমি সরোষে ঘাড় ফিরিয়ে নিলাম।

স্কুল থেকে ফিরে মা-কে বাড়িতে দেখব না জানা কথাই। বলতে গেলে রোজই শুটিং থাকে। ছ'টা সাড়ে ছ'টা নাগাদ বাড়ি ফেরে। তবু গাড়ি থেকে নেমে সমস্ত বাড়িটা একবার ঘুরে দেখে নিলাম। চাকর-বাকর ছুটো ঘুমুচ্ছে, মালতী মাসিও ঘুমুচ্ছে।

বিকেল পর্যন্ত একটা অস্থিরতার মধ্যে কাটিয়ে দিয়ে মায়ের জন্য উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। রাগ আর অভিমানের থেকেও ভিতরে ভিতরে আমার অজানা ভয়টাই যেন বেশি। কাল রাত থেকে যে-মুখ দেখেছি মায়ের অমন আর কখনো দেখি নি।

বিকেলে বাবা ফিরল। তখন পর্যন্তও তার গম্ভীর আর নির্দয় মুখ। খেলাধুলো ছেড়ে আমি ঘরে বসে আছি দেখে একবার সামনে এসেছিল। আমি ঘৃণায় তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি। গত-কালের জন্য নয়, বাবাকে আমি কোনদিনই বিশেষ পছন্দ করি না।

তোর পায়ে কি হয়েছে?

কেটে গেছে।

কি করে কাটল?

কাল রাতে তুমি বোতল আছড়ে ভেঙ্গে ছিলে, সেই কাচে।

বাবা ঘর ছেড়ে প্রস্থান করল। মুখের ওপর কিছু বলা গেল ভেবে আমি মনে মনে একটু খুশি হলাম।

বিকেল গেল, সন্ধ্যা পার হল, রাত বাড়তে থাকল—মায়ের দেখা নেই। সন্ধ্যার পরে আমার একবর্ণও পড়া হল না। অস্থির হয়ে আমি এ-ঘর ও-ঘর করতে লাগলাম। স্টুডিওতে ফোন করার জন্য তিন বার করে আমি মালতী মাসিকে তাগিদ দিতে সে বিরক্ত হয়ে বলল, তোর মা কি এখনো স্টুডিওতে বসে আছে নাকি!

যত সময় যাচ্ছে, আমার বুকের ভিতরে যেন একটা কাঁপুনি ধরছে। কেবলই মনে হচ্ছে মা যদি আর না-ই আসে? মায়ের যে রকম

ভয়াবহ চোখ মুখ দেখেছি কাল রাত থেকে, সবই যেন সম্ভব। ওই সম্ভাবনার চিন্তাটাকে যত বার আমি নির্মূল করতে চাইলাম ভিতর থেকে ততো যেন ওটা বুকের ওপর চেপে বসেছে। শেষে আর থাকতে না পেরে বাবার ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালাম। বাবা অনেকক্ষণ পর্যন্ত লক্ষ্য করল না আমাকে, গেলাসে ওই বোতলের জিনিস ঢেলে খাচ্ছে আর সিগারেট টানছে।

মা এখনো বাড়ি ফেরে নি।

নিজের গলার স্বর কানে আসতে নিজেই যেন অপ্রস্তুত আমি। হঠাৎ যেন একটা ঝাঁঝ বেরিয়ে এলো গলা দিয়ে।

বাবা মুখ তুলে আমার দিকে তাকালো। ঠিক যেন বুঝে উঠল না কি বলছি।—ভিতরে আয়।

কয়েক পা এগোতে একটা বিচ্ছিরি গন্ধ নাকে আসতে দাঁড়িয়ে গেলাম।

কি হয়েছে?

মা এখনো ফেরে নি।

বাবা আমার দিকে চেয়েই রইল, তার মুখটা যেন হিংস্র হয়ে উঠতে লাগল।—ফেরে নি তো আমি কি করব?

আমি বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলাম।

গেট আউট।

চলে এলাম। মনে হল, অবাধ্য হলে বাবা আমাকেও বোতল ছুঁড়ে মারতে পারে।

মালতী মাসি টিকটিক করতে থাকল বলেই খেয়ে নিলাম। নইলে মাকে আক্কেল দেবার জন্যেই খাবার ইচ্ছে ছিল না। এক সময় শুয়েও পড়লাম। মালতী মাসি আমাকে গল্প বলে ঘুম পাড়াতে এলো। রাগ করে আমি অন্য দিকে ফিরে শুয়ে রইলাম।

মালতী মাসি আর আমার কাছে ঘেঁষতে সাহস করল না। ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে চুপচাপ বসে রইল। আমার সমস্ত জমাট বাঁধা রাগ আর অসহিষ্ণুতা আর ভয় জল হয়ে চোখ বেয়ে গড়াতে

লাগল। সেই জলে বালিশ ভিজছে। আমি মনে মনে কেবল বলছি, মা তুমি শীগ্‌গির চলে এসো, আমি তোমার খুব ভালো ছেলে হব, আর কক্ষনো তোমাকে বিরক্ত করব না, আর বড় হয়ে বাবাকে খুব শাস্তি দেব।

…রাত কত তখন জানি না। মনে হয় মাঝ রাত্রি হবে। হঠাৎ ঘুম ভাঙতে অন্ধকারে বিষম চমকে উঠলাম। মা আমাকে জড়িয়ে ধরে তার জায়গায় শুয়ে আছে। আমি চমকে উঠতে আরো নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে থাকল আমাকে।

আমিও তাকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরে অভিমানহীন স্বরে বলে উঠলাম, অত রাত পর্যন্ত তুমি কোথায় ছিলে, সমস্তক্ষণ আমি কষ্ট পেয়েছি জানো না।

মা আমাকে আরো কাছে টেনে নিয়ে গালে মুখে চুমু খেল। আর সঙ্গে সঙ্গে যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো একটা ঝাঁকুনি খেলাম আমি।

স্নেহের ওই উষ্ণতাকে কেমন অপরিচিত মনে হল আমার। মায়ের গায়ের চেনা গন্ধও নাকে আসছে না।

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ধড়মড় করে উঠে বসলাম আমি। ঘরটা আজ অন্য দিনের তুলনায় বেশি অন্ধকার। ওদিকের দুটো জানলাই বন্ধ বোধহয়। অন্ধকার ফুঁড়ে দেখতে চেষ্টা করলাম কে শুয়ে আছে। ঠিক বোঝা গেল না। চোখ থেকে ঘুম ছুটে গেছে, একটা তপ্ত আক্রোশ যেন মাথার দিকে ধাওয়া করেছে। মশারিটা হ্যাঁচকা টানের চোটে ছিঁড়েই গেল বোধ হয়। আমি ছিটকে বেরিয়ে এসে খট করে আলো জ্বাললাম।

মশারির ভিতর দিয়ে দেখি মায়ের জায়গায় মালতী মাসি কাঠ হয়ে শুয়ে আছে। আর সভয়ে আমার দিকেই চেয়ে আছে।

আমার ধারণা মালতী মাসি আমকে তো ভালোবাসেই আমিও মালতী মাসিকে কম ভালোবাসি না। কিন্তু সেই রাতে সাত বছরের এক শিশুর মাথার মধ্যে কি যে আগুন জ্বলে উঠেছিল কেউ কল্পনা

করতে পারবে না। দু'হাতে মশারিটা টেনে একেবারে ছিঁড়েই নিয়ে এলাম আমি।

তুমি এখানে কেন? কে তোমাকে মায়ের জায়গায় এসে শুতে বলেছে? বেরিয়ে যাও বেরিয়ে যাও বলছি এ-ঘর থেকে!

মালতী মাসি শশব্যস্তে উঠে বসে দু'হাত বাড়িয়ে আমাকে ধরতে চেষ্টা করল।—সুমু লক্ষ্মী বাবা, এত রাতে এ-ভাবে চিৎকার করতে নেই, আয় ঘুমুবি আয়।

না না, আমি ঘুমুব না, রাগে কাঁপতে কাঁপতে আরো জবল চিৎকাব করে উঠলাম আমি।—তুমি চলে যাও, তুমি আমার মায়ের জায়গায় কেন শুয়েছ? আমার মা কোথায়?

মালতী মাসি সভয়ে সামনের বন্ধ দরজার দিকে তাকালো একবার, তারপর খাট থেকে নেমে আমাকে ধরার জন্য এগিয়ে এসে বলল, লক্ষ্মী মাণিক, শুবি আয়, মা নিশ্চয় কোথাও শুটিং-এ গেছে, সকালেই ঠিক ফিরবে দেখিস—

আমি তিন পা পিছিয়ে গিয়ে তেমনি ক্ষিপ্ত রোষে চিৎকার করে উঠলাম, মিথ্যে কথা, তুমি মিথ্যেবাদী। মা কক্ষনো শুটিং-এ যায়নি, আমাকে না বলে মা কক্ষনো শুটিং-এ যায় না, তুমি চলে যাও এ-ঘর থেকে, আমার কাউকে দরকার নেই, কাউকে চাই না আমি!

বন্ধ দরজার ও-দিকে একটা শব্দ হতে দুজনেই সেদিকে থমকে তাকালাম। দু'ঘরের মাঝের বন্ধ দরজা আস্তে আস্তে খুলে গেল। দরজাটা এদিক থেকে বন্ধ থাকে—কখন কে খুলে রেখেছে জানি না। ও-ঘরের অন্ধকার থেকে বাবা এ-ঘরে এসে দাঁড়াল। বোতলের ওই সব জিনিস খেলে বাবা খুব ঘুমোয় দেখেছি, কিন্তু আজ বাবার দু'চোখ লাল। আমার চিৎকারে ঘুম ভাঙা স্বাভাবিক, কিন্তু লাল চোখ দেখে মনে হল বাবাও অত রাত পর্যন্ত জেগেই আছে।

ঘরের মধ্যে কয়েক পা এগিয়ে এসে প্রথমে বিছানার ওপর ছেঁড়া-খোঁড়া মশারিটার দিকে তাকালো, তারপর আমার দিকে ফিরতে গিয়ে আগে মালতী মাসির দিকে চোখ গেল। বাবাকে দেখামাত্র শুধু যে

আগুনের ওপর ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা পড়েছে তাই নয়, চোখাচোখি হতে মাসিও হকচকিয়ে গেল কেমন। মাসির গায়ে জামা ছিল না, মনে হল ঘাবড়ে গিয়ে মাসি শাড়ির আঁচলটা ভালো করে গায়ে জড়াতে লাগল।

বাবা এবার আমার দিকে ফিরল, কি হয়েছে?

আমি নির্বাক।

মশারিটা ওভাবে ছিঁড়ল কি করে? আর রাত করে এত চেঁচামিচি কিসের?

আমি ঠোঁট কামড়ে চুপ করে রইলাম। রাগে বাবার ফর্সা মুখ লাল হচ্ছে। মাসি ভয়ে ভয়ে বলল, মায়ের জন্যে কান্নাকাটি করছে—

বাবা আবার তার দিকে তাকাতে মালতী মাসি আবার থতমত খেয়ে চুপ করে গেল।

আঙুল তুলে বিছানা দেখিয়ে বাবা হুকুম করল, গো টু বেড—

আমি গোঁ ধরে দাঁড়িয়েই রইলাম। বাবা এবার হুঙ্কার দিয়ে উঠল, গো টু বেড! ফের যদি এরকম বাঁদরামো আর চেঁচামিচি করতে দেখি তো চাবকে পিঠের ছাল তুলে দেব।

আমি বিছানায় এসে শুয়ে পড়লাম। রাগে সমস্ত শরীর কাঁপছে। কিন্তু বাবা তক্ষুনি ঘর ছেড়ে চলে গেল না দেখে আমি শুয়ে শুয়েই ঘাড় ফেরালাম একটু।....বাবা কি এবার মাসিকে বকবে নাকি! অমন করে চেয়ে আছে কেন? চুপচাপ দাঁড়িয়ে মাসির মাথা থেকে পা পর্যন্ত বার দুই তিন তাকালো বাবা। না, বাবার এই চাউনিটা একটু আগের মতো রাগে ভরাট নয়, কেমন যেন ঘোলাটে ঘোলাটে। আর তাইতেই মাসি হঠাৎ যেন একেবারে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

নিজের অন্ধকার ঘরের দিকে ফিরে যেতে যেতে বাবা বলল, ও ঘুমোক, তুমি শুনে যেও তো একটু—কথা আছে।

আমি তারপরেও অবাক চোখে কিছুক্ষণ মালতী মাসিকে দেখলাম। না, বাবার গলার স্বরে আর রাগের লেশমাত্র নেই, তবু মাসি হঠাৎ এমন কাঠ হয়ে গেল কেন ভেবে পেলাম না। আমি ওই রকম

বেয়াদপি করেছি বলে বাবা নিশ্চয় মাসিকে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বকাবকি করবে না।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে ওঘরে মৃদু গম্ভীর গলা খাকারির শব্দ কানে আসতে মাসির যেন হুঁস ফিরল। চমকেই উঠল একবার। তারপর আমার দিকে তাকালো। বিছানার কাছে এসে দাঁড়াল। মাসির এই মূর্তি দেখে আমার যেন মায়া হল একটু।

ঘরের আলোটা জ্বেলে রেখেই মাসি আস্তে আস্তে বাবার অন্ধকার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

আমি লাফ দিয়ে উঠে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে আবার শুয়ে পড়লাম।

তখন বুঝিনি, এর ঢের ঢের পরে বুঝেছি মালতী মাসি আলো থেকে কোন অন্ধকারের মধ্যে ডুবে গেল।

এরপর একটানা আরো ছ'বছর মালতী মাসির সঙ্গে এ-বাড়িতে কাটিয়েছি। তার মধ্যে সাড়ে পাঁচ বছর ধরেই আমার মনে হয়েছে মাসি যেন সেই এক রাতের পর থেকে রাতারাতি অনেক বদলে গেছে। সে আমাকে আগের থেকে আরো বেশি ভালোবেসেছে। দিনের পর দিন মায়ের কত গল্প করেছে ঠিক নেই। কিন্তু তবু আমার মনে হয়েছে, যে মা আর এলোই না এ-বাড়িতে শুধু তার ওপরেই যেন মাসির সে-রকম দরদ নেই।

*　*　*　*

মায়ের গল্প বলতে মালতী মাসি খুব সাধারণ আর্টিষ্ট থেকে এত বড় অভিনেত্রী হয়ে ওঠার গল্পই বেশি করত। শুনতে ভালো লাগত, কিন্তু মাসির অনেক কথার তাৎপর্য আর ইংগিত বোধগম্য হত না। আমি বুঝি বা না বুঝি সে যেন অনেকটা নিজের বলার ঝোঁকে বলে যেত। বুদ্ধি বিবেচনা একটু পরিণত হয়ে উঠতে কিছুই আর অস্পষ্ট ছিল না অবশ্য, কিন্তু মাসি ততোদিনে আমার জীবন থেকে বিদায় নিয়ে নিজের ভাগ্যের পথ ধরেছে।

মালতী মাসির মুখে যা শুনেছি, নিজের চোখে যেটুকু দেখেছি,

আর যা দেখি নি বা শুনি নি অথচ সম্ভাব্য সত্য বলে আমার কল্পনায় এসেছে—সেই সবকিছু মিলিয়ে এই সরকার বাড়ির জীবন-যাত্রার একটা চিত্র আমার চোখের সামনে স্থির হয়ে আছে। আমি এর ওপর কোনো মন্তব্য করিনে, করতে চাইনে—নির্লিপ্ত দর্শকের মতো সেটা শুধু চেয়ে চেয়ে দেখি।

মা আমার চোখে দুনিয়ার সেরা রূপসী বটে (এখনো কি ?), কিন্তু মাসির মতে রূপের বাজারে ওই রূপের দাম নেই কিছু। গায়ের রং তো কালোই বলতে হবে। ঘষে-মেজে যেটুকু দাঁড়িয়েছে তাকেও ফর্সা বললে রীতিমতো অত্যুক্তি হবে। আর নাক-চোখ-মুখেরও এমন কিছু বাড়তি বৈশিষ্ট্য নেই যা নিখাদ রূপের পর্যায়ে পড়তে পারে। মাথার চুলও কাঁধ পিঠের আধা-আধি নামে নি। তবে লম্বাটে গড়ন, স্বাস্থ্য ভালো, আর হাসলে ঝক্‌ঝকে দাঁতের সারি দেখলে মনে হয় যেন নিখুঁতভাবে সাজিয়ে বসানো।

মাসির মতে মা চিরঋণী 'ক্যামেরা' নামে যন্ত্রটার কাছে। অমন ক্যামেরামুখো ভাগ্য সচরাচর নাকি কারো হয় না। ওই যন্ত্রটাই মাকে রূপের ছাড়পত্র দিয়েছে। যখন যে-ভাবে যে-ঢঙে ছবি তুলুক, তাই চোখে পড়ার মতো সুন্দর। ওই যন্ত্রটার কল্যাণেই মা প্রায় দু'যুগ ধরে তার স্তাবক আর অনুরাগীদের চোখে অনন্যার আসনে বসে থাকতে পেরেছে। তবে মায়ের দুটো গুণের কথাও মালতী মাসি একবাক্যে স্বীকার করেছে। এক, চোখের ভাষা। তা এত নীরব অথচ এত স্বচ্ছ, গভীর আর স্পষ্ট যে, সেটাই নাকি মায়ের বিশেষ একটা রূপ। দুই, জোরালো আলো আর ক্যামেরার সামনেও খুব সহজ আর স্থির থাকতে পারার গুণ। ওই জন্যেই মায়ের অভিনয় কোনো সময় অভিনয় বলে মনে হয় না।

কিন্তু এই সব গুণের কদর হয়েছে ঢের পরে। অনেক হতাশার দিন গেছে। মায়েরা ছিল পাঁচ বোন আর তিন ভাই। মা সকলের ছোট। দাদু অর্থাৎ মায়ের বাবা ছিল মার্চেন্ট অফিসের নিচের দিকের কেরানী। যে মাইনে পেত তাতে মাসের বিশ দিনও টেনে-টুনে চলত

না। তাই মাসিরা আর মামারা অল্প বয়স থেকেই যে-যার ভবিষ্যতের রাস্তা নিজেরাই বেছে নিয়েছে। মামাদের মধ্যে বড়জন স্কুলের মাষ্টার, দ্বিতীয়জন ইন্‌সিওরেন্সের দালালী করতে করতে একবার এক শাঁসালো পার্টির মোটা টাকা মেরে অনেক দিন জেলখাটার পর ফেরারী হয়েছে। এখন কোথায় আছে বা কি করছে, কেউ জানে না। ছোট মামা দেশব্রতী হিসেবে কিছু নাম করেছে। নরম গরম লেকচার দিয়ে বেড়ায়, গোটাকতক ইউনিয়নের পাণ্ডাগিরি করে, চাকরি বাকরি করে নি কোনদিন অথচ বিয়ে থা করেছে, ছেলে-পুলে আছে—আর তার অবস্থাই মোটামুটি স্বচ্ছল একটু।

ওদিকে মাসিরাও অল্প বয়স থেকেই যে যার নিজের নিজের রাস্তা খুঁজে নিতে চেষ্টা করেছে। বড় মাসি কলেজে পড়তে পড়তে এক পয়সাওয়ালা মাড়োয়ারী ছেলের ঘরণী হয়ে বসেছে। মেজ মাসিও সেই গোছের কিছু চেষ্টা করতে গিয়ে কোথায় ভেসে গেছে, কেউ জানে না। ন'মাসি আর ছোট মাসি অন্য বোনেদের তুলনায়ও কুচ্ছিৎ দেখতে। তাদের একজন প্রাইমারি মেয়ে স্কুলের মাষ্টার, অন্যজনের ধর্মে মতি। সে নাম করা সেবায়তনের দীক্ষিতা কর্মী। তার মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, গেরুয়া ধুতি পরা, বাস্তব চাওয়া-পাওয়ার জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন।

সকলের ছোট মা, রুচির দিক থেকে তার বাবার ধাত পেয়েছিল। দাদু নাকি অ্যামেচার পার্টি আর আপিসের বাৎসরিক নাট্যানুষ্ঠানের নামকরা কমিক অভিনেতা ছিল। আপিসের সামান্য কেরানীর বাপ হওয়ার বাস্তব কমিকটা ভোলার জন্মেই অভিনয়ের এই অঙ্গটি আঁকড়ে ধরেছিল কিনা কেউ বলতে পারবে না। মা যেবারে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিল, সেবারে 'আট' ছেলে মেয়ের বাপ ওই ধরনের কমিক অভিনেতার মৃত্যুর খবর আর ছবি কাগজেও বেরিয়েছিল, শুনেছি।

দাদু মারা যাওয়ার পর তার বিধ্বস্ত সংসারের হালছাড়া দশা। স্কুল-মাষ্টার বড় মামা তার বাপের আমলেই পৃথক হয়ে গেছল। দেশব্রতী ছোট মামার ভগ্ন-দশা তরীর হাল ধরার আগ্রহ আগেও ছিল

না, পরে সে আরো উদাসীন। বড় মাসি কিছু কিছু সাহায্য করত, আর ভরসা ন' মাসির প্রাইমারি স্কুলের সামান্য বেতন। তারও আনকোরা নতুন চাকরি তখন। তাদের মায়ের অর্থাৎ আমার দিদিমার বুকের ব্যামো লেগেই ছিল। কিন্তু বড় মাসির করুণা না হলে সময়ে একটু ওষুধও জুটত না।

টেনেটুনে স্কুল ফাইনাল পাশ করে মা প্রায় দু'বছর ঘরে বসে ছিল। ন' মাসি তখন তার জন্যও স্কুলে চাকরির চেষ্টা করেছে, আর বোনের নিজের গরজের অভাব দেখে বকাবকি করেছে। ন' মাসি চাকরি জুটিয়ে দিতে পারলে মা সেই চাকরি করত হয়তো কিন্তু আসলে ওই চাকরি মায়ের দু'চোখের বিষ।

সংসার যখন একেবারে অচলপ্রায় মা তখন হঠাৎ একদিন সাহসে কোমর বেঁধে পাড়ার অবিনাশ সরকারের সঙ্গে দেখা করতে গেল। এখানকার অ্যামেচার নাটকের সংস্থাটি তারই হাতে গড়া। মায়ের বাবা এই সংস্থারই পাকাপোক্ত কমিক অভিনেতা ছিল, আর ওই ভদ্রলোক তখন সামান্য করণিক বলে দাদুকে অবজ্ঞা করত না, বরং ভালোবাসত। অ্যামেচার ক্লাব হলেও কোনো সামান্য অবস্থার শিল্পী কিছু কিছু টাকা পেত, বিশেষ করে মেয়ে শিল্পীরা। বিনা টাকায় মেয়ে-শিল্পী সংগ্রহ করা খুব সহজ হত না। মালতী মাসি তখন ওই ক্লাবের সবেতন শিল্পী একজন। তার বাড়ি ঘরের পরিচয় আজও আমার জানা নেই। অবিনাশ সরকার এমনিতে রুক্ষ মেজাজী মানুষ, কিন্তু ভিতরটা দরদী। মা জানত, দরকারের সময় ভদ্রলোক বাবাকে অনেকভাবে সাহায্য করত।

মায়ের মুখে সে সংসারের দুরবস্থার কথা শুনল, আর মা যে স্কুলের নাটকে অভিনয় করে দু'-তিন বার মেডেল পেয়েছে, তাও জানল।

সেই থেকে মায়ের অভিনয়-জীবন শুরু। আর তার সায়াহ্নে আবার সেই মঞ্চেই পদার্পণ। খবরের কাগজে এই যোগাযোগের খবরও ফলাও করে ছাপা হয়েছিল।

মালতী মাসি বলত, পাড়ার এক বস্তিতে থাকতুম, তোর মায়ের

সঙ্গে আগে থেকেই একটু ভাব-সাব ছিল। আমার কাছ থেকে ভরসা পেয়েই অবিনাশ সরকারের সঙ্গে গিয়ে দেখা করেছিল। আর তোর মা এসে ছ'মাসের মধ্যেই কিনা আমার জায়গাটি জুড়ে বসল। শুধু তাই, আপিস বা ক্লাব থেকে প্লে করার জন্যও আমার বদলে তোর মায়ের ডাক পড়তে লাগল। উপকার করতে গিয়ে আমি শেষে উপোষ করে মরি আর কি!

বছর খানেকের মধ্যে শৌখিন নাটক মহলে মায়ের বেশ নাম হয়ে গেছল। নানা জায়গা থেকে ডাক আসত, আর টাকা-কড়িও বেশ পেত। অবিনাশ সরকারের ক্লাবও তখন মায়ের দৌলতেই বেশ ফেঁপে উঠেছিল। সেই কারণে মায়ের প্রতি সরকার মশাইয়ের স্নেহ ভালবাসাও দিন দিন বাড়ছিল। মায়ের বেশ কড়া গার্জেন হয়ে উঠেছিল সে। শহরের বাইরে থেকে অথবা বেশি দূরের কোনো অনুষ্ঠানে অভিনয়ের ডাক এলে বেশি টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা সত্ত্বেও ভদ্রলোক যাবার অনুমতি দিত না। শহরের মধ্যে হলেও মাকে একলা ছাড়ত না, হাতে সময় থাকলে নিজে সঙ্গে যেত, নয়তো বেশির ভাগ সময় নিজের অনেক দিনের বিশ্বস্ত চাকর হীরা সিংকে সঙ্গে দিত। সরকার মশাইয়ের অনুমতি ভিন্ন মায়ের কোথাও অভিনয় করার উপায় ছিল না। শুনেছি, ওই বুড়ো হীরা সিংও মাকে ভালবাসত খুব। কোথাও গেলে মাকে চোখে চোখে রাখত।

কিন্তু ওই হীরা সিংকে অবিনাশ সরকার চাবুক নিয়ে তাড়া করেছিল একদিন। কারণ, সেদিন সে জেনেছে, হীরা সিং তার সঙ্গেই সব থেকে বেশি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তার ছেলের সঙ্গে মায়ের ভাব-সাবের ব্যাপারটা অনেক দিন পর্যন্ত সকলের চোখে গোপন ছিল তার জন্যেই। বাবুর ছেলে যে নিজের কাজকর্ম ফেলে মায়ের প্রত্যেকটা নাটক দেখতে ছোটে, আর ফেরার সময়ে বাসে যাবার জন্য ওর হাতে দু'-পাঁচ টাকা গুঁজে দিয়ে মাকে নিয়ে ট্যাক্সি করে ফেরে—সেটা একমাত্র ও ছাড়া আর কে জানত?

অবিনাশ সরকারের ছেলে বিজন সরকার, সেই আমার বাবা।

নাট্যরসিক অবিনাশ সরকারের নিজের ছিল পৈতৃক আমলের ডেকরেটিংয়ের চালু ব্যবসা। নিজের আমলে সেই ব্যবসা সে আরো অনেক বড় করে তুলে ছিল। এই ব্যবসায় তাদের নাম ছিল। তার অন্য দুই ছেলে বাপের ব্যবসায় যোগ দিয়েছিল, কিন্তু বড় ছেলে বিজন সরকার উৎসবে অনুষ্ঠানে অন্য লোকের ঘর বাড়ি সাজানো বা পেয়ালা প্লেট আর খাওয়া দাওয়ার বাসন সরবরাহ করাটাকে সম্মানজনক ব্যবসা হিসেবে গ্রহণ করতে পারে নি। সে লেখাপড়া শিখে ইলেক্‌ট্রিকাল এন্‌জিনিয়ার হয়েছে। কিন্তু বংশের কেউ চাকরি করায় অভ্যস্ত নয়, বিজন সরকারও কোনো চাকরিতে বেশিদিন টিকে থাকতে পারে নি।

তার স্বপ্ন লাখ দেড় দুই টাকা পেলে মস্ত একটা ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কশপ খুলে বসবে। দিশি বিলেতি যন্ত্রপাতি সাজ সরঞ্জাম থাকবে, অনেক লোকজন কাজ করবে, ব্যবসা কাকে বলে বাবাকে দেখিয়ে দেবে। কিন্তু অনেক টানা হ্যাঁচড়ার পর ভদ্রলোক ছেলের হাতে মাত্র দশটি হাজার টাকা গুনে দিয়ে বলেছিল, এই দিয়ে যা পার করো, এর বেশি আর এক কপর্দকও দেবার ক্ষমতা নেই।

সেই দশ হাজার টাকায় বিজন সরকার যে ব্যবসা ফেঁদে বসেছিল, তার নিজের চোখেই সেটা একটা খেলনার মতো। এই হতাশার দরুন তার মেজাজ-পত্র ভালো ছিল না কোন দিন। আর ওই ক্ষোভের দরুন বাড়ির কারো সঙ্গে তেমন বনিবনাও ছিল না।

সেই ছেলে এমন একটা কাণ্ড করে বসতে পারে, অবিনাশ সরকারের কল্পনার বাইরে। কারণ নিজের ক্লাবের কোনো অনুষ্ঠানে ছেলেকে কোনদিন দর্শকের আসনে এসে বসতেও দেখেনি। সেই ছেলে যখন আচমকা ঘোষণা করে বসল, মা-কে বিয়ে করবে, ভদ্রলোক স্তম্ভিত। ছেলের উপার্জন কি জানে না, অতএব সঙ্কল্প শুনে তার তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাছাড়া ভদ্রলোক যত বড় নাট্যকারই হোক, আর মায়ের কল্যাণে তার সংস্থাটির আয় পয় বেড়েছে বলে তাকে যত স্নেহই করুক, পাঁচ জায়গায় থিয়েটার

করে পাঁচজনের প্রেমিকা সেজে টাকা রোজগার করে যে মেয়ে, তাকে একেবারে ঘরে বউ করে আনার প্রস্তাবটা সে ভাবতেও পারে না। হীরা সিংকে ডেকে জেরা করতে ব্যাপার কি করে এত দূর গড়ালো সেটা ফাঁস হয়ে গেল। তাকে ধরে মারতে বাকি রাখল প্রথম। বেচারা হীরা সিংয়ের দোষ কি, সে জানে, দাদাবাবু যখন বিয়েই করবে দিদিমণিকে, তখন আগে থেকে একটু আধটু মেলামেশা করলে কি আর এমন দোষ? এতকাল কলকাতায় থেকে কম তো দেখল না।

অবিনাশ সরকার ছেলেকে ডেকে জবাব দিল, বউ নিয়ে অন্যত্র বাস করার মুরোদ থাকলে বিয়ে করতে পারে, তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকবে না।

ছেলেও গোঁয়ার। তেমনি পাল্টা জবাব দিল, ঠিক আছে।

কিন্তু এই পর্যায়ে বেঁকে বসল আমার মা। সরকার মশাই পিতৃতুল্য তার, অসময়ে আশ্রয় দিয়েছে, সামান্য হলেও একলার চলে যাওয়ার মতো রোজগারের রাস্তা খুলে দিয়েছে। মায়ের আশা ছিল, সরকার মশাই প্রস্তাব শুনে খুশি হবে, তার ছেলেও সেই রকম আশ্বাসই দিয়েছিল। তার উগ্র মূর্তি দেখে মা হতভম্ব। মায়ের সঙ্গেও ভদ্রলোক যথেষ্ট দুর্ব্যবহার করেছে। সকলের সামনে অকৃতজ্ঞ বলে গালাগাল করেছে।

বাবাকে ডেকে মা জানিয়ে দিয়েছে, এ বিয়ে হবে না, কারো অশান্তির কারণ সে হতে চায় না, তার জন্য কারো পরিত্যক্ত হবারও দরকার নেই।

আমার ধারণা—মায়ের আমি অবাঞ্ছিত সন্তান। অনেক পরে ধারণাটা বদ্ধমূল হয়েছে। আট-ন' বছরের ছেলের কাছে মাসি হেসে হেসে গল্প করেছে, তোর বাবাকে ফিরিয়ে দেবার পর কি সঙ্কটই না গেছে তোর মায়ের। বাড়ি ছেড়ে আমার সঙ্গে আমার বস্তিঘরে এসে থেকেছে। আর তারপর আত্মহত্যা করার ফিকির খুঁজেছে। তোর মায়ের সেই চোখ-মুখ আর রকম সকম দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল। একদিন এক পৌটলা ঘুমের ওষুধ পেলাম তার বাক্স

ঘেঁটে। সেই রাতেই সেগুলো নিয়ে সরকার মশাইকে দেখালাম, আর বললাম, এ বিয়ে না হলে ইন্দুমতীর বাঁচার উপায় থাকবে না। আমার মুখে সব শুনে সরকার মশাই পাথরের মতো বসে রইল খানিক। তারপর উঠে সোজা আমার বস্তিঘরে চলে এলো। মায়ের মাথায় হাত রেখে বলল, আমি তোমার ছেলে, ছেলের দোষ নিও না, আমি তোমাকে মা লক্ষ্মীর মতই আমার ঘরে নিয়ে যাব।…এর পাঁচ দিনের মধ্যে তোর বাপের সঙ্গে তোর মায়ের বিয়ে, আর বিয়ের ঠিক সাত মাসের মাথায় তুই এসে হাজির হলি।

বাবা-মায়ের বিয়ের গল্প শুনে আট-ন' বছরের এক অবোধ ছেলের মালতী মাসির প্রতি কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিল না। সঙ্কটের সময় সে-ই মাকে আশ্রয় দিয়েছে, আত্মহত্যার হাত থেকে মাকে রক্ষা করেছে, মা আত্মহত্যা করলে আমার কি দশা হত, আমি কেমন করে এই পৃথিবীর মুখ দেখলাম? অবিনাশ সরকারকে বলে বাবা-মায়ের বিয়েও সে-ই ঘটিয়ে দিয়েছে, মালতী মাসির থেকে ভালো আর আপনার জন ছুনিয়ায় কে আছে? কিন্তু পরে, অনেক পরে একটা চেতনার যন্ত্রণা আমার মাথায় কেটে কেটে বসেছে।·· মায়ের সঙ্কটটা কি, কেন বাড়ি ছেড়ে তাকে মাসির সঙ্গে বস্তিঘরে এসে থাকতে হয়েছিল, আর কেন-ই বা সে আত্মহত্যার ফিকির খুঁজছিল? সবেরই একটাই জবাব। আমি আসছিলাম বলে। আমিই মায়ের তখন সঙ্কট বলে। আমি তখন অবাঞ্ছিত বলে। আমাকে নিয়েই মায়ের যত সমস্যা।

তখন মনে হত, আমার সকলের থেকে বড় শত্রু কেউ থাকে তো সে মালতী মাসি। এই ছুঃসহ অস্তিত্বটা টানতে হচ্ছে শুধু তার জন্যেই।

মাসি বলত, তোর বাবা গোঁয়ার হলে কি হবে, তার চোখ ছিল! বিয়ের আগেই মাকে বলত, থিয়েটার করে কোনদিন কিছুই হবে না, একটা সিনেমায় একবার নাম করতে পারলে টাকাও যেমন খ্যাতিও তেমনি। সিনেমায় নামতে চেষ্টা করো। তোর মায়েরও মনে মনে সেই আশা, ফিল্ম আর্টিষ্ট হবে, কি করে সেটা হওয়া যায় আমার সঙ্গে সেই পরামর্শ করত…তোর মায়ের ফটো খুব সুন্দর ওঠে, সেটা তোর

বাবা আগেই জানত, বিয়ের কিছুদিন পরেই ভালো ষ্টুডিও থেকে সে তোর মায়ের এক গাদা ফটো তুলে ফেলল। কত ঢংয়ের কত রকমের ছবি সব—

হ্যাঁ, সেই ছেলেবয়সে মা-খোয়ানোর ক্ষত বুক চেপে সেই সব ছবি আমি নিজের চোখেই দেখেছি। বাবার কাছ থেকে চাবি সরিয়ে, মায়ের দেরাজ বা আলমারি থেকে সব জিনিস পত্র টেনে বার করে তছনছ করে ফেললে কে নিষেধ করবে, কে ধমক লাগাবে? ওই করতে গিয়েই দেরাজ থেকে মায়ের দু'-তিনটে ফটো অ্যালবাম বেরিয়েছে। ওই অ্যালবাম আমার আগেও চোখে পড়েছে কিন্তু মা কখনো সে-সব নেড়েচেড়ে দেখতে দেয় নি।

শিশু মনের এক জমাট বাঁধা আক্রোশ নিয়ে সে-সব খুলে বসতাম। কিন্তু কখন যে মা-কে দেখার মধ্যেই তন্ময় হয়ে যেতাম, টের পেতাম না। মা যে কত সুন্দর সেটা যেন আগে দেখি নি, আগে বুঝি নি। বাড়িতে এই মায়েরই হাসি মুখ দেখেছি, গম্ভীর মুখ দেখেছি, সুন্দর ভ্রূকুটিও দেখেছি, তবু ছবিতে ওই সব দেখে মনে হত, এমন আর কখনো দেখি নি।

এই সব ছবি বাছাই করে বাবা নাকি সিনেমার কর্তাদের কাছে পাঠিয়ে দিত! ছবির সঙ্গে মায়ের পরিচয় থাকত। অল্পস্বল্প নাম তো থিয়েটারের জন্যই হয়েছিল, তাই ছবি দেখে ওই ছবিওয়ালাদের কারো কারো আগ্রহ হল।

হলে কি হবে, সেই গোড়া থেকে তুই সোজা জ্বালিয়েছিস তোর মাকে! মালতী মাসি বলত, ও-সময় চেষ্টা করার জন্য তোর বাবার সঙ্গে ঝগড়া পর্যন্ত হয়ে গেছে, তোর মা কারো সঙ্গে তখন দেখা করতেই রাজি নয়।

অর্থাৎ আমি আসছি সেটাই অন্তরায় তখন।

অ্যালবাম থেকে মায়ের ফটোগুলো খুলে সামনে ছড়িয়ে রাখতাম, আর ভাবতে চেষ্টা করতাম, মা কোথাও যায় নি, নানান মূর্তিতে আমার সামনেই আছে। ভাবতে না পারলে বলতাম, আমি আসার পরে আর তো তোমাকে বেশি জ্বালাতন করি নি, বিরক্ত করি নি। আগে

যা হয়েছে তার জন্যে আমার কি দোষ। তুমি আমাকে ফেলে গেলে কেন, আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলে না কেন? আমি মা ছাড়া থাকতে পারি না, জানো না? তুমি ছেলেকে ছেড়ে থাকতে পারছ কি করে?

আমি জন্মাবার ছ'মাস বাদে বাবা আর মা একসঙ্গে আবার ছবির জগতে হানা দিয়েছে। মালতী মাসি বলে, সংসার তখন প্রায় অচল তোদের, তোর জন্য ঠিক একটু দুধ জোটানও শক্ত হয়ে উঠছিল।

এমন দুরবস্থায় পড়ার কারণ, দাদু অর্থাৎ বাবার বাবা সরকার মশাই হঠাৎ চোখ বুজেছে। তারপরেই ভাইদের মধ্যে অশান্তি। ছোট দুই ভাই বলেছে, দশ হাজার টাকা দিয়ে বাবা তাকে আলাদা ওয়ার্কশপ করে দিয়েছে অতএব ডেকোরেটিং-এর ব্যবসায় তার কোনো ভাগ নেই। বাবা ভয়ঙ্কর জেদী আর একরোখা মানুষ—ভাইদের সঙ্গে ঝগড়া করে মা-কে নিয়ে আর আমাকে নিয়ে বাড়ি ছেড়েই চলে এসেছে। তখন সস্তাগণ্ডার দিন, তাই পঞ্চাশ টাকায় দু'টো ঘর ভাড়া পাওয়া গেছল। কিন্তু সেই পঞ্চাশ টাকাই বা আসে কোথা থেকে? মালতী মাসির অবশ্য খুব ইচ্ছে ছিল, মা আর মাসি দু'জনে মিলে সরকার মশাইয়ের থিয়েটারটা চালায়। থিয়েটার একেবারে বন্ধ হবার ফলে তারও তো চরম দুরবস্থা তখন।

বে-গতিক দেখে মায়ের অনিচ্ছা ছিল না খুব, কিন্তু বাবার তখন মা-কে সিনেমা-ষ্টার বানাবার ঝোঁক চেপেছে মাথায়—একবার নাম করে ফেলতে পারলে অঢেল টাকা। তখন নিজের মনের মতো একটা ইলেকট্রিক্যাল কারখানা জাঁকিয়ে তোলা জল-ভাত ব্যাপার। সেই ভবিষ্যতের আশায় ছোট যে ওয়ার্কশপটা ছিল তার মূলধন ভেঙে আর যন্ত্রপাতি বেচে কায়ক্লেশে সংসার চলছিল।

তোর মায়ের একখানা বরাত বটে, বুঝলি। সামনাসামনি দেখে খুশি না হলেও ফটো দেখে দুই-একজন সিনেমার লোক খুশি হয়েছিল। তোর বাপের মতো চোখ ছিল তাদেরও, প্রথম ছবিতে নায়িকার থেকেও কাগজে তোর মা বেশি প্রশংসা পেয়ে গেল। দ্বিতীয় ছবিতেও তাই। তৃতীয় ছবিতে সরাসরি নায়িকা হয়ে বসল একেবারে। একচোখা

ঠাকুর মুখ তুলে তাকালে ওই রকম করেই তাকায়, সেই এক ছবিতে বাজার মাৎ।

তারপর? তারপর কি জানি, লাফিয়ে লাফিয়ে ভাগ্য ফিরতে লাগল আমাদের। যে-ভাগ্য লোকে স্বপ্নে কল্পনা করে থাকে, সেই রকমই ভাগ্য। আর তলায় তলায় দুর্ভাগ্যও সঞ্চিত হচ্ছিল কিছু, কিন্তু সেটা টাকার ঝকমকানির তলায় চাপা পড়েছিল!

মালতী মাসির প্রতি মা অকৃতজ্ঞ হয় নি। ভাগ্যের মোড় ফে'ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে নিজের কাছে এনে রেখেছে। মালতী মাসি আমাদের দুঃখের ভাগীদার, সুখেরও। পরে মায়ের বড় হবার গতি যখন আরো দুর্বার উর্ধ্বমুখী, তখন ছোটখাট রোলে তাকে ঠেলে দিতে কার্পণ্য করেনি মা। কিন্তু মাসির কেন যেন আর দুপায়ে দাঁড়াবার মতো উৎসাহ বা উদ্দীপনা ছিল না। পরিতুষ্ট মুখে মাসি আমাকে বলত, সমস্ত জীবন নিজের ভাবনা ভেবেছি আর কাঁহাতক ভালো লাগে বল, সুখের ঘরে খেয়ে দেয়ে দিব্বি মুটিয়ে যেতে লাগলাম।

....সুখের ঘর! মা এই ঘর ছেড়ে চলে যাবার পরেও মাসি সুখের ঘর বলতে পেরেছিল কি করে সেটা বিশ্লেষণ করার বয়স নয় আমার তখন। পরে মাসির বাক-চাতুরীর সেতু ধরেই আমাদের সুখের ঘরের রূপটা আমি চোখ বুজে কল্পনা করতে পেরেছি।

...মায়ের সঙ্গে বাবার প্রকাশ্যে মনোমালিন্য শুরু হয়েছিল আমার চার বছর বয়সের সময় থেকে। বাবা সেই জাতের মানুষ, যারা নিজের স্বার্থের প্রয়োজনে উদারতার সুতোটা গড়গড করে ছেড়ে দিয়ে বসে থাকতে পারে। কিন্তু প্রয়োজন ফুরোলে সে সুতো গুটোবে। আমাদের সুখের ঘরে বাবার তখন ওই সুতো গুটোবার মেজাজ। মা চড়চড় করে খ্যাতির শিখরে উঠতে লেগেছে তখন। বছরে চার-পাঁচটা করে কণ্ট্রাক্ট সই করছে। একটার থেকে আর একটার প্রাপ্তির অঙ্ক বেড়ে চলেছে। এ-সব ব্যাপারে বাবার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। টাকা পয়সার ব্যাপারে পার্টির ফয়সালা করতে হবে বাবার সঙ্গে। গোড়ায় গোড়ায় সঙ্কোচবশেই দেনা পাওনার হিসেব নিকেশ মা বাবার হাতে ছেড়ে

দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিল। কিন্তু পরে এই নিয়েও খিটির-মিটির বাঁধতে লাগল। মা কারো প্রতি সদয় হয়ে বা প্রয়োজন বোধে কোথাও অল্প টাকায় কাজ করতে রাজি হলে বাবার সঙ্গে দস্তুরমতো ঝগড়া বেঁধে যেত। বাবার ভিতরে ভিতরে তখন নানারকম সন্দেহের কাটাছেঁড়া শুরু হত। তা ছাড়া পয়সাওয়ালা সব পার্টি বাবার এই আধিপত্য প্রীতির চোখে দেখবে কেন? লেন-দেনের ব্যাপারেও তারা অনেকে সোজাসুজি মায়ের সঙ্গেই কথা-বার্তা কইতে চাইত। মা তাতে রাজি হলেই বাবা খাপ্পা।

প্রথম দিকে বাবা প্রায় সর্বক্ষণ মায়ের সঙ্গে ষ্টুডিওতে থাকত। বিকেলে মাকে নিয়ে বাড়ি ফিরত। নিজের মস্ত ফ্যাক্টরী করার সঙ্কল্প একরকম ধামাচাপা। বাবা সঙ্গে থাকার দরুন গোড়ায় মায়ের সুবিধে হত, কিন্তু নতুন জগতের যাবতীয় কিছু বুঝে শুঝে নিতে কত আর সময় লাগে? ফলে ক্রমশ বাবার উপস্থিতি অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠতে লাগল। আর কিছু না হোক, আড়ালে যে বাবাকে নিয়ে পাঁচজনে পাঁচ রকমের রসিকতা করে সেও মায়ের ভালো লাগত না। স্ত্রী অভিনয় করছে আর স্বামী সাক্ষীগোপালের মতো বসে তাকে পাহারা দিচ্ছে, এ কার ভালো লাগে? লোকে আড়ালে অন্তত হাসি ঠাট্টা করবেই।

বাবাকে মা সেটা বোঝাতে চেষ্টা করেছে। বলেছে, এখন আর তোমার রোজ এত সময় নষ্ট করার দরকার কি, নিজের কাজকর্মে এবারে একটু মন দাও না।

মা এ-কথা বললেই বাবার দু'চোখের চাউনি ধারালো হয়ে উঠত নাকি। টাকা পয়সা আদায়ের ব্যাপার না থাকলে নিজে থেকেই ষ্টুডিওয় আসা কমাতে হল তাকে। আউটডোর শুটিং এর জন্য আগে যখন দু'-পাঁচ দিন বাইরে কাটাতে হত, বাবা সঙ্গে না থাকাতে মা অসহায় বোধ করত। কিন্তু মা পরে আভাসে ইঙ্গিতে বারকয়েক আপত্তি জানিয়ে শেষে সরাসরি একদিন বলে দিল, তোমার আসার দরকার নেই, এবার থেকে মালতীদিকে নিয়ে যাব।

মালতী মাসি হেসে হেসে গল্প করত, কুটকুট করে তোর বাবার সঙ্গে মা কি ঝগড়াই না করত। আর তোর বাবা ফুঁসতে থাকত।

বাইরে যাবার ব্যাপারেও ছেঁটে দিতে চাওয়ার ফলে বাবা রাগত গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করেছিল, কেন, আমি সঙ্গে থাকলে তোমার অসুবিধে হয়?

একটু হয়। ঠিক মতো কাজে মন দিতে পারি না।

আগে তো পারতে?

মা জবাব দিয়েছিল, আগের অভিনয়ের মান ছাড়িয়ে যেতেই চাই। তাছাড়া নিজের কাজকর্ম ছেড়ে সবসময় স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরলে—লোকে বলে কি?

মা কথা কাটাকাটি কমই করত, কিন্তু কি চায় না চায়, সেটা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিত।

মালতী মাসি অবশ্য এক এক সময় মায়ের দিক টেনেও কথা বলত। তোর বাপেরও বুদ্ধির দোষ, আগে তোর মাকে ফিল্মষ্টার-বানাবার জন্য ওই লাইনের পয়সাওয়ালা লোকদের কতভাবেই না তোয়াজ তোষামোদ করেছে। তখন এত উদার যে কোনো পার্টি থেকে তোর মা রাত বারোটায় কারো গাড়িতে বাড়ি ফিরলেও টুঁ শব্দটি করে নি, আর যেই টাকার বৃষ্টি শুরু হয়েছে মাথায় অমনি শেকলে বাঁধার মতলব তোর মাকে—তাও কখনো হয়।

মালতী মাসির মুখে শুনেছি, চার বছর বয়সের সময় আমার একটা বোন হয়েছিল, সেই বোনকে আমি চোখে দেখি নি কখনো। মা দিনকয়েক মাত্র বাড়ি ছিল না, বাইরে শুটিং থাকলেও তো দু'-পাঁচদিন করে হামেশাই বাড়ি থাকে না, কোথায় গেছল, আমি কি করে জানব?…নার্সিং হোমে মরা বোন হয়েছিল আমার, সেখান থেকেই সব ঝামেলা চুকেবুকে গেছে। কিন্তু বোন আসার ব্যাপারেই নাকি বাবার সঙ্গে মায়ের ঝগড়া লেগেই থাকত। মায়ের জন্য তখন নাকি তিন-চার মাস ধরে অনেকের অনেক টাকা লোকসান হয়েছে—কারণ মা তো তখন আর কাজ করতে পারে নি, তিন-চারটে ছবি আধা-আধি

শেষ করে ফেলে রাখতে হয়েছিল। সেইজন্তেই নাকি বাবার সঙ্গে মায়ের তখন অত ঝগড়া।

মনে মনে আমি তখন নানারকম কল্পনা করতাম। ওই অদেখা বোনের ওপর আমার ভারী মায়া পড়ে গেছল। সে নিশ্চয় মায়ের ওপর রাগ করে একেবারে মরে জন্মেছে। মা আমাকেও চায় নি, ওকেও চায় নি। আমিও যদি ওই অদেখা বোনের মতই মায়ের ওপর শোধ নিতে পারতাম! মরে জন্মাতে পারি নি, কিন্তু এখন যদি মরে যাই? লোকে মরে যায় কি করে, সেও তখন আমার কাছে আবার এক গবেষণার বস্তু।

নার্সিং-হোম থেকে ফিরে এসেই মা আমাকে নিয়ে ঘর বদল করেছে। রাগের চোটে বাবা নাকি বাড়িতেই ছিল না ক'দিন। আর তারপর থেকেই বাড়িতে বসে মায়ের চোখের ওপর মদ খাওয়া ধরেছে। কিন্তু শক্ত ধাতের মা আমার, ও-সবে পরোয়া করার মেয়ে নয়।

এই ঘর টিকবে না, বাবা তার ঢের আগে থেকেই বুঝেছিল। গোঁ ভরে যাই করুক, বুদ্ধি নেই তার, এ-কথা কেউ বলবে না। মাকে একটি কথাও না বলে খুব গোপনেই সে আবার নিজের ভবিষ্যৎ নির্বিঘ্ন করে তুলতে চেয়েছিল। মায়ের রোজগারের টাকা তখন মা আর বাবার দু'জনের নামে ব্যাঙ্কে জমা হত। ইচ্ছে করলে দু'জনের যে কোন একজন সেই টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তুলতে পারত। তাছাড়া সমস্ত টাকাই ব্যাঙ্কে থাকত না, ইন্‌কাম ট্যাক্সের হানাদারী ঠেকাবার জন্য অনেক কাঁচা টাকা ঘরেও মজুত থাকত। এতদিন পর্যন্ত ব্যাঙ্কের চেক-বই আর ঘরের টাকা সবই বাবার হেপাজতে ছিল। মালতী মাসির ধারণা, বাবার মস্ত এক ইলেকট্রিকাল কারখানা কেঁদে বসার ব্যাপারটা যখন জানাজানি হয়ে গেল, তার আগে ব্যাঙ্কে নগদ মিলিয়ে লাখ চারেক টাকা ছিল। কিন্তু টাকার খোঁজ পড়তে দেখা গেল, চারশ' টাকাও নেই।

জানাজানি হয়ে গেল এই বাড়ির জমিটা কেনার সময়। জমিটা

দেখে মায়ের তো পছন্দ হয়েই ছিল, বাবারও অপছন্দ হয় নি। পাঁচ কাঠা জমি, এক লাখ তিরিশ হাজার টাকা দাম।

মা বলল, কিনে ফেলো।

বাবা বলল, কিনব কোত্থেকে, টাকা নেই।

মা অবাক! টাকা নেই মানে?

মানেটা বোঝার পর মা স্তব্ধ একেবারে। মালতী মাসি পর্যন্ত দু'-তিনদিন তখন মায়ের সঙ্গে একটা কথা বলতেও সাহস করে নি।

পাঁচ-দিনের মধ্যেই শুধু মায়ের নামে এই জমি কেনা হয়েছে। তখন তো টাকার থলে নিয়ে মায়ের পিছনে লোক ঘুরছে। গোটা তিনেক ছবির আগাম বায়না নিতে সমস্যা মিটেছে। কিন্তু ঘরের সমস্যা দ্বিগুণ বেড়েছে। বোকা তো মাও নয়, ওই অতবড় কারখানা চালু করতে বাবার বড় জোর লাখ দুই টাকা লেগেছে। বাকি সব টাকা সরিয়ে বাবা যে শুধু নিজের দখলে রেখেছে, সেটা বুঝতে বাকি থাকে নি। মা এরপর সমস্ত পার্টিকে জানিয়ে দিয়েছে, প্রাপ্য টাকা শুধু তার হাতেই দিতে হবে আর কাউকে নয়। কন্ট্রাক্টর এসে এই জমিতে বাড়ি তোলার কাজে হাত দিয়েছে তখনো মা একদিনের জন্যেও বাবার সাহায্য চায় নি। বাড়িও মায়ের নামে হয়েছে।

মালতী মাসির অনুপ্রাস আর ব্যঞ্জনা স্মরণ না করেও তার পর থেকে এই সরকার বাড়ির জীবন-যাত্রা আমি অনায়াসে কল্পনা করতে পারি।···একসঙ্গে বিশ্বাস আর টাকার ওপর দখল খুইয়ে বাবা বেপরোয়ার মতো এরপর মায়ের ওপর দখল নেবার জন্য যে মরিয়া হয়ে উঠছিল, তার নজির তো আমি নিজের চোখেই দেখেছি একদিন। বাবা এই মেজাজেরই লোক। তাছাড়া যে বস্তুটার দংশনে এ-যাবৎ বহু প্রেমিক-প্রেমিকার ঘর ভেঙেছে দুনিয়ায়, সেই ঈর্ষার কীট-দংশনে সর্বদাই তখন বাবার মগজেও কেটে বসছিল মনে হয়। সেই পয়সাওয়ালা ঈর্ষার মানুষ যারা, এ-বাড়িতে তাদেরও আমি অনেক দেখেছি।

আরো একটা সত্য আমার কাছে স্পষ্ট। বাবাকে মা ভয় করত। সমীহ করত না, শ্রদ্ধা করত না, শুধু ভয় করত। আর ঘৃণা করত।

কত যে ঘৃণা করত, সেটা মায়ের দু'চোখে উপছেও উঠত সময় সময়। কিন্তু ঘৃণার দরুন মা বাড়ি ছেড়ে চলে যায়নি, গেছে ভয়ে! নিজের বাড়ি, ভয় না করলে অনায়াসে বাবাকেই তো বাড়ি থেকে সরিয়ে দিতে পারত। আদালতে খুব সংগোপনে বাবা-মায়ের বিয়ে নাকচ হয়ে গেছে। কিন্তু এ-সব খবর গোপন থাকে না। বাবাকে ভয় না করলে এ ফয়সলাও মা এ-বাড়ির ওপর দখল রেখেই করতে পারত।

* * * *

মা চলে যাবার পর দিনকতক এক অব্যক্ত হাহাকারের মধ্যে কাটিয়েছি আমি। নানারকম ক্ষোভের আকারে সেটা প্রকাশ পেত। দিনগত সমস্ত ব্যাপারে আমার রুদ্রমূর্তি। বাবা টের পেলে ঠাস ঠাস চড় বসিয়ে দিত গালে, তার শক্ত হাতের আঙুলের দাগ বসে যেত। মায়ের ওপর আমার রাগ, কিন্তু আরো ছেলেবেলা থেকে ওই বাবার ওপর আমার বিদ্বেষ।

সেই মানসিক অবস্থার মধ্যেও একটা ব্যতিক্রম লক্ষ্য করেছি। যে মালতী মাসি মা বাড়ি ছেড়ে যাবার আগে পর্যন্তও বাবার মুখোমুখি পড়ে গেলে ভয়ে চুপ মেরে থাকত, মা যেদিন থেকে আর বাড়ি ফিরল না, সেই রাতেও বাবা কথা শোনার জন্য তাকে ঘরে ডাকতে ভয়ে কাঠ হয়ে যেতে দেখেছি—সেই মাসি কিনা এরই মধ্যে দিব্যি সহজ হাসি-মুখে বাবার ঘরে চলে যায়, তার সঙ্গে কথা-বার্তা বলে, এমন কি নাওয়া-খাওয়া বা স্কুলে যাওয়া নিয়ে আমি বেশি গোঁয়ার্তুমি করলে বাবাকে বলে দেবে বলে শাসায়ও! সেদিনের সেই অপরিণত মনও আমাকে বলে দিয়েছে, মালতী মাসি যতই ভালবাসুক আমাকে, মা চলে গেছে বলে ওই মাসি আমার মতো ব্যথা একটুও পায় নি। রোজকার মতো তার পরেও সে আমাকে ঘুম পাড়িয়ে গেছে, কিন্তু একদিনের জন্যও মায়ের ওই জায়গাটা আমি তাকে দখল করতে দিই নি।

বাইরে আমার উগ্র ভাবটা দিন পনেরোর মধ্যে কমে এলো। ভিতরে যে ফাঁকা যন্ত্রণাটা থিতিয়ে থাকল, সেটা কেউ দেখতে পায়

[illegible] জন্যে স্কুলের ছুটি ছিল সেদিন। দুপুরে মাসি চুপি চুপি আমাকে জিজ্ঞাসা করল, এই, তোর মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যাবি?

আমি চমকে উঠলাম। মা কোথায়?

আছে এক জায়গায়। যাবি তো চল্, তোর মায়ের আজ ছুটি। বিকেলে তোর বাবা আসার আগেই চলে আসব আবার। খবর্দার, তোর বাবাকে একটি কথাও বলবি না!

আমি চুপচাপ খানিক মাসির মুখখানা দেখে নিলাম। মা কোথায় আছে আর আজ ছুটি, তুমি জানলে কি করে?

একটু আগে তোর মা ফোন করেছিল, আগেও দুই একদিন ফোনে তোর খবর নিয়েছিল।

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, আমাকে তুমি কিচ্ছু বলো নি কেন? কেন বলো নি? দাও, আমাকে ফোন নম্বর দাও।

আমার রাগ দেখে মাসি গায়ে পিঠে হাত বোলাতে এলো। ছিঃ রাগ করতে হয় না, তোর মা যে তোকে ফোন নম্বর দিতে বারণ করেছে।

একটা দগদগে ক্ষতের ওপরে যেন আগুন ছিটিয়ে দিল কেউ। ঠিক আছে, আমি যাব না, মা-কে বলে দাও, সুমন মরে গেছে!

ছুটে চলে এসে নিজের বিছানায় মুখ গুঁজে শুয়ে পড়লাম। একটু পরে মাসি আবার গায়ে-পিঠে হাত বোলাতে এলো, আমি তাকে ঠেলে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করলাম।

লক্ষ্মী মাণিক, অমন করে না, মাসির মিছরি-ভেজানো গলা একেবারে, তোর মা যে তোকে ডেকেছে, তুই যাবি বলে আজ কোথাও বেরুচ্ছে না—না গেলে এমন রাগ করবে যে আর কোনদিন হয়তো তোর সঙ্গে দেখাই হবে না—চল্, চটপট ঘুরে আসি, সন্ধ্যার আগেই আবার ফিরে আসতে হবে তো!

উঠে বসলাম। মুখ গুঁজে পড়ে থাকলেও চোখ দিয়ে আমার জল গড়াচ্ছিল না। ভিতরে যা-ই হতে থাকুক, ওই বয়স থেকেই চোখ আমার খরখরে শুকনো। রাগ পড়ে নি, কিন্তু মা-কে দেখবার জন্য ভিতরটা আমার লালায়িত।

ট্যাক্সি থেকে নেমে আমার হাত ধরে একটা মস্ত বড় বাড়িতে ঢুকে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে একটা চাকর আর একটা দারোয়ান গোছের লোক ছুটে এলো! আমাদের খুব খাতির দেখিয়ে দোতলায় নিয়ে গেল।

দোতলায় উঠেই দেখি, একটা ঘরের সামনে মা দাঁড়িয়ে। সেই মা—পিঠের ওপর খোলা চুল, পরনে সাধারণ একটা ফর্সা শাড়ি, বাড়িতে যেমন পড়ত।

বয়স আমার মাত্র সাত তখন, তবু মায়ের কি বেশ ব্যগ্র মুখ দেখে ছিলাম আমি? মনে হয়, দেখেছিলাম। আর দেখেছিলাম বলেই আমার ভিতরের অভিমান অমন চাড়িয়ে উঠেছিল।

এসো মালতীদি। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে হাত ধরে মা আমাকে একটা মস্তবড় ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে গেল। আলনায় শাড়ি-টাড়ি দেখে বুঝলাম, এটাই মায়ের শোবার ঘর এখন। আমাকে বিছানায় বসিয়ে গা ঘেঁষে মা-ও বসল। মালতী মাসি আমাদের সামনেই একটা গদি-আঁটা মোড়া টেনে নিল।

দিব্য হাসি মুখে মা জিজ্ঞাসা করল, আমার ওপর বুঝি খুব রাগ হয়েছে তোর!

আমি জবাব দিলাম না।

তোর মাসি বলছিল, তুই খুব লক্ষ্মী ছেলে হয়ে গেছিস, একটুও দুষ্টুমি করিস না, সকলের কথা শুনিস—

অভিমান ও রাগ বাড়ছে। কেন যে প্রতিবাদ করা একান্ত দরকার হল, জানি না। মাসি মিথ্যে কথা বলেছে।

ও মা, সে কি রে! মায়ের গলার স্বরে তখনো হাল্কা কৌতুক।

আগের থেকে আরো বেশি দুষ্টুমি করি, কারো কথা শুনি না।

মা আমার দিকে চেয়ে রইল, হাসি মাখা চাউনি, কিন্তু মুখের দিকে চেয়ে যেন ভিতরটা দেখে নিচ্ছে। ঠিক মতো খাওয়া দাওয়া করিস তো?

না।

পড়াশুনা?

বই ছুঁইও না।

খুব খারাপ কথা, মা গম্ভীর একটু, পড়া না পারলে স্কুলে বকে না ?

খু-ব। বাড়ির মাষ্টারমশাই সেদিন কানটা ছিঁড়ে নিচ্ছিল প্রায়।

কেন যে কথা ক'টা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, কে জানে। বলার পর মনে হল, শুনে মা যেন একটু যন্ত্রণা বোধ করল। মা থাকতে বাড়ির মাষ্টার সত্যিই কোনদিন আমার গায়ে হাত দেয় নি। মাষ্টারমশায়ের কাছে আমার অপরাধের প্রসঙ্গ অনুক্ত থাকল। তিনবার করে বলার পরেও আমি যখন পড়ায় মন দিচ্ছিলাম না, মাষ্টারমশাই জোর করে আমার মাথাটা বইয়ের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছিল, আর আমি তখন হঠাৎ রেগে গিয়ে বিকটভাবে তাকে ভেংচি কেটে উঠেছিলাম।

মা মালতী মাসির দিকে তাকালো একবার। চাপা গলায় হুকুম করল, গায়ে হাত তুলতে বারণ করে দিও।

শোনামাত্র আমার রাগ আবার শয়তানির আকারে চাড়া দিয়ে উঠল। আমার ওপর গঞ্জনাটা মায়ের একটু যন্ত্রণার কারণ, সেটা আরো স্পষ্ট করে বোঝা গেল। বললাম, মাষ্টারমশাই কি এমন গায়ে হাত তোলে, বাবার এক-একটা চড় খেয়ে প্রায়ই মাথা ঘুরে পড়ে যেতে হয়—

মায়ের চোখে-মুখে এবারের যন্ত্রণা দেখে আমি নীরিমত্তো আনন্দ পাচ্ছি। এই যন্ত্রণা রাগ হয়ে জমাট বাঁধছে। মাসির দিকে তাকিয়েছি আবার।

মালতী মাসি যেন বেশ অস্বস্তি বোধ করছে। মায়ের চোখ এড়িয়ে আমার দিকে ফিরল, তুই বেশি বেশি বলিস না তো!

বেশি বেশি। সামান্য কথায়ও কেন যে এত রাগ হচ্ছে আমার. জানি না। প্রথম দিন চড় খাবার পর জল দিয়ে ঘষে আমার গাল থেকে তুমি বাবার আঙুলের দাগ তুলতে চেষ্টা করো নি, বাবার চামারের হাত বলোনি ? মায়ের দিকে ফিরলাম, মাসি তো এখন বাবার দিক টেনে বলবেই, বাবার সঙ্গে খুব যে এখন—

নিঃশব্দে কিছু একটা চকিত কাণ্ড হয়ে গেল, মনে হল। মাসি যেন ধড়ফড় করে উঠল, তার কালো মুখখানা শুকিয়ে আমসি। আর

মাও যেন স্বস্তি বোধ করছে না একটুও। জোর করেই যেন বিস্মিত দু'চোখ মাসির দিকে ফেরালো।

মালতী মাসি খানিকটা আমতা আমতা করে বলল, তুমি নেই, তাই আমার কাছ থেকেই সর্বদা ওর ঘরোয়া খবর নেয়…

মৃদু-কঠিন স্বরে মা জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু ওকে হঠাৎ এত শাসন করার দরকার হয়ে পড়ল কেন?

দিনকতক ভয়ানক দুষ্টুমি করছিল আর অবাধ্য হয়েছিল, খাওয়া দাওয়া করছিল না, স্কুলে যাচ্ছিল না—

তুমি যে ফোনে বলতে, খুব ভালো হয়ে আছে ও, ওর জন্যে কিছু ভাবতে হবে না?

তেমনি বিব্রত মুখ করে মাসি জবাব দিল, গোড়ায় ক'টা দিন খুব অবাধ্যপনা করছিল, এখন আর করে না…অশান্তির মধ্যে আর তোমার ভাবনা বাড়াতে চাই নি বলে বলিনি।

জবাবদিহি শোনার পরেও মাকে একটু তুষ্ট মনে হল না। রাগ সত্ত্বেও ভিতরে ভিতরে আমার এক ধরনের আনন্দ হচ্ছে।

মা আবার আমার দিকে ভালো করে ঘুরে বসল। এত দুষ্টুমি করিস কেন?

বেশ করি।

আগে মুখের ওপর এমন কথা কখনো বলেছি কিনা, মনে পড়ে না। অবাধ্য হলে মায়ের দুই ভুরুর মাঝে যেমন বিরক্তির ভাঁজ পড়ত, আর চাউনির মধ্যে যেমন বকুনি মিশে থাকত—তেমনি দেখছি।

ফের এ-রকম শুনলে খুব রাগ করব।

পিছনে কিসের শব্দ হতে ঘুরে তাকালাম। একটা চাকর ছোট টেবিল পেতে দিল, আর একজনের হাতে মস্ত দুটো খাবারের ডিশ। আমার সাত বছর বয়সের মগজে তক্ষুনি আবার একটা দুষ্টুমির ছাপ পড়ে গেল। আমি জানি, এখন কি করলে মা আরো কষ্ট পাবে। কিন্তু তার আগে আমার কিছু বুঝে নেবার আছে।

জিজ্ঞেস করলাম, কি করে রাগ করবে, শুনবে কি করে?

তুই কখন কি করিস, না করিস, এখানে বসেই আমি খবর পাব।

তুমি আর বাড়ি যাবে না ?

না।

আমাকে এখানে থাকতে দেবে ?

মা যেন থতমত খেল একটু। তা কি হয়, ওটা আসলে তোরই নিজের বাড়ি, খুব লক্ষ্মী হয়ে থাকবি, ভালো করে পড়াশুনা করে বড় হবি।

আমি কিচ্ছু হব না, কিচ্ছু না। যা ইচ্ছে তাই করে বেড়াব, তুমি যত খুশি রাগ করো। ছিট্‌কে উঠে দাঁড়ালাম, আর সঙ্গে সঙ্গে মাথার মধ্যে আরো কি যে হয়ে গেল, কে জানে—এক ধাক্কায় ছোট টেবিলের খাবার ভর্তি ডিশ দুটো উল্টে ফেলে দিয়ে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। সোজা নিচে, তারপর গেটের বাইরে।

মালতী মাসিও পিছন পিছন ছুটে এসেছে। খপ্ করে একটা হাত ধরেছে আমার। হাত ছাড়াবার অজুহাতে আমি সরোষে ঘুরে দাঁড়িয়েছি।....মা দোতলার বারান্দায় রেলিং-য়ের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আমার দিকেই চেয়ে আছে। ভেবেছিলাম, হাত নেড়ে আবার ডাকবে আমাকে। ডাকল না। শুধু চেয়েই রইল। আমি মুখ ঘুরিয়ে নিলাম।

বাড়ি ফেরার আগেই বোঝা গেল মাসি কত চটেছে আমার ওপর। সমস্ত পথ একটি কথাও বল্‌ল না। সন্ধ্যায় বাবার ঘরের দিকে যেতে দেখলাম তাকে। কি কথা হল, জানি না, তার খানিক বাদে বাবা আমার ঘরে এলো, আগে হলে ওই মুখ আর ওই চাউনি দেখে, ভয়ে কেঁপে উঠতাম আমি।

কিন্তু আশ্চর্য, সেই মুহূর্তে আমার ভয় ডরের লেশমাত্র নেই।

মায়ের কাছে গিয়ে কি বলেছিস ? আর অমন অভদ্রতা করে এসেছিস কেন ?

আমি চুপ। বাবার দিকে চেয়ে আছি। আমাকে পিটতে এসেছে, তাও বেশ ভালই বুঝতে পারছি। কিন্তু আমার সব ভয় যেন ঘৃণা হয়ে কিলবিল করছে ভিতরে।

বাবার হাত দুটো পিছনে ছিল। সেই হাত সামনে আসতে দেখলাম, মুঠোর মধ্যে তার শৌখিন চাবুকটা। হ্যাঁচকা টানে আমাকে কাছে নিয়ে এলো।

তার পরেই আশ্চর্য কাণ্ড ঘটল একটা। চাবুকসুদ্ধু বাবার হাত উঠল, নেমেও এলো, তার আগেই আমি চোখ বুজে ফেলেছিলাম। কিন্তু ওটা আমার গায়ে না পড়ে শপাং করে আর কারো গায়ে পড়ল যেন। ভালো করে কিছু বোঝার আগেই মালতী মাসি আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে সরে গেল। তারপর দু'হাতে আমাকে জাপটে আগলে রেখে বাবার দিকে ঘুরে তাকালো।

ছাড়ো বলছি! বাবা চাপা গর্জন করে উঠল।

আমি অবাক! মাসির দিকে চেয়ে আর মাসির কথা শুনে এ কি সেই মাসি, ক'দিন আগেও যে ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকত! মাসির কালো মুখও রাগে থমথম করছে। হাত ধরা অবস্থায় আমাকে পিছনে রেখে ঘুরে দাঁড়াল। বলল, ওর মা অনেক জেনেছে, এও জানতে বাকি থাকবে না।

বাবা চেঁচিয়ে উঠল, আই ডোণ্ট কেয়ার, তুমি সরো!

মাসি সরল না, নড়ল না। পিছন না ফিরে আমাকে বলল, সুমন চলে যা এখান থেকে—

আমি যতো ত্যাঁদড়ই হই, বয়স তো মাত্র সাত। পালাবার ফাঁক পেলে কে আর সেধে মার খেতে চায়। পিছনের দরজার পর্দা ঠেলে প্রস্থান করলাম। পিছনের ঘরটা অন্ধকার। নিরাপদ ব্যবধানে এসে আমার পা আর নড়ল না। আলো না জেলে ঘুরে দাঁড়ালাম।

পর্দার ফাঁক দিয়ে দু'জনকেই দেখা যাচ্ছে। বাবা আর মালতী মাসি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। আমাকে বাঁচাতে গিয়ে চাবুকের এক ঘা মাসির ওপর পড়েছে, এখন আবার কি হয়, কে জানে।

মাসির গলায় এই সুরও অদ্ভুত যেন।—হঠাৎ ওকে শাসন করার দরকার হল কেন?

বাবা ঝাঁঝিয়ে উঠল, তা দিয়ে তোমার কি দরকার?

দরকার আছে। তখন যা সব বললাম সেটা তোমাকে সাবধান করার জন্যে, ওকে শাসন করার জন্যে নয়। মা চলে যেতে ছেলেটা ভিতরে ভিতরে পুড়ছে, চাবুক নিয়ে ওর ওপর বিক্রম দেখাতে লজ্জা করা উচিত।

মাসির কথা শুনে আমার কান জুড়োলো বটে, কিন্তু আমি তাজ্জবও তেমনি মালতী মাসি বাবাকে তুমি করে কথা বলছে!

সেই রাতেই আবার মাসিকে অদ্ভুত ভালো লেগেছে আমার। রাত্রিতে যখন আমাকে ঘুম পাড়াতে এলো, তার বুকে মুখ গুঁজে পড়ে থাকার লোভও ভিতরে উকিঝুঁকি দিচ্ছিল।

আসলে আমার সব দুষ্টুমি আর শয়তানির লক্ষ্য মা। অর্জুন যেমন তার একদিকে চেয়ে লক্ষ্যভেদ করেছিল, আমার সমস্ত আচরণও তেমনি যে পথেই ধাওয়া করুক, আসলে সেগুলো মায়ের বক্ষ ভেদ করতে চেয়েছিল।

দিন গেছে, মাস গেছে, একটা দুটো করে গোটা কয়েক বছর ঘুরছে, কিন্তু আমার ভিতরটা ঠাণ্ডা হওয়ার বদলে সর্বদাই মাকে আঘাত করতে চেয়েছে। মা আমার খোঁজ খবর করে, আমার ভালো শুনলে খুশি হয়, মন্দ শুনলে দুঃখ পায়, এটা টের পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ভালোর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছেঁটে দিতে ইচ্ছে করেছে। আমি কি করলে মা কষ্ট পাবে, যন্ত্রণা পাবে, তার নতুন নতুন রাস্তা বার করতে পারাটাই যেন মস্ত কাজ।

পরের পাঁচ-ছ' বছরের মধ্যে মায়ের কাছে আরো অনেক বার গেছি। মালতী মাসি যখনই বলে, চল তোর মায়ের ওখান থেকে ঘুরে আসি একটু, তক্ষুনি বুঝতে পারি, মা আমাকে দেখতে চায়। মাসির বেশি আগ্রহ দেখলে ভিতরের হাজার লোভ চেপে না গিয়ে মায়ের ইচ্ছেটাই যেন বরবাদ করে দিয়েছি। মা যদি বলে ডাইনে যেতে আমি অবধারিত বাঁয়ের রাস্তা ধরব, যদি বলে উত্তরে হাঁটতে, আমার পা দক্ষিণে ছোটার জন্য সুড়সুড় করবে।

ভিতরের এই পুঞ্জীভূত আক্রোশ থেকে কোনদিন মুক্তি পাব কিনা, জানি না।

এ-ক'বছরের মধ্যে একে একে দুটো বাড়িতে বাস করতে দেখেছি, মা-কে। সেই বাড়িতে অন্য পুরুষ মানুষও দেখেছি। ব্যাপারটা বুঝতে আমার একটুও সময় লাগে নি। সেই দুটো বাড়ির দুই কর্তাই আমাকে আদর করে কাছে টানতে চেয়েছে। না, তাদের সঙ্গে সামনাসামনি কোন রকম অভদ্র আচরণ করতে পারি নি। সেটা করেছি মায়ের সঙ্গে। মা কখনো বিরক্ত হয়েছে, কখনো রেগে গেছে, কখনো বা অসহায় বোধ করেছে। আমার ব্যাপারে মায়ের ভিতরের প্রতিক্রিয়া আমি মুখের দিকে তাকালে অনুভব কবতে পারি। বারো-তেরো বছর মাত্র বয়স তখন, আমার খণ্ডিত সত্তার বহির্মুখী অংশ ওই বয়সটাকে অনেক ছাড়িয়ে গেছে।

একগাদা মন্দ ছেলে আমার সঙ্গী-সাথী তখন। পাজি ছেলেদের সঙ্গে মিশলে মা মন্দ বলে, বাবাও রাগ করে। অতএব ওরাই প্রিয় আমার। তাছাড়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে শয়তানি করার মধ্যে এক ধরনের রোমাঞ্চ আছে। তারা আমাকে লুকিয়ে সিগারেট খেতে শিখিয়েছে, মেয়েদের রহস্যের দিকে তির্যক দৃষ্টি হানতে শিখিয়েছে। এদের মধ্যে সব থেকে পাকা ছেলে জিতু, জিতেন পোদ্দার। বয়সে আমার থেকে বছর তিনেকের বড় হবে, গায়ে শক্তিও রাখে তেমনি! বছর দুই ফেল করে আমার সহপাঠী হয়েছে। স্কুলের মার্কামারা ছেলে হয়ে উঠেছিল সে এরই মধ্যে। মিশনারি স্কুল, তাই ফিরিঙ্গী রেক্টর সাহস করে ওকে স্কুল থেকে তাড়াতে পেরেছে। এখন তার পাড়ার স্কুলে ভর্তি হয়ে আরো মাতব্বর হয়ে উঠেছে। আমাদের খুদে দলের লিডার সে-ই।

আমার সঙ্গে খাতির—কারণ আমি ওকে সিনেমা দেখা, সিগারেট আর চপ কাটলেট খাওয়ার খরচ জুগিয়ে থাকি মাঝে মাঝে। কোনো একটা দরকারের অজুহাতে টাকা চাইলেই মাসি দেয়। আমার ধারণা, ধারণা কেন, আমি ঠিক জানি, মা তার হাতে আমার জন্যেই

টাকা দেয়। আমার স্কুল-বই-খাতা-জামাকাপড় ইত্যাদির যাবতীয় খরচ এখনো নিশ্চয় মা দেয় বলে বিশ্বাস।

সেই জিতু পোদ্দার হঠাৎ সকলের সামনে এক চোখ বুজে আমাকে ডাকল, এই শোন—

কাছে যেতে জিজ্ঞাসা করল, তোর মা এখন কার সঙ্গে থাকে রে ?

শোনামাত্র আমার মাথার মধ্যে কি-যে হয়ে গেল, কে জানে। আমি পাগলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লাম ওর ওপর, সঙ্গে সঙ্গে ঘুষি-চড়-লাথি।

আচম্কা আক্রান্ত হয়ে ও হক-চকিয়ে গেছল। কিন্তু এমন মান্যগণ্য লিডার, স্তাবকদের সামনে এ-অপমান হজম করার পাত্র নয় সে। ওর বাবা পর্যন্ত এখন এ-ভাবে গায়ে হাত তুলতে সাহস করে না। সামলে নিয়েই এক ঘুষিতে আমাকে চিৎপাত করে ফেলল।

তারপর....

তারপর আমার মুখ আর মাথা মাটিতে থেঁতলে দিতে লাগল। আমার চোখে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে, কিন্তু হিংস্র জানোয়ারের মতো ও আমাকে একধারে শেষ না করে ক্ষান্ত হবে না বুঝি। আমার নাক-মুখ রক্তে ভাসছে।

কোন রকমে টলতে টলতে বাড়ি ফিরলাম যখন, আমাকে দেখে মাসি আর্তনাদ করে উঠল। তারপর আর আমার কিছু মনে নেই।

জ্ঞান হতে দেখি, ডাক্তার আমার মাথায় আর কপালে ব্যাণ্ডেজ বাঁধছে। পাজি ছেলের সঙ্গে মারামারি করে এই দশা হয়েছে আমার সেটা বাবা নিজেই বুঝে নিয়েছে হয়তো। দাঁত কড়মড় করে বলে উঠেছে, শিক্ষা হয়েছে তো ? বেশ হয়েছে, আর মিশতে যাবি ওই সব ছেলের সঙ্গে ?

পারলে বাবা আমাকে ধরে আর একপ্রস্থ লাগায়।

জিতুর সঙ্গে মারামারির কারণটা মাসিকে বলেছি। জানি, মাসিকে বললেই মায়ের কানে যাবে। আমার সর্বব্যাপার সে মা-কে বলে থাকে। আমি চাই, মা-ও শুনুক। দিন কতক বাদে যখন মায়ের

সঙ্গে দেখা, তখনো আমার মাথায় আর কপালের দু'-তিন জায়গায় পট্টি। মা আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক। কি হয়েছে বা কেন হয়েছে, একটি কথাও জিজ্ঞাসা করল না বলেই ভিতরে ভিতরে এক ধরনের নিষ্ঠুর আনন্দ আমার। মাসি বলেছে, কেন কি হয়েছে সবই বলেছে।...ও ক্ষত সারাবার জন্য পরে মস্ত সার্জন এসেছে, মাথার এক্সরে করা হয়েছে। এ-সব কার তাগিদে আর কার টাকায় হয়েছে, তাও আমি এখন বুঝতে পারছি।

মা শুধু বলেছে, তুই ও-সব ছেলের সঙ্গে মিশিস কেন?

এটুকুর মধ্যেই আমার জন্য তার উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা প্রকাশ পেয়েছে। তাইতেও ক্রুর আনন্দ আমার, অঘটন এর থেকে বেশি হলেও অখুশি হতাম না বোধ হয়। ভালো মুখ করে বলেছি, কেন, জিতু তো বেশ ভালো ছেলে, যেমন সাহস তেমনি গায়ের জোর— আমারই খামোখা বিচ্ছিরি রাগ হয়ে গেল বলে ও-রকম হল।

মা চুপ। আর একটি কথাও বলে নি। মুখের দিকে চেয়ে আমার ভিতরের বয়সটা যে অনেক এগিয়ে গেছে, তাই যেন অনুভব করেছে।

ওই তেরো বছর বয়সেই বুকের তলায় আবার একটা আকস্মিক ক্ষত সৃষ্টি হল। আমি যদি ডাক ছেড়ে কাঁদতে পারতাম, মাটিতে মাথা ঠুকতে পারতাম, তাহলে আবার হয়তো স্বাভাবিক হয়ে ওঠা সহজ হত। আমার খণ্ডিত সত্তা, যে ওই সাত বছর বয়সের মধ্যে আটকে আছে, সে তাই করছে। কিন্তু আমি তা পারি না। সেইজন্যেই আমার ক্ষোভের শেষ নেই, দুর্ভোগের অন্ত নেই।

মালতী মাসি চলে গেছে। আমি দ্বিতীয় বার মা হারিয়েছি।

কিছুদিন ধরেই খুব গম্ভীর দেখছিলাম তাকে। বেশ বিমনাও। মাঝে মাঝে আমার দিকে কি-ভাবে যেন চেয়ে থাকত। দুটো চোখের করুণ তৃষ্ণা আমার শরীরটাকে যেন ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেত। রাতে ঘুম পাড়াতে এসে গল্প করে না। আমি ঘুমিয়ে পড়েছি মনে হলে খুব আলতো করে আমাকে বুকে চেপে রাখে, যাতে আমার ঘুম না ভাঙে।

মাসি একদিন বলল, হ্যাঁ রে, যদি আমি আর না থাকি, তোর খুব কষ্ট হবে?

আমি ফিরে জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় যাবে?

যদি যাই কোথাও। ধর, যদি মরেই যাই—

সে তো আমিও না থাকতে পারি, আমিও মরে যেতে পারি।

বালাই ষাট্। মাসি হু'হাতে আঁকড়ে ধরল আমাকে। আমি বাধা দিলাম না। সেটাই যেন তার সুখের ব্যাপার কিছু।

জিজ্ঞেস করলাম, তুমি ও-কথা বললে কেন?

এমনি।

এমনি কক্ষনো না, কি হয়েছে তোমার, বলো? তুমি হঠাৎ ভয়ানক বদলে গেছ।

খানিক চুপ করে থেকে বলল, মনটা একটু খারাপ রে, তোর নতুন মা আসছে, তোর জন্যই ভাবনা হয়।

আমি হতভম্ব খানিকক্ষণ। কথাটা বোঝার মত বয়স বা বুদ্ধি হয়েছে। নতুন মা আসছে মানে বাবা আবার বিয়ে করছে। নাড়াচাড়া খাবার মতই খবর বটে একটা। কিন্তু তার জন্য মাসির এত ভাবনাচিন্তার কারণ কি, সেটাই আমার কাছে স্পষ্ট নয় খুব। অথচ এখন যেন মনে হচ্ছে, দিন কতক ধরে মাসির সঙ্গে বাবার বাক্যালাপও বন্ধ।

বললাম, তাতে তোমার কি, আর আমার জন্যে তোমার ভাবনাই বা হবে কেন?

মাসি জবাব দিল, তোর নতুন মা এসে আমাকে এ-বাড়িতে নাও থাকতে দিতে পারে।

আমার হাসি পেল, মাসি আমাকে কি ছেলেমানুষই ভাবে। বললাম, নতুন মা তাড়াবার কে, আমরা বাবার খাই, না পরি, না বাবার বাড়িতে থাকি?

মাসি সচকিত হঠাৎ। এ-সব কথা তোকে কে বললে?

কে আবার বলবে। তুমিই কত সময়ে গল্প করেছ। মায়ের

টাকা ভেঙে বাবার ব্যবসা, বাড়িও মায়ের, আর তোমার হাতে মা যে মাসে মাসে টাকা দেয়, সেও আমি খুব ভালোই বুঝি।

মাসি হাঁসফাঁস করে উঠল, কক্ষনো আমি তোর কাছে এ-সব গল্প করি নি।

কিছু কিছু করেছ, আর কিছুদিন আগে বাবাকে তুমি এই সব বলে শাসাচ্ছিলে, আমি নিজের কানে শুনেছি। বাবা তখন মদ খাচ্ছিল—

মাসি চুপ একেবারে।

আমি তাকে আশ্বস্ত করার জন্য বললাম, যেই আসুক, তোমার কোনো ভাবনা নেই, কোন রকম অসুবিধে হলে তুমি মা-কে জানাবে, ব্যবস্থা যা করার মা-ই করবে।

না রে না, মাসি হঠাৎ বিকারের রোগীর মতো আমাকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরে বলে উঠল, তোর মাকেও আর আমি মুখ দেখাতে পারব না। সব আমার পাপের ফল। সব আমার লোভের ফল। তোদের কত ক্ষতি আমি করেছি তোরা জানিস না, তোরা কিছু জানিস না!

আমি বিস্ময়ে বোবা খানিকক্ষণ। মাসি কাঁদছে, টের পাচ্ছি। উঠে আলো জ্বেলে তার মুখখানা দেখতে ইচ্ছে করছে।

বহুক্ষণ বাদে আমি ঘুমিয়েছি মনে করে মাসি আস্তে আস্তে উঠে চলে গেল। এই প্রথম আমার মনে হল, শুধু এই একটা রাতের জন্য মাসি মায়ের জায়গা নিলে, মায়ের জায়গায় ঘুমিয়ে থাকলে, আমার তেমন খারাপ লাগত না। কিন্তু আমি তাকে ডাকতে পারি নি।

আজও বহুক্ষণ জেগে ছটফট করেছি। মাসি কি বলে গেল, বুঝতে চেষ্টা করেছি। যে সব ছেলেদের সঙ্গে আমি মিশি তাদের সঙ্গগুণে বাবার সঙ্গে মাসির মাঝের ক'টা বছর খাতিরের অর্থটা এখন আর একটু স্পষ্ট আমার কাছে। কিন্তু সে তো আমার মা-ও জানে, সেই প্রথমবারের দেখায় রাগের ঝোঁকে আমি ফাঁস করে দিয়েছিলাম। কিন্তু মা তো তার পরেও আমার যাবতীয় ব্যাপারে তাকেই বিশ্বাস করেছে, তার ওপরেই আমার সমস্ত ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে চেষ্টা করছে।...

তাহলে মাসি মা-কেও আর মুখ দেখাতে পারবে না, বলছে কেন? কোন্ পাপ আর কোন্ লোভের ফল বলছিল মাসি? আমার বা মায়ের এখনো কি জানতে বাকি!

দূরে কোথা থেকে একটা শানাইয়ের শব্দ ভেসে এলো কানে। আমি চমকে উঠলাম। ...স্কুল থেকে এসে পর্যন্ত বাবাকে দেখি নি। রাতেও দেখি নি। সন্ধ্যার পর বাবা তো বাইরে থাকে না বড়। নিজের ঘরে বসে মদ খায়।...আজ কোনো বিয়ের দিন নাকি?

উঠলাম। ঘরের আলো জ্বাললাম। বাবার আর আমার ঘরের মাঝের দরজা আবার আমিই বন্ধ রাখতুম। সেটা খুললাম। বাবার ঘর অন্ধকার। ভিতরে ঢুকে সুইচ টিপলাম।

ঘরে কেউ নেই।

কত রাতে ঘুমিয়েছিলাম, জানি না। সকালে উঠে মালতী মাসিকে কোথাও দেখলাম না। আমার বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। একটা চাকরকে জিজ্ঞেস করতে সে জানালো, খুব ভোরে উঠে মালতী মাসি ট্যাক্সি ডাকিয়ে কোথায় চলে গেছে। সঙ্গে তার স্যুটকেস আর ছোট একটা বিছানা ছিল।

একদিন স্কুল থেকে ফিরে এসে মা-কে দেখি নি। আজ ঘুম ভেঙে উঠে মালতী মাসিকে দেখলাম না।

আমার খণ্ডিত সত্তার সাত বছরের দিকটা ডুকরে কেঁদে উঠতে চাইল। আর তের বছরের আমি সুমন সরকার তার টুঁটি চেপে ধরলাম।

মায়ের টেলিফোন নম্বর আমার জানা ছিল। কিন্তু এতদিনের মধ্যে সেধে কখনো ফোন করি নি। আজ এই প্রথম একটু বেলা হতে মাকে টেলিফোনে ডাকলাম।

আমি সুমন। মাসি খুব ভোরে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে।

সে কি রে! মায়ের গলার স্বরেই বোঝা গেল, মাসি তাকেও গোপন করেই গেছে, কোথায় গেল?

জানি না। কাল রাতে আমাকে বলেছিল, তোর নতুন মা আসছে।

বাবা কাল থেকে বাড়ি নেই, আজ নতুন মাকে নিয়েই বাড়ি ফিরবে বোধ হয়।

ও-দিকের সাড়াশব্দ নেই, অর্থাৎ মা স্তব্ধ।

খানিকক্ষণ বাদে গলা শোনা গেল, গাড়ি পাঠাচ্ছি, তুই আয় একবার।

না।

টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে রাখলাম।

মালতী মাসির গত রাতের স্পর্শটা আমাকে ছেঁকে ধরে আছে, আর তার কান্না-ভরাট কথাগুলো কানে লেগে আছে। আমি শুধু ভাবছি আর ভাবছি, ভাবছি। ভিতরের যে অবুঝটা অব্যক্ত যাতনায় ছটফট করছে, তাকে আমল দিচ্ছি না। শুধু ভাবছি, মাসি কোন্ পাপ আর কোন্ লাভের কথা বলল গত রাতে?

কোনো হদিস মেলে নি। পরে পরিণত বয়সে একটা সম্ভাব্য সমাধান আমার মাথায় এসেছে। সেটাই সত্য বলে বিশ্বাস।

মায়ের সঙ্গে ছাড়াছাড়ির আগে বাবার সন্দেহ আর ঈর্ষা রোগের আকার নিয়েছিল। মা বাইরে শুটিং-এ গেলে মাসি সঙ্গে থাকত, ষ্টুডিওতেও যেত মাঝে মাঝে মায়ের সঙ্গে। মনে হয়, বাবার ওই সন্দেহ আর ঈর্ষা রোগের রসদ মাসিই জুগিয়েছে।

কিন্তু আশ্চর্য, ধারণাটা সত্যি হলেও মালতী মাসির ওপর আমার এতটুকু রাগ নেই, ক্ষোভ নেই। বরং অফুরন্ত মায়া তার ওপর।.... যেখানেই থাকুক, যদি থাকে আজও তার বুকের যন্ত্রণা জুড়োক।

বলা বাহুল্য, শুরু থেকেই নতুন মা-টিকে আমি একটুও সুনজরে দেখি নি। এ-বাড়িতে তার প্রথম পদার্পণের রাতেই তাকে তেরো বছরের ছেলের বিদ্রোহ মূর্তি দেখতে হয়েছিল। সেই ছেলের ভিতরের বয়স কত, সে জানবে কি করে?

বিদ্রোহের ফলও বাবা হাতে হাতেই দিয়েছিল। কিন্তু সে আমার গায়ের ধুলো।

সন্ধ্যার ঠিক পরেই নতুন মানুষ সঙ্গে নিয়ে বাবা বাড়ি ফিরেছে। দোতলা থেকে দেখে আমি নিজের ঘরে ঢুকে গেছি।

একটু বাদে হাসি-হাসি মুখে বাবা ঘরে ঢুকল। পিছনে সেই একজন। আমার পড়ায় অখণ্ড মনোযোগ। বাবার গলার এমন মোলায়েম স্বর আর শুনি নি, বলল, সুমন, দেখ্‌ কে এসেছে—তোর নতুন মা।

বই থেকে মুখ তুলে আমি ফিরে তাকালাম। নতুন মায়ের, সঙ্গে চোখাচোখি হল। হাসি-মাখা বেশ সুন্দর মুখখানা। কিন্তু ও-সব দেখার চোখ নয় আমার তখন। অবশ্য কি দেখছি, তাও জানি না।

তুমি ওর সঙ্গে কথা বলো। বাবা ঘর ছেড়ে চলে গেল।

নতুন মা হাসি-হাসি মুখে আমার দিকে এগিয়ে এলো। চেয়ার ঘেঁষে দাঁড়াল। একটা সুঘ্রাণ নাকে এলো আমার। গলায় মোটা ফুলের মালা আর সেণ্টের মিষ্টি গন্ধের মিশেল।

তুমি সুমন?

আমি সামান্য মাথা নাড়লাম কি নাড়লাম না। দেখছি।·· বছর ছাব্বিশ সাতাশের বেশি বয়স হবে না, মায়ের এখন বত্রিশ। মায়ের থেকে স্বাস্থ্যও খারাপ। মায়ের থেকে ফর্সা আর বেশ সুশ্রীও, কিন্তু মায়ের মতো মিষ্টি মুখ নয়, চোখ তো নয়ই।

হঠাৎ নিজের ওপরেই কেমন রাগ হয়ে গেল আমার। একে দেখামাত্র মায়ের সঙ্গে তুলনা কেন?

তুমি আমাকে দেখে একটুও খুশি হও নি তো?

জবাব না দিয়ে আমি বইয়ের দিকে চোখ ফেরালাম। নতুন মা আরো একটু কাছে এলো! হাত বাড়িয়ে বইটা তুলে নিল, দেখল কি বই, তারপর আবার সেটা সামনে রাখল।

আমাদের সময় অ্যালজেব্রা পড়তে হত না, খাতায় কষতে হত, তোমাদের বুঝি মন দিয়ে অ্যালজেব্রা পড়তে হয়?

আমি আবার ফিরে তাকালাম। বললাম, পড়তে হয় না, আসলে আমার এখন তোমার সঙ্গে গল্প করার ইচ্ছে নেই।

দু'চোখ আমার মুখের ওপর থমকে রইল একটু। তারপর আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে চলে গেল। তার দোষ নেই, সে আমাকে তের বছরের একটা ছেলেই ভেবেছিল শুধু।

মালতী মাসি নেই, মালতী মাসি আর এ-বাড়িতে কোনদিন আসবে না, আমার রাতে ঘুমুবার সময় আর কোনদিন পাশে থাকবে না—ভিতরের এই ক্ষুব্ধ যন্ত্রণাটা নতুন করে আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল।

বাবা মনের আনন্দে নতুন মা-কে বাড়ি-ঘর দেখাচ্ছে। নীচের তলায় ঘুরে এলো, দোতলার সব ক'টা ঘরে চক্কর খেলো, ছাতেও ঘুরে এলো নতুন মা-কে নিয়ে। তারপর নিজের ঘরে ঢুকল। ঘণ্টা দুই কাটল সবসুদ্ধু।

কিন্তু এর মধ্যে বাবা একবারও মালতী মাসির খোঁজ করল না। বিয়ে করে বাবার কি এত আনন্দ হয়েছে যে মালতী মাসি বাড়ি নেই তা খেয়ালও করল না! এত বছর ধরে, মা যাবার আগের থেকেও এ-বাড়ির কর্তৃত্ব বলতে গেলে মালতী মাসির হাতে, সে বাড়ি নেই, বাবার চোখেও পড়ল না এতক্ষণে?

আমার মন বলছে, তা হতে পারে না। আমার মন বলছে, বাবা খুব ভালো করে জানে মাসি নেই, মাসি আর আসবে না। কি করে জানল? ....তাহলে বাবাই কি তাড়িয়েছে মাসিকে? বিয়ে করতে যাবার আগে বলে গেছে, ফিরে এসে যেন এ-বাড়িতে তোমাকে আর না দেখি?

সেটা সম্ভব কি অসম্ভব জানি না। আমার মাথায় আগুন জ্বলছে। সামনের আবছা অন্ধকার বারান্দায় এসে পায়চারি করতে লাগলাম—বাবার ঘরের দোর পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে আসছি। উদ্দেশ্য, বাবার চোখে পড়ুক।

পড়ল। ডাকল, সুমন এ-দিকে আয়—

ঘরে ঢুকলাম। নতুন মা খাটের একদিকে বসে। আমার দিকে তাকালো কিন্তু কাছে ডাকতে সাহস করল না।

নতুন মায়ের সঙ্গে ভাব হয়েছে তো? তোকে খুব ভালোবাসবে, দেখিস—

সে-কথায় কান না দিয়ে সোজা বাবার দিকে তাকিয়ে আমি বললাম, মালতী মাসি খুব ভোরে বাড়ি থেকে চলে গেছে, আর ফেরে নি—ট্যাক্সিতে তার বাক্স আর বিছানাও নিয়ে গেছে।

নতুন মা ঈষৎ বিস্ময়ে বাবার দিকে তাকিয়েছে। বাবার মুখখানা দেখার মতো তখন। গম্ভীর কিন্তু ভিতরে-ভিতরে যেন ধড়ফড় করছে।

ঠিক আছে, খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ো গে।

বেরিয়ে এসে নিজের ঘরের সামনে বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়ালাম। মাথার মধ্যে তখনো কত আগুন জ্বলছে আমার, কেউ কল্পনা করতে পারবে না। একটু বাদে আবছা অন্ধকার বারান্দায় ছায়া পড়ল। নতুন মা পায়ে পায়ে আমার দিকেই এগিয়ে আসছে। আমার পাশ ঘেঁষে দাঁড়াল। অস্ফুট মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করল, মাসি চলে গেছে বলে তোমার খুব মন খারাপ বুঝি?

আমি জবাব দিলাম না। সুযোগের প্রতীক্ষায় আছি। বাবার সামনে যেটুকু বলে এসেছি, তা যেন কিছুই নয়। সকলের সুখ-শান্তি তছনছ করে দেবার মতো ভিতরটা গনগন করেছে আমার।

তেমনি মৃদুস্বরে নতুন মা আবার জিজ্ঞাসা করল, মালতী মাসি কে? তোমার নিজের মাসি?

যে সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম সেটাই যেন এগিয়ে এসেছে। সাত বছরের বয়সে না বুঝে শুধু ক্ষোভের মুখে মা-কে যেকথা বলেছিলাম, তেরো বছর বয়সে নতুন মা-কে অনেকখানি বুঝেই সেই কথা বলে দিলাম।···তেরো বছর বয়সটা ও বড় করে দেখবে না, অবোধ ছেলে-মানুষই ভাববে, কিন্তু ধাক্কাটা যেখানে লাগার ঠিক গিয়ে লাগবে।

না, মায়ের বন্ধু। আমার জন্মের আগে থেকে এ-বাড়িতে থাকত। মা চলে যাবার পর বাবার সঙ্গে খুব ভাব হয়েছিল কিন্তু তুমি আসবে বলে এখন বাবাই বোধ হয় মাসিকে তাড়িয়েছে বাড়ি থেকে।

হঠাৎ হ্যাঁচকা টানে কে আমাকে টেনে নিল পিছন থেকে। নতুন মা-ও চমকে ঘুরে দাঁড়াল। বাবা। ঘাড় ধরে আমাকে ঘরের মধ্যে এত জোরে ঠেলে দিল যে মুখ থুবড়ে পড়তে পড়তে বেঁচে গেলাম।

কিন্তু এ-অপমান গায়ে একটুও লাগল না আমার। সকাল থেকে আমার মাথার মধ্যে যে শয়তান দাপাদাপি করছিল, এতক্ষণে সে বুঝি একটু ঠাণ্ডা হয়েছে।

দিন তিনেকের মধ্যে আর এক ব্যাপারের সূত্রপাত। সে আমার কাছে এক উপভোগ্য প্রহসন। সকালে মস্ত ঝক্‌ঝকে গাড়ি হাঁকিয়ে এক অপরিচিত ভদ্রলোক বাড়িতে হাজির। আমি তখন নিচের বসার ঘরেই ছিলাম।

ভদ্রলোক এসে বাবার খোঁজে করল, বাবা আছে শুনে একটা কার্ড আমার হাতে দিয়ে তাকে খবর দিতে বলল। আমি পা বাড়াবার আগেই জিজ্ঞাসা করল, তুমি সুমন সরকার?

আমি মাথা নাড়লাম।

ঠিক আছে, বাবাকে খবর দাও।

যেতে যেতে কার্ডটা উল্টে দেখলাম, নামের নিচে লেখা আছে, 'অ্যাটর্নি'। একটু বাদে কার্ড হাতে বাবা অবাক মুখে নিচে নেমে এলো। আমারও হঠাৎ কৌতুক হল কেমন···ভদ্রলোক আমাব নাম জানল কি করে! আমিও বসার ঘরের পিছনে এসে দাঁড়ালাম।

তারপর উৎকর্ণ হয়ে ভদ্রলোকের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শুনলাম।···সে বিপাশা দেবীর অ্যাটর্নি, এই বাড়ির যাবতীয় স্বত্ব বিপাশা দেবী আগামী কাল নাবালক সুমন সরকারের নামে দান-পত্র করে দিচ্ছেন। যতদিন না সুমন সরকার সাবালক হচ্ছে, ততোদিন সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব বিপাশা দেবীর নিজের হাতেই রাখছেন।

এ-সব আমাকে বলার কারণ? বাবার গম্ভীর গলা।

অমায়িক সুরে ভদ্রলোক জবাব দিল, বিপাশা দেবী আপনাকে খবরটা জানিয়ে রাখতে বলেছেন, তাই।

আচ্ছা, ঠিক আছে।

বাবা ঘর থেকে বেরুবার আগেই আমি ছুটে ওপরে চলে এলাম। বেশ উত্তেজনা বোধ করছি। খবরটা কোনো ফিকিরে নতুন মা-কে

জানিয়ে দিতে পারলে বেশ হত। নতুন মা আবার তখন আমার ঘরে দাঁড়িয়েই সাগ্রহে দেয়ালে টাঙানো মায়ের ছবি দেখছে। তার এ আগ্রহ এরই মধ্যে আরো অনেকবার লক্ষ্য করেছি। আর তার মুখ দেখে আমি কল্পনা করে নিয়েছি, বাবার ওপর ভিতরে ভিতরে অন্তত এই নতুন মা সদয় নয়, সদয় হতে পারে না।

পরদিন বাড়ি আমার নামে রেজেস্ট্রি হবার কথা। হয়েছে নিশ্চয়। তার পরদিন আমি এলাম মায়ের কাছে। মা ডাকে নি, নিজে থেকে এসেছি। মায়ের দুর্বলতা আমার জানা হয়ে গেছে, সেটাই আমার মস্ত জোর—বাড়ি আমার নামে লিখে দিয়েছে বলেই আমি তাকে রেহাই দেব! অমন শর্মা সুমন সরকার নয়।

আমাকে দেখে মা খুশি আবার উতলাও একটু। মুখের দিকে চেয়ে মায়ের ভিতরটা আজকাল অনেক বেশি দেখতে পাই আমি।

কার সঙ্গে এলি, একলা নাকি?

মাথা নাড়লাম, তাই।

বাসে এলি?

ট্রামে।

একা এভাবে ট্রামে-বাসে আসবি না, যখন আসতে ইচ্ছে হবে, ফোন করে দিবি, গাড়ি যাবে। আর এরকম হঠাৎ আসতে ইচ্ছে হলে ট্যাক্সি নিবি।

ট্যাক্সির পয়সা পাব কোথায়?

মা থমকালো একটু। মালতী মাসি নেই, নতুন করে মনে পড়ল বোধহয়। বলল, বাজে খরচ করবি না কথা দিলে তোর হাতে আমি কিছু টাকা দিয়ে রাখতে পারি।

ঠোঁট উল্টে জবাব দিলাম, তোমার টাকা নিতে যাচ্ছে কে।

রাগত মুখে মা বলল, বেইমান কোথাকারের!

এতকাল ধরে যে মাসির মারফত আমার সব খরচ সে-ই চালিয়ে আসছিল, সে-কথা মুখে বললে না। একটু বাদে জিজ্ঞাসা করল, বাড়ির খবর কি?

ভালই তো।

নতুন মা কেমন?

খুব চমৎকার। হঠাৎ দশগুণ বাড়িয়ে বলার ঝোঁক চাপল কেন, জানি না।—আর পরীর মতো দেখতে একেবারে।

আমাব ধারণা—নতুন মায়ের সঙ্গে কোনকালেও দেখা হবে না। এই নির্জলা উচ্ছ্বাসের মধ্যেও মায়ের চোখে যেন কিছু গলদ ধরা পড়ল। সন্দিগ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করল, চমৎকার বুঝলি কি করে, তোকে আদর-যত্ন করে?

করতে আসে। আমি পাত্তা দিই না।

মা আবার খানিক চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করল, মাসি নেই, সময় মতো-চান-খাওয়া-দাওযা সব করিস তো?

জবাব দেওয়াব দরকার বোধ করলাম না। মাসি না থাকার ক্ষতটা বুকের তলায় এখনো দগদগ করছে।

একটু ভেবে মা বলল, তোকে যদি খুব ভালো কোনো হস্টেলে রেখে দিই, থাকবি?

কেন?

কেন আবার কি, ভালো হয়ে থাকবি, পড়াশুনা করবি।

আমাকে হস্টেলে রেখে বাবাকে ওই বাড়ি থেকে তাড়াবে?

মা সত্যিই অবাক।—তাড়াব কেন?

তাহলে বাড়ি আমার নামে দানপত্র করলে? বাবা এমন কি দোষ করেছে, তাকে ছেড়ে এসে তুমি দু'-দু'বার বিয়ে করলে, বাবা তো শুধু একবার করেছে—

মনে হল, মা এই বুঝি আমার গালে ঠাস করে চড় বসিয়ে দিল একটা। তা করল না, ঠাণ্ডা চোখ দুটো আমার মুখের ওপর চক্কর খেল এক প্রস্থ। তার তের বছরের ছেলে অকালে কত পেকেছে, তাই যেন নতুন করে অনুভব করল। তারপর গম্ভীর মুখে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

একটু বাদে আবার ফিরবে জানি। ঝি বা চাকরের হাতে থালা

ভর্তি খাবার থাকবে। আমি সামনে বসে খেলে মা খুশি হয়, নির্নিমেষে দেখে চেয়ে চেয়ে।

আজ সে-সুযোগ দিলাম না। উঠে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলাম গেট পার হয়ে, ফিরে তাকালাম একবার। ঠিকই অনুমান করেছি, বারান্দার রেলিং-এ দাঁড়িয়ে—আমার দিকেই চেয়ে আছে। গম্ভীর কিন্তু অসহায় মুখ। ভেবেছিলাম, ডাকবে।

ডাকল না।

* * *

ঘৃণা, বিদ্বেষ বা প্রতিশোধের নেশা আসলে বোধ হয় নিজেরই অগোচরের উন্মাদ দশা কিছু। নইলে বুকের তলায় ওই আগুন জ্বেলে বসলে সর্বক্ষণ নিজেকেই দগ্ধায় কেন? প্রতিহিংসার অন্তর্দৃষ্টি নেই! নখদন্ত মেলে সে ঝাঁপিয়ে পড়ার ছল খোঁজে আর তারপর অন্ধ আক্রোশে নিজেকেই ছিন্নভিন্ন করে। তোমার ঘৃণা, তোমার বিদ্বেষ, তোমার হিংসার শিকার তুমি নিজেই।

এখন বয়স আমার একুশ। চোদ্দ বছর ধরে বিয়োগান্ত নাটকের নায়কের মতই একটা আত্মহননের অমোঘ নেশা আমাকে পেয়ে বসেছে, সেটা মাঝে মাঝে অনুভব করলেও তার থেকে অব্যাহতি নেই।

বাইরে আমি ঠিক তেমনিই আছি, কিন্তু ভিতরটা আরো অনেক গুণ উগ্র আর অশান্ত। একই বাড়িতে বাবা আর আমি দু'টি বিভিন্ন প্রবাসী প্রাণী বাস করছি যেন। সামনাসামনি পড়ে গেলেও একজন আর একজনের পাশ কাটিয়ে চলা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। আরো চার-পাঁচ বছর আগে থেকেই বাবা অনুভব করেছে, আমি তার শাসনের আওতার বাইরে চলে গেছি। আর আমার দিক থেকে বাবার সঙ্গে সম্পর্ক শুধু টাকার। সঙ্গী-সাথীর কল্যাণে টাকার চাহিদা আমার কম নয়। নিঃশব্দে তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে হলে টাকার জোরটা একটা বড় জোর। দরকার হলেই নতুন মাকে জানিয়ে দিই; অত টাকা চাই। নতুন মা ভিতরে ভিতরে শঙ্কা বোধ করলেও মুখে কিছু বলে না। এনে দেয়। টাকা দিতে বাবার অসুবিধে হবার কথা

নয়, কারণ তার ব্যবসা পুরোদমে চলছে। এখন নতুন মায়ের জন্তেও আলাদা একটা গাড়ি কিনে দিয়েছে। কিন্তু ছেলের হুকুম মতো বাবার টাকা বার করে দিতে একটু আপত্তি বোধ হয়। মা আমার জন্ম টাকা চাইতে গেলে তার চাপা তর্জন গর্জন একটু আঁধটু কানে আসে। কিন্তু আমাকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে না বা ঘাঁটায় না কখনো। টাকা দিয়ে দেয়। কারণ আমার টাকা চাওয়ার মধ্যে প্রচ্ছন্ন জোরের দিকটা বাবা অনুভব করে বোধ হয়।

নতুন মা আমার জীবনে কোনো সমস্যা নয়। আমার কাছে অনেকখানি নিষ্প্রভ অস্তিত্ব তার। নতুন মা আমাকে ভালবাসে কিনা জানি না, কারণ ভালবাসার তেমন সুযোগ তাকে কখনো দিই নি। সে আমাকে সমীহ করে, আমি কার ছেলে, সেটা ভোলে না কখনো। এখনো আমার মায়ের মস্ত অনুরাগিণী ভক্ত এই নতুন মা-টি। সুযোগ সুবিধে পেলেই মায়ের সঙ্গে গিয়ে দেখা করে, আর যেতে আসতে মায়ের পায়ে টিপ টিপ প্রণাম করে।···না, মালতী মাসিকে সরিয়ে সে এ-সংসারে এসেছে বলে আমার মনে কোনো ক্ষোভ নেই। সঙ্গতভাবে চিন্তা করলে বরং মায়া হবার কথা।·· নিতান্ত গরিব ঘরের বি-এ পাশ মেয়ে, তার বাপ বাবার কারখানায় সাধারণ চাকরি করত একটা। বাবার শ্বশুর হয়ে বসার পর থেকে অবশ্য কিছুটা অসাধারণ হয়েছে। ঘোড়া-রোগ ছিল ভদ্রলোকের, মাইনের টাকার অর্ধেকের বেশি রেসের মাঠে যেত, ফলে ধার-দেনায় মাথা বিকিয়েছিল। তার স্ত্রী চিঠি লিখে বাবাকে অনুরোধ করেছিল, মাইনের টাকা যেন স্বামীর হাতে না দেওয়া হয়। মাস-কাবারে এই নতুন মাকে পাঠিয়ে দিত বাপের মাইনের টাকা আনতে। আমার বাবার সামনে বাপ সই করত আর মেয়ে টাকা নিত। মাত্র মাস কয়েকের ওই যোগাযোগের পরেই বাবা ওই মেয়েকে ঘরে নিয়ে এসেছে। নতুন মায়ের বাপের বাড়ির মানুষেরা সেই জন্ম আমার বাবার প্রতি কৃতজ্ঞ। মনে হয়, অবস্থার দিক বিবেচনা করলে নতুন মা-ও অকৃতজ্ঞ নয়। কিন্তু কৃতজ্ঞতা আর প্রেমপ্রীতি ভিন্ন জিনিস। বাবাকে কোনো মেয়ের মনে ধরছে

পারে, এ আমার বিশ্বাস হয় না। আমার মায়ের প্রতি নতুন মায়ের আকর্ষণটা বরং ঢের খাঁটি মনে হয়। আর মাও তাকে কিছুটা স্নেহ আর বিশ্বাস করতে পেরে খুশি। কারণ, আজও তার দায় আমি। আমাকে কেন্দ্র করেই তাদের মধ্যে একটা হৃদ্যতা গড়ে উঠেছে। আমার ব্যাপারে মা আগে মালতী মাসির ওপর নির্ভর করত, এখন নির্ভর করছে নতুন মায়ের ওপর। নির্ভর আর বিশ্বাস করতে যে পেরেছে, এ-টুকুই নতুন মায়ের সত্যিকারের গুণ বলতে হবে। এ-দিকে তার সচলতা প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই।

কিন্তু আমি বিচ্ছিন্ন সকলের কাছ থেকে। আমার খণ্ডিত সত্তা অশান্ত ক্ষোভে আজও ঠিক তেমনি করেই মাথা খুঁড়ে মরছে।

মা আবার একটা আলাদা বাড়ি করেছে। নিজস্ব বাড়ি। তার জীবনের তৃতীয় ভদ্রলোকটিকেও সরে যেতে হয়েছে। মা আমার বাবাকে বরদাস্ত করতে পারে নি, জানি। অপর দু'জনকে পারল না কেন, জানা নেই। মায়ের নিজের একান্ত রুচিবোধের ওপর আমার শ্রদ্ধা আছে, মনে হয়, অন্য সকলের ক্ষেত্রে সেটাই শেষ পর্যন্ত অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই চল্লিশ বছর বয়সেও মায়ের অভিনয় জীবনের জৌলুসে টান ধরে নি, ওই জগতে এখনো অনন্যা সে। কিন্তু ব্যক্তি জীবনে তার আর কোনো আগন্তুক আসবে বলে মনে হয় না। নতুন বাড়ি করার পর আমাকে অনেকবার অনুরোধ করেছে, এখানে চলে আয় না, তোতে আমাতে থাকি।

একদিন আমি হাসি-মুখে জবাব দিয়েছিলাম, অনেক দেরি করে ফেলেছ মা, অনেক দেরীতে ডাকলে। তোমাকে একটা মরা ছেলের মা হিসেবে দেখতেই আমার বেশি ভালো লাগে।

তারপর আর এই অনুরোধ করে নি।

গোটা তিনেক আয়া আর ঝি, আধ-বয়সী একটা চাকর, আর গেটে প্রহরারত একটা দারোয়ান নিয়ে মা তার নতুন বাড়িতে একলা

থাকে এখন। না, একলা বলছি কেন, যশোদাও তো সেই থেকে মায়ের সঙ্গে থাকে।

আমার সতের বছর বয়স থেকে মায়ের কাছে যশোদাকে দেখছি। ওর বছর বারো বয়স তখন। ফ্রক পরত। কিন্তু বয়সের তুলনায় বাড়ন্ত গড়ন বলে পনের বছরে পা দেবার আগেই শাড়ি ধরেছে। মাঝ বয়সে পরলোকগতা এক মাঝারি গোছের নামী অভিনেত্রীর মেয়ে যশোদা। মারা যাবার আগে মেয়েকে মায়ের হাতে সঁপে দিয়ে যায়। সেই থেকে মায়ের কাছেই আছে। বাড়িতে তু'জন মাষ্টার রেখে মা ওকে লেখাপড়া শেখাচ্ছে। আবার কয়েকটা ছবিতে ওকে ছোটখাট পার্ট করতেও দেখা গেছে। অনেকের ধারণা মায়ের কাছে আছে যখন, কালে-দিনে আর্টিষ্ট হবে।

যশোদা মায়ের প্রিয়পাত্রী হয়ে উঠছে, সে-ও আমার চক্ষুশূল। মেয়েটা গোড়া থেকেই তা বুঝতে পারতো বোধ হয়। তাই আমাকে একটু ভয়ের চোখে দেখত। মায়ের সঙ্গে আমার বেপরোয়া আচরণ আর কথাবার্তার ধরণ-ধারণ দেখে শুনেও দস্তুর মতো সমীহ করত। আমাকে বাড়িতে ঢুকতে দেখলেই ছুটে গিয়ে মাকে খবর দেয়, তারপর মায়ের পাশ ঘেঁষে বসে বড় বড় চোখ মেলে আমাকে দেখে।

এখন অবশ্য ভয়ের ভাবটা কেটেছে। দেখলে হাসি-মুখে গল্প করতে চায়, যখন তখন মায়ের অশান্তির কারণ ঘটাই বলে মৃতুমন্দ অনুযোগও করে। আমার ধারণা, যদি আমি ওই যশোদার প্রেমে পড়ে হাবুডুবু খাই, মা তাতেও আপত্তি করবে না, বরং খুশি চিত্তে ওর সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে তখন ছেলে-বউ তু'জনকেই আগলে রাখবে।

আমাকে পাবার মায়ের এই নিভৃত আকাঙ্ক্ষা টের পেলেই আমার ভিতরটা যেন আরো হিংস্র আরো নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে চায়।

এদিক থেকে স্বভাব আমার ভিতরে ভিতরে ঢের বেশি উগ্র আর নির্দয় হয়ে উঠছে, মা যা চায়, আমি তা চাই না। মা চায়, আমি লেখাপড়া শিখে মস্ত একজন হয়ে উঠি। সেই জন্যেই বোধহয় বইয়ের

সঙ্গে সম্পর্ক কম আমার, হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষার পর মা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করেছিল, কেমন দিলি ?

আমি নিস্পৃহ জবাব দিয়েছিলাম, ফেল করব, জানা কথাই তো।

আমারও তাই বাসনা ছিল। কিন্তু ফল বেরুতে দেখা গেল, ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করেছি। আর তারপর মায়ের আনন্দ দেখে ভিতরে ভিতরে রাগে জ্বলেছি। লিখতে বসে পরীক্ষার খাতায় কেন হিজিবিজি কেটে এলাম না, সেই অনুশোচনা হয়েছে।

মায়ের বরাবর ভয়—পাছে অসৎ সঙ্গে মিশি। ফলে ওই অসৎ সঙ্গ-ই একমাত্র আশ্রয় যেন আমার। সেই জিতু পোদ্দার আর তার দলবল অন্তরঙ্গ-সাথী এখন। জিতু পোদ্দার আগের থেকেও অনেক দুরন্ত, অনেক দুঃসাহসী হয়েছে। দলবল নিয়ে হামলা করে নানা ভাবে টাকা রোজগার করা শুরু করেছে। ওরা দেখেছে, দু'-চারটে বোমা-পটকা, ছোরা-ছুরিতে বেশ কাজ হয়। স্রেফ হুমকি দিয়ে বা উড়ো চিঠি ছেড়েও অনেক সময় পকেটে ভালো টাকা আসে। ফলে ওদের সাহস বেড়েই চলেছে। আমি ওদের সঙ্গে মিশি শুধু উত্তেজনার লোভে। নিজেকে ছাড়িয়ে যাবার মধ্যে বেশ একটা রোমাঞ্চ আছে। ওদের হাতে কারো নিগ্রহ বা নির্যাতন দেখলে কষ্ট হয় না, এমন নয়। আমি সামনে থাকলে, পায়ে-হাঁটা পথের মানুষদের ওপর ওকে হামলা করতে দেখলে বাধা দিতে চেষ্টা করি। কিন্তু সুখের জোয়ারে ভাসছে এমন বাড়ি-গাড়ি-ওয়ালাদের হেনস্থা কেন যেন বেশ উপভোগ্য লাগে। অবশ্য ওদের টাকা রোজগারের কোনো পরিকল্পনার বা অভিযানের সঙ্গে আমার কোনরকম প্রত্যক্ষ যোগ নেই। আমাকে ভাগ দিতে হয় না বলে জিতু পোদ্দারের দল খুশি বই অখুশি নয়। আমার শুধু দূরে দাঁড়িয়ে দ্রষ্টার ভূমিকা। কখনো-সখনো দুই একটা প্ল্যান বাতলে দিই, এই পর্যন্ত।

ওরা অন্তরঙ্গ ভাবে বটে, কিন্তু আসলে ওদের থেকেও সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন আমি। আমার আনন্দের দোসর নেই, ব্যথারও ভাগীদার

নেই। এক-একলার জগতে আমি নির্বাসিত। সেখানে টিপটিপ করে জ্বলছি আর নিভছি।

বি-এ ফাইন্যাল পরীক্ষার দিনকতক আগের এক সন্ধ্যায় মায়ের কাছে এলাম। মাঝে অনেক দিন আসি নি। মা টেলিফোনে নতুন মায়ের কাছে শুনেছে, বেশ মন দিয়ে পড়াশুনা শুরু করেছি। তাই আর আমাকে ডাকাডাকি করে বিরক্ত করে নি। আর আমার মতিগতি ফিরল বলে মনে মনে হয়তো খুশিও হয়েছে।

অনার্স ছাড়ব-ছাড়ব করেও ছাড়ি নি। তাই মন দিয়েই পড়াশুনা করছিলাম বটে দিনকতক। কিছুই ভালো লাগে না বটে, কিন্তু অযোগ্যতার ছাপ কপালে পড়বে সেটাও তেমন বাঞ্ছিত নয়। বরং পাশ করে ডিগ্রীর ছাড়পত্র অনায়াসে ছিঁড়ে ফেলে দিতে পারি।

হঠাৎ মনে হল, মা-কে অনেকদিন দেখিনি। না দেখা মানেই তার দিনরাতের চিন্তার থেকে নিজেকে অনুপস্থিত রাখা। এই স্বস্তিটুকু তাকে দিতে আমার বিশেষ আপত্তি।

গিয়ে দেখি, মা নেই, যশোদাও নেই। আয়া জানালো, দু'জনে বেরিয়েছে একটু, খানিকক্ষণের মধ্যেই ফিরবে। আমাকে বসিয়ে চা-কফি খাওয়াবার জন্য সে রীতিমতো তোয়াজ তোষামোদ শুরু করে দিল। অর্থাৎ আমি এসেও ফিরে গেছি শুনলে মায়ের ওর ওপরে বিরূপ হবার সম্ভাবনা।

খানিকক্ষণের মধ্যেই ফিরল বটে দু'জনে। যশোদা বেশ সাজগোজ করে বেরিয়েছিল, মায়ের সাজটা বরাবরই চাপা গোছের। যশোদা গোটাকতক শাড়ির বাক্স বুকে করে ঘরে ঢুকল। পিছনে মা।

ও মা, আপনি কতক্ষণ!

জবাব না দিয়ে ওকে দেখলাম একটু ভালো করে। বেশ সুন্দরই দেখাচ্ছে। মা আড়চোখে আমার দেহটা লক্ষ্য করল। সে-জন্যে আমার সঙ্কোচের লেশ মাত্র নেই। যশোদা দস্তুর মতো মহিলা গোছের হয়ে উঠেছে।

কোথায় গেছলে?

মা নিয়ে মার্কেটে বেরুলো। খুব সুন্দর সুন্দর শাড়ি কিনে দিয়েছে, দেখবেন?

আমি হাসলাম একটু। বললাম, তুমি ভাগ্যবতী দেখছি।

যশোদার দু'চোখ আমার জামা-কাপড়ের ওপর থম্‌কালো। পরনের জামা বা কাপড় ধোপদুরস্ত নয়, জামার কাঁধের কাছটা ছেঁড়াও একটু। পাশের সোফায় বসে মা-ও তাই লক্ষ্য করছিল। বলল, চল, আবার বেরোই একটু, গাড়িটা তোলা হয় নি এখনো—

মায়ের দিকে ফিরলাম।—জামা-কাপড় কিনে দেবে?

মা জোর দিয়ে বলল, দেব তো, জামা-কাপড়ের এ কি ছিরি তোর, নেই কিছু?

ঢের আছে। সোফার কাঁধে মাথা রেখে আরো গা ছেড়ে বসলাম আমি।

তাগিদ দিয়ে ফল হবে না বুঝেই মা আর আমাকে তোলার চেষ্টা করল না। তক্ষুনি আয়া ডিশ ভর্তি খাবার নিয়ে এলো। আমি এলে এটুকু বরাদ্দ, আয়া ভালো করেই জানে। মা যশোদার দিকে তাকালো, তুই তো বিকেলে খাস নি কিছু এই সঙ্গে খেয়ে নে না?

যশোদা বলে উঠল, খেয়ে খেয়ে মুটিয়ে গেলাম, অত খা' খা' করো না তো!

ওর দিকে ফিরলাম আবার।···মেয়েটা আজ চোখ টানছে। দেখতে ভালো লাগছে।

মা প্রসঙ্গ ঘোরালো। খুব মন দিয়ে লেখা-পড়া করছিস, শুনলাম?

জবাব নিষ্প্রয়োজন। খাবারের ডিশ খালি করার দিকে মন দিয়েছি। বেশ খিদে পেয়েছিল।

মা আবার বলল, ভালো করে পাশ করলে তোকে আমি বাইরে পাঠিয়ে দেব, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা—যেখানে তোর খুশি। সেখান থেকে ডিগ্রী-ফিগ্রী নিয়ে মস্ত মানুষ হয়ে ফিরবি, রাজি আছিস?

আমি মন দিয়ে পড়াশুনা করছি শুনেই মায়ের এত আনন্দ, এত আশা। উৎসুক আগ্রহে আমার দিকে চেয়ে জবাবের প্রতীক্ষা

করছে। মুহূর্তের মধ্যে আমার মাথায় সেই পারিচিত উষ্ণ বায়াবক স্রোতটা ওঠানামা করতে লাগল। দরকার হলে আমিও এখন একটু-আধটু অভিনয় করতে পারি। তার আগ্রহে ইন্ধন জুগিয়ে সাগ্রহে বললাম, সত্যি বলছ, ঠিক পাঠাবে?

মা আরো খুশি।—আমি তোকে মিথ্যে বলব নাকি? বলিস তো, তোকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে স্থিতি করে দিয়ে আসব।

যশোদা বলে উঠল, বা রে, তাহলে আমি?

মনের আনন্দে মা তাকেও প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেলল।—আচ্ছা, তোকেও নিয়ে যাব'খন।

যশোদা হেসে উঠল, তাহলেই সুমনদার পড়া হয়েছে—

মা বলল, কেন হবে না, আমরা কি ওর মতো দু'-তিন বছর থাকতে যাচ্ছি, মাস দুই থেকে দেখে-শুনে বেড়িয়ে আবার চলে আসব।

এরপর বিদেশে যাওয়ার জটলাটা তিনজনের মধ্যে জমে উঠল বেশ। মা-কে প্রস্তুত থাকতে বললাম, কারণ আমার পরীক্ষা এসেই গেছে প্রায়, আরো ভালো ফলও ইচ্ছে করলেই করতে পারি।

মায়ের গাড়ি নিয়েই বাড়ি ফিরলাম। তার স্বস্তিভরা পরিতুষ্ট মুখখানা চোখে ভাসছে। মায়ের কি হয় জানি না, কিন্তু অভিনয় করতে গেলে আমার মাথার ভিতরে কেমন একটা দপদপানি শুরু হয়। আজ সেটা খুব বেশি হচ্ছে।

গাড়িটা দাঁড় করিয়ে রেখে বাড়ি ঢুকলাম। বাবা এতক্ষণে মদের গেলাস আর বোতল নিয়ে বসে গেছে। আমার নতুন মা-কে দরকার।

টাকা দাও তো কিছু।

এ-সময়ে টাকা চাইতে নতুন মা অবাক একটু।—কত?

তিন শ' চার শ', যা পারো দাও।

হঠাৎ অত টাকা দিয়ে কি হবে?

দিনকতকের জন্য বাইরে যাব, দেরি করো না, শীগ্‌গির আনো।

নিজের ঘরে এসে পাঁচ মিনিটের মধ্যে সুটকেশটা গুছিয়ে নিলাম। মাথার দপদপানি বাড়ছে। কত সময় মনে হয়েছে, নিজেকে

ধ্বংস করে দিলে মায়ের মুখখানা দেখতে কেমন হয়? এখনো সেই গোছেরই অনুভূতি।

টাকার জন্য এ-সময় নতুন মা বাবাকে বলবে না, জানা কথাই। কারণ; মা যে আমার খরচের জন্য মাঝে মাঝে তার হাতে টাকা দেয়, সে খবর রাখি। আমি নিজের হাতে কিছু নেব না জানে বলেই ওই করে। মা এখন নতুন মাকে আগের থেকেও বেশি অন্তরঙ্গজন ভাবে।

নতুন মা ঘরে এসে বলল, সত্যিই কি, তুই যাবি নাকি? কোথায় যাবি, কি জন্যে যাবি?

আমি ধমকের স্বরে জিজ্ঞাসা করলাম, টাকা এনেছ?

থতমত খেয়ে নতুন মা তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে দিল। —তিনশ টাকা আছে।...কিন্তু কোথায় যাবি, কতদিনের জন্য চললি, বলবি তো?

গিয়ে চিঠি দেব। ভালো কথা, তুমি মাকে খানিকবাদে একটা ফোন করে দিও তো!

সুটকেশ হাতে করে নেমে এসে গাড়িতে চেপে বসলাম।—হাওড়া ষ্টেশন!

কোথায় কতদূরে চলেছি, আমিও জানি না। টেলিফোন পাবার পর আমার অভিনেত্রী মায়ের মুখখানা কি রকম হবে দেখতে, সেটাই কল্পনা করতে ভালো লাগছে। সঙ্গে সঙ্গে অকারণে যশোদার ওপর রাগ হতে থাকল।...মায়ের যন্ত্রণার ওপর প্রলেপ দেবার জন্য একজন কেউ আছে মায়ের কাছে। ছেলে খুইয়ে মা মেয়ে পেয়েছে মনে হয়!

ফিরলাম প্রায় মাস দুই বাদে। বি-এ পরীক্ষা তার ঢের আগে চুকে-বুকে গেছে। মায়ের বাসনায় বাদ সাধতে পারার আনন্দ কতদিন আর জিইয়ে রাখা যায়? আবার যেন দ্বিগুণ অবসাদের সমুদ্র।

ফিরে এসে মায়ের গম্ভীর মুখখানা দেখে অবশ্য তুষ্টিলাভ করে-ছিলাম। কোথায় গেছলাম, কেন গেছলাম, মা একটা কথাও জিজ্ঞাসা করল না। গাম্ভীর্যের আড়ালে তার হতাশাটুকুও অগোচর থাকল না আমার। শুধু জিজ্ঞাসা করল, পড়াশুনা এখানেই শেষ তাহলে?

হ্যাঁ, আর ভালো লাগে না।

আর আড়ালে অনুযোগের সুরে যশোদা বলল, আপনার মাথার ঠিক নেই, কি কাণ্ড যে করেন এক-একসময়··মাকে এ-ভাবে দুঃখ দেন কেন?

কি?

গলার স্বর শুনেই যশোদা ঘাবড়ে গেল। আর কিছু বলল না।

একভাবে দিন চলছিল। বছরখানেক বাদে আবার একটু বৈচিত্র্যের স্বাদ পেলাম যেন। দু'টি মেয়ের পদার্পণ ঘটেছে আমার জীবনে। তাদের একজন মিতা বোস আর একজন শোভা গাঙ্গুলি। দু'জনেরই বছর কুড়ি হবে বয়স। তার মধ্যে মিতা বোস দস্তুর মতো সুশ্রী। চেহারায় আর সাজ-পোশাকে স্মার্টনেসের চটক আছে। ইউ, পি-তে তার দাদুর কাছে থেকে বি-এ পড়ত। ফেল করে কলকাতায় বাপের বাড়ি চলে এসেছে। আমাদের বাড়ির উল্টো দিকে তিনখানা বাড়ির পর ওদের বাড়ি। মিতা বোসের বাবা মার্চেন্ট আপিসের বড় চাকুরে আর মা দস্তুর মতো আধুনিক।

শোভা গাঙ্গুলির চেহারায় বা চাল-চলনে মিতা বোসের মতো চমক নেই বটে, কিন্তু ওই মেয়েটাও বেশ সুশ্রী। ওদের বাড়ি-ঘর আমি দেখি নি, মাইল দুই-তিন দূরে, শুনেছি। হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করার পর আর পড়াশুনার সুযোগ হয় নি। বাড়ির অবস্থা তেমন সুবিধের নয় বোধহয়, কিন্তু সাদামাটা বেশবাসে ওই মেয়েটাও মিতা বোসের থেকে খারাপ লাগে না আমার।

শোভা গাঙ্গুলি জিতেন পোদ্দারের দলের নতুন রিক্রুট—মনা গাঙ্গুলির খুড়তুতো বোন। মনা গাঙ্গুলি জিতুর পরের দিকের সেই সাধারণ স্কুলের সহপাঠী ছিল।

বেশ চৌকস ছেলে, আই-এস-সি পাশ করার পর কোন ফার্মে টেকনিসিয়ানের ট্রেনিং-এ ছিল কিছুকাল। সেই ফার্ম লক্ আউট হয়ে যাবার ফলে বাপ-কাকার ব্যবসায় ঢুকেছিল। সেটাও ফেল

পড়তে আর চাকরি-বাকরি না জোটার ফলে জিতু পোদ্দারের দলে ভিড়ে গিয়ে এখন বহাল তবিয়তে আছে।

মায়ের সুপারিশে খুড়তুতো বোন শোভা গাঙ্গুলিকে সিনেমায় ঢুকিয়ে দেবার জন্য মনা গাঙ্গুলি আমার পিছনে লেগে আছে। জিতু পোদ্দারও আমাকে ওর হয়ে অনুরোধ করেছে।

আর ঠিক ওই বাসনা নিয়েই আপ-টু-ডেট মেয়ে মিতা বোস নিজে এসে আলাপটা এখন একটু ভাবের দিকে টেনে নিয়ে যেতে চেষ্টা করছে।

জিতু পোদ্দার আর মনা গাঙ্গুলি শোভাকেও একদিন আমাদের বাড়ি নিয়ে এলো। আর তাকেও মন্দ লাগল না আমার। কথা দিলাম, চেষ্টা করব, তবে লেগে থাকতে হবে—

মিতাকেও একই কথা বলেছিলাম। লেগে থাকার অর্থটা ওরা ঠিকই বুঝে নিয়েছে। মিতার বাড়ি এক মিনিটের পথ, সে সপ্তাহের মধ্যে চার পাঁচদিন আসে। দূরে থাকে বলে শোভা অত ঘন ঘন আসতে পারে না, তবু সপ্তাহে দিন দুই অন্তত এসে ঘণ্টাখানেক ধরে বসে গল্প করে চা খেয়ে যায়।

এই দুই মেয়ের আনাগোনা দেখে নতুন মায়ের চক্ষুস্থির। তা দেখেও মজা লাগে আমার। মায়ের কাছে নতুন মায়ের টেলিফোনে খবর জানানো সারা। মা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে, তোর কাছে নাকি দুটো মেয়ে খুব যাওয়া আসা করছে আজকাল?

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে ফিরে জিজ্ঞাসা করি, কেন, তোমার আপত্তি আছে?

আপত্তি করলে কি ফল হবে মায়ের জানা হয়ে গেছে। জবাব দিয়েছে, না, আমি তোর কে, যে আপত্তি হবে…।

হেসে বললাম, বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই আসা যাওয়া করছে তারা, শীগ্‌গিরই টের পাবে।

টের পেয়েছে, একে একে দুজনকেই নিয়ে মায়ের কাছে এসেছি। মায়ের সামনে ভক্তি-শ্রদ্ধায় অবনত দুজনেই। মিতা বোস তো পায়ে

মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে বসল। আমার মার্জিত রুচি অভিনেত্রী মা—দু'জনের সঙ্গেই সদয় ব্যবহার করেছে, যত্ন করেছে, কিন্তু কাজের বেলায় গম্ভীর মুখে বলেছে, বড় শক্ত, দেখি কি করতে পারি।

মিতা বোস বলেছে, আপনার স্নেহ পেলে আর কিছু চাই না, সব সহজ হয়ে যাবে।

শোভা গাঙ্গুলি কিছু বলে নি। দু' চোখে শুধু আশা জমাট বেঁধেছে।

পরে মা ধমকের সুরে বলেছে, এ-সব কি আরম্ভ করেছিস তুই, আমি কারো জন্যে কিছু করতে পারব না।

আমি নির্লিপ্ত।—চেষ্টা করে দেখো না, কালে-দিনে তোমার থেকেও বড় আর্টিষ্ট হতে পারে ওরা।

একদিন নয়, শোভা গাঙ্গুলিকে পরের ছ'মাসের মধ্যে দিন চারেক আর মিতা বোসকে দিন দশেক মায়ের কাছে এনেছি। পরের জনকে মায়ের সামনেই উস্‌কে দিয়েছি, ঠিক মত হামলা করতে পারছ না, হবে কি করে। হামলায় সাহায্য করার জন্য ওকে নিয়ে ষ্টুডিওতেও এসেছি।

ভিতরে ভিতরে মা ভয়ানক বিরক্ত। একলা পেয়ে ধমকে উঠেছে, আমি কিছু করতে পারব না, বলেছি না?

চেষ্টা করো, কিছু না পারো আশ্বাস দাও, তাছাড়া হবে না-ই বা কেন, ওই মিতা বোস অন্তত ভালই পারবে মনে হয়—

চাপা বিরক্তিতে মা ঝাঁঝিয়ে উঠল, আমার দ্বারা কি-চ্ছু হবে না, এবারে এলে স্পষ্ট বলে দেব।

বলে দেখো তো....।

বললে তুই কি করবি, শুনি?

ধীরে-সুস্থে জবাব দিলাম, কিছু একটা করব নিশ্চয়, কি করব সেটা পরের বিবেচনা...কালই মিতা বোসকে নিয়ে আসছি আমি, বলে দিও।

আমার বলার মধ্যে এমন কিছু ঠাণ্ডা হুমকি ছিল যে মা শুধু মুখের

দিকে চেয়েছিল চুপচাপ। পরদিন মিতা বোস আসতে মা তাকে ফটো সমেত ষ্টুডিও-তে দেখা করতে বলেছে। দুই-একজন প্রডিউসার আর ডাইরেক্টরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে।

আনন্দে মিতা বোস হাওয়ায় ভেসেছে। ট্যাক্সিতে আমার পাশে ঘন হয়ে বসেছে। অসঙ্কোচে আমার এক হাত ওর কাঁধে উঠে এসেছে। এই গোছের প্রশ্রয় ও আগেই দিয়েছে। আজ দাবি বাড়ালেও আপত্তি করবে না, জানি।

রাত সাড়ে ন'টার পর ওকে বাড়িতে ছেড়ে দিয়ে আমি ফিরেছি। মাথাটা ঝিমঝিম করছে কেমন। নিজের ঘরে এসে আয়নার সামনে দাঁড়াতেই ধাক্কা খেয়েছি একটা। আমার ঠোঁটে দগ্‌দগে লিপষ্টিকের দাগ। হঠাৎ বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় গা-টা ঘুলিয়ে উঠল কেমন। ওটা যেন রক্তের দাগ।

আশ্চর্য, এরপব শোভা গাঙ্গুলিকে নিয়ে বরং বেড়াবার ঝোঁকটা বেড়েছে আমার। ও বড় জোর মুখে একটু পাউডার বুলোয়। ওর গায়ে-কাঁধে হাত দিলে কেমন শক্ত হয়ে ওঠে। নার্ভাস হয়। আমার তাই ভালো লাগে। ওকেও মায়ের কাছে নিয়ে গিয়ে বলেছি, ফটো সমেত মায়ের সঙ্গে ষ্টুডিও-তে দেখা করো, মা চুপ। আর শোভা কেমন যেন অসহায় বোধ করেছে। ফেরার সময় ট্যাক্সিতে গা ঘেঁষে বসে নি। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করেছে, ষ্টুডিও-তে গেলে আপনি সঙ্গে থাকবেন না?

আমার হাসি পেয়েছে, আবার ভালও লেগেছে। মিতা আমাকে 'তুমি' করে বলে, নাম ধরে ডাকে। কিন্তু এ-মেয়েটা অন্যরকম। তা বলে দু'জনের কারো ওপরই মায়া মমতা নেই আমার। ফিল্ম-আর্টিষ্ট হতে চায় বলেই যেন আমার খেসারত আদায়ের অধিকার। আকর্ষণটা মিতা বোসের থেকে আপাতত শোভা গাঙ্গুলির প্রতি বেশি বলেই ওর ওপর মমতা আরো কম।

ভিক্টোরিয়া মেমরিয়ালে এক নিরিবিলি কোণে বসে দু'হাত বাড়িয়ে ওকে সজোরে কাছে টেনে আনতে ও ধড়ফড় করে উঠল একেবারে। অস্ফুট স্বরে বলে উঠল, না না, না না—

জোর করেই দূরে বসল তারপর। ভয়ে শুকনো মুখ, কাঁপছেও মনে হল। আমার রাগ হয়ে গেল হঠাৎ, সশ্লেষে বলে উঠলাম, এত ভয় নিয়ে তুমি ফিল্ম-আর্টিষ্ট হবার স্বপ্ন দেখো!

শোভা চুপ করে রইল অনেকক্ষণ, তারপর আশাহতের মতো বলল আমাকে দিয়ে সত্যিই কিছু হবে না, সুমনদা···আমি নিজেই তা বুঝতে পারছি, কিন্তু আমি কি করব, ব্যবসা অচল হতে বাবার অত অসুখ··· ছোট ভাইগুলো না খেয়ে মুখ শুকিয়ে ঘোরে, মাত্র হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ, কে চাকরি দেবে আমাকে—মনাদা আপনার কথা বলে ফিল্ম লাইনের লোভ দেখালো, কিন্তু আপনার মায়ের সামনে গেলে পর্যন্ত আমার পা দুটো ঠকঠক করে কাঁপে, পারব না, নিজেই বুঝতে পারি··· পরে আবার মনে হয়, না পারলে সবাইকে তো উপোস করে মরতে হবে।

মেয়েটা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। আমি নির্বাক, হতভম্ব। আমার ভিতরের শয়তানটার গালে কে যেন ঠাস ঠাস করে দুটো চড় কষিয়ে দিল।

কি ভেবে আবার ওকে ট্যাক্সিতে তুলে নিয়ে বাড়ি পৌঁছে দিতে চললাম।

অন্ধকার গলির মধ্যে স্যাঁতসেঁতে জীর্ণ বাড়ি একটা। ঘরে হারিকেন জ্বলছে, টাকা দিতে না পারার দরুন ইলেকট্রিক বন্ধ বোধ হয়। দারিদ্র্যের এই দশা আমি কল্পনা করতে পারি না। শোভার আমাকে ভিতরে ঢোকাবার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু ঢুকে পড়লাম যখন কি আর করবে। প্রথমে মায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল, মনাদার বন্ধু, এঁরই মায়ের মারফত চাকরির চেষ্টা হচ্ছে—

শীর্ণ মূর্তি মহিলা। ময়লা লাল পেড়ে শাড়ি পরনে। গায়ে জামা নেই বলে ওটা ভালো করে জড়িয়ে নিল। তার কপালে জ্বলজ্বলে সিঁদুরের মস্ত টিপ একটা, সিঁথিতেও চওড়া করে সিঁদুর টানা। মুখের দিকে তাকালে ওই দুটো বস্তুই আগে চোখে পড়ে। আমার অন্তত পড়ছে। পাঁচ-ছ'টা রোগা রোগা ছেলে মেয়ে ঘরে ভিড় করে দাঁড়িয়ে দেখছে আমাকে। ওরা শোভার নিজের আর খুড়তুতো ভাই-বোন।

শোভার কাকা রোজগারের ধান্ধায় বেরিয়েছে। ওর বাবাকে দেখলাম। শয্যাশায়ী লালচে মুখ, লালচে দেহ। শুনলাম ড্রাই ওয়াশিং-এর ব্যবসা ছিল। ফেল পড়ার পর থেকে ব্লাডপ্রেসারে শয্যাশায়ী। ব্যবসা ফেল পড়ার কারণ, দোকানে ছোটখাট ডাকাতি হয়ে যায় হঠাৎ। পাঁচ-ছ'হাজার টাকার মাল চুরি হবার ফলে এই হাল। খদ্দেররা গলায় গামছা দিয়ে মালের দাম আদায় করে নিয়ে গেছে। পাঁচ বছরের লিজ্ ছিল বলেই দোকানঘরটাই শুধু তালাবন্ধ আছে এখনো। আঘাত পেয়ে ভদ্রলোকের মাথায় গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে একটু, হাজার সাতেক টাকা হাতে পেলে ব্যবসা এবারে কিভাবে চালু করা যেতে পারে, সেই হিসেব কষে, ভাইয়ের সঙ্গে সেই পরামর্শ আগের থেকেই সেরে রাখতে চায়। কিন্তু আর সকলে জানে, সাত-আট হাজার টাকা আকাশকুসুম স্বপ্ন তাদের কাছে। ভদ্রলোক আমার দু'হাত ধরে কাকুতি মিনতি করে বলল, দেখো না বাবা, কেউ যদি দেয় টাকাটা। আমি তাকে অর্ধেক অংশ লেখাপড়া করে দেব, বাকি অর্ধেক আমাদের দু' ভাইয়ের থাকবে, তাকে কিছু করতে হবে না, সে শুধু ঘরে বসে লাভের অংশ পাবে।

জীবন যন্ত্রণার একটা বদ্ধ গুমোট থেকে বেরিয়ে এলাম যেন। কিন্তু বাড়ি আসার পরেই সেই যন্ত্রণাটা মগজে ঘুরপাক খেতে থাকল। বাবার ঘরে উঁকি দিলাম একবার। চেয়ারে মাথা রেখে নেশাটা উপভোগ করছে।

পরদিন সকালে সোজা তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালাম। আমার কিছু টাকা দরকার।

বাবা রীতিমতো অবাক, কারণ সামনাসামনি টাকা চাওয়া এই প্রথম। কত?

আট হাজার।

কত! নিজের কানের ওপর হঠাৎ যেন বিশ্বাস হারালো বাবা।

আরো স্পষ্ট করে বললাম, আট হাজার।

বাবা হতভম্ব খানিক। আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করল একবার। অত টাকা কি জন্যে দরকার?

দরকার আছে, টাকাটা আজই ব্যাঙ্ক থেকে তুলে আনতে ভুলো না।

বাবা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল একেবারে, কি দরকার না বললে এক পয়সাও পাবে না, বললেও পাবে কিনা সেটা আমি বিবেচনা করে দেখব। মুখের কথা খসলেই আট হাজার টাকার বৃষ্টি হয়ে যাবে, কেমন? আট টাকা রোজগার করে দেখেছ কখনো?

সরোষে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। অর্থাৎ আর কোনো কথা নেই।

খুব ঠাণ্ডা স্বরে বললাম, আমার দলের ছেলেরা আমার জন্যেই আজও তোমার কাছে টাকার দাবি করে নি, তারা চাইলে আট হাজারের ঢের বেশিই চাইত। আমার আপত্তি না থাকলে তারা কম করে হাজার পঁচিশেক আদায়ের ব্যবস্থা করবে।

বাবা সত্রাসে ফিরে তাকালো আমার দিকে। খবরের কাগজ সেও পড়ে। টাকা ওদের দিতে হবে?

না, আমার-ই দরকার।

বাবা গর্জন করে উঠল, আমাকে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করতে এসেছিস? তোদের সকলকে পুলিশে দেব আমি।

চেষ্টা করে দেখো।···টাকাটা আজই চাই। আজ ন'বছর হল আমার বাড়িতে আছ, খুব কম হলেও মাসে সাড়ে সাতশ' টাকা ভাড়া হবে এর—এক বছরেই আমার ন'হাজার টাকা পাওনা হয়। এই আট হাজার বাদে মাসে এরপর অন্তত পাঁচ শ' টাকার অর্ধেক আমার নামে কালই ব্যাঙ্কে-জমা করে দেবে।

নিজের ঘরে চলে এলাম। নতুন মা হাঁ করে আমার মুখের দিকে চেয়ে ছিল। বিকেলে সে-ই আমাকে টাকা এনে দিল। বাবার আর আমার মুখ দেখতেও আপত্তি বোধহয়।

* * * *

আট হাজার টাকা পেয়ে শোভা গাঙ্গুলির বাবা পাগলের মতো করতে লাগল। হাসছে কাঁদছে আর আমাকে বারবার জড়িয়ে ধরতে চেষ্টা

করছে। শোভার মা, কাকা আর শোভা নিজেও বাক্‌শক্তিরহিত যেন। আমার মাথায় কিছু গণ্ডগোল আছে কিনা তাই যেন সন্দেহ তাদের। শোভার বাবা বলছে, কেমন, বলেছিলাম না, ভগবান ঠিক আবার মুখ তুলে তাকাবে।

শোভার মায়ের কোটরাগত চোখে চাপা শঙ্কা। আমাকে আড়ালে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করল, তুমি অত টাকা দিচ্ছ কেন, বাবা?

হেসেই জবাব দিলাম, মনে করুন, শোভার কোনো দাদার কিছু টাকা আছে, সে দিয়েছে।

মহিলার দু'চোখ অস্বাভাবিক চকচক করতে লাগল।

শোভার কাকাও কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, টাকাটা ঠিক কি শর্তে দিলেন, বুঝলাম না....

বিরক্তিকর। মোলায়েম সুরেই জবাব দিতে হল, ছেলে-মেয়েগুলো আর শোভা লেখা-পড়া শিখে মানুষ হবে, এই শর্তে।

ভদ্রলোক হাঁ করে আমাকে দেখতে লাগল।

এই গুমোটের মধ্যে বাতাস টানতে কষ্ট হচ্ছিল। বেরিয়ে এলাম।

সুমনদা!

অন্ধকার গলির মধ্যে দাঁড়িয়ে গেলাম। পিছন থেকে শোভা বেশ কাছে এসে বলল, আপনি কি অদ্ভুত মানুষ!

একটা তপ্ত নিঃশ্বাস আমার মুখে লাগল। ও এবার ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল, আমাকে ষ্টুডিওতে কবে যেতে হবে?

মাথাটা আমার খারাপ কিনা আমার নিজেরই মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়। জবাব না দিয়ে অন্ধকার গলির মধ্যে অত বড় মেয়ের গালে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে আমি বেরিয়ে এসেছি।

বাড়ি ফিরে নিজের অনুভূতি প্রবণতার বহর দেখে নিজেরই হাসি পেয়েছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে বলেছি, সুমন সরকার তুমি একটা গাধা।

অথচ ভিতরে ভিতরে ঠিক তারপর থেকেই ঠাণ্ডা পরিবর্তন এসেছে একটা। আমার ক্রূর অভিলাষের আওতা থেকে শুধু শোভা নয়,

মিতাও কেমন যেন মুক্তি পেয়ে গেছে। শোভা এখনো আসে মাঝে মাঝে। কৃতজ্ঞতায় ভরাট মুখ। অন্ধকার গলির সেই চড়টা যেন ওর যোগ্য পুরস্কার।

মিতা বোসের আরো অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে আপত্তি নেই। মা ওকে দস্তুর মতো আশাই দিয়েছে। ওর কৃতজ্ঞতার ধরন-ধারণ অন্যরকম। লক্ষ্যে পৌঁছুবার জন্য ও যেন যে কোনো মাশুল দিতে প্রস্তুত।···না, মাশুলও ঠিক নয় হয়তো, ও সানন্দে আশা করছে, ভবিষ্যতে ওর সঙ্গে কোনো বড় সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। চালাক মেয়ে, এখন একাই মায়ের সঙ্গে দেখা করে। আমার প্রতি মায়ের দুর্বলতাটুকু ও হয়তো আঁচ করতে পেরেছে। মনে মনে তাকেও আমি অব্যাহতি দিয়েছি। আমার ঠোঁটের সেই লিপস্টিকের দাগ আজও ভালো করে উঠল না, এমন একটা অসম্ভব অস্বস্তি বোধ করি মাঝে মাঝে।

সেদিন মিতা বলল, সুমন, তুমি আমাকে ঠিক আগের মতো পছন্দ করো না।

আমি অস্বীকার করি নি।—ঠিকই ধরেছ।

ও আহতমুখে জিজ্ঞাসা করল, কেন করো না ?

আমি জবাব এড়াতে চেষ্টা করেছি।—তা ঠিক বলতে পারব না, হয়তো আগের থেকে আমি একটু উদার হয়ে পড়েছি।

ও পরিহাস ভেবে হেসেছে। কিন্তু ভিতরে আমি কেমন বিরক্ত বোধ করেছি।

দিন কাটে। নিজের অস্তিত্বটাই বোঝার মতো মনে হয় এক এক সময়। ভাবি, আমি না জন্মালে এত বড় দুনিয়াটার কি ক্ষতি হত? মায়ের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ আগের থেকেও কমিয়ে দিয়েছি। তার ছবিগুলো কিন্তু খুঁটিয়ে দেখি : প্রায় সমস্ত ছবিতেই রমণীর মাধুর্যের দিকটা বিশেষভাবে প্রতিভাত। এই বিশেষত্ব যে গল্পে নেই, সেই ছবিতে মা অভিনয়ই করবে না। অথচ রমণী চরিত্রের এই বৃহৎ দিকটা দেখলেই ভিতরে ভিতরে এক অন্ধ আক্রোশে ফুলতে থাকি আমি। মনে হয়, মা ওই রকমই মহৎ আর সুন্দর হতে পারতো, তার

প্রতি ওপর-অলার দাক্ষিণ্যের প্রসাদ আছে। কিন্তু মা তা হয় নি।

যে উপলক্ষ নিয়ে আমি আচম্‌কা পাগলের মতো কাণ্ড করে বসলাম, সেও মায়ের নতুন একটা ছবি। ছবিটার প্রশংসায় সমস্ত কাগজগুলো পঞ্চমুখ। দিনের পর দিন 'হাউস ফুল' যাচ্ছে। দেখব দেখব, করেও দেখা হয়ে ওঠে নি অনেক দিন। যশোদা কতবার বলেছে, শিল্পী কাকে বলে মায়ের এই ছবিতে দেখে আসুন।

টিকিট পেয়ে সেদিন হঠাৎ ঢুকে পড়েছিলাম। ফলে মানসিক প্রস্তুতির অভাব ছিল। ছবিটা যতো দেখছি, শরীরের সমস্ত রক্তকণাগুলো যেন ফুটে ফুটে মাথার দিকে ধাওয়া করছে আমার। কাহিনীর বিষয়বস্তু এক মদ্যপ স্বামীর সংশ্রব ত্যাগ করে পাঁচ বছরের ছেলে নিয়ে নিরুদ্দেশ তার তেজস্বিনী মা। তার একমাত্র সঙ্কল্প—ছেলেকে বাপের মতো হতে দেবে না, তাকে সে নিজের আদর্শে মানুষ করবে। কিন্তু অন্তরায় তার বয়স, অন্তরায় তার রূপ যৌবন। আশ্চর্য সুষমামণ্ডিত তেজে এই সব অন্তরায় সে প্রতিহত করতে পেরেছে। কিন্তু বিধাতার নির্মমতম পরীক্ষা সামনে তখনো। ছেলেটি অসুস্থ হয়ে পড়ল, তার জীবন সঙ্কট। হাসপাতালের যে বিরাট ডাক্তারটির ওপর প্রধান নির্ভর, সেই মানুষটি এক প্রবল পুরুষ—রমণীর প্রতি যার সজাগ চুলচেরা দৃষ্টি। সেই দৃষ্টি রমণীর মহিমা আবিষ্কার করতে জানে। নামজাদা সেই ডাক্তার পুরুষের মতই সবল হাত বাড়িয়েছে ছেলেটির মায়ের দিকে …একদিকে ছেলের জীবন, অন্যদিকে সত্তার সংঘাত। মহিলা এই মদ্যপ স্বামীকেই ভালবাসে, ছেলের ভিতর দিয়ে আদর্শের একটা সাদা নজির রেখে যেতে চায় তার কাছে। শেষ পর্যন্ত বিচিত্র সংঘাতের মধ্য দিয়ে আদর্শেরই জয়, মহিলার নিখাদ রমণীসত্তা এক শুচিশুভ্র দীপ্ত মাধুর্যে ভাস্বর—প্রবল পুরুষ সেই ডাক্তারও অবনতমস্তক তার কাছে….সুস্থ ছেলের হাত ধরে সে যখন বিদায় নিয়ে হাসপাতাল থেকে চলে যাচ্ছে, নামজাদা সেই ডাক্তারের দু'চোখ আনন্দে চিকচিক

করছে, সে তার সহকারীকে বলছে, এমন মা-ও যে দেশে আছে, সে দেশের দুর্ভাগ্য, কে বলে?

সেই ছবি দেখার পর সমস্ত রাত আর তার পরদিন সমস্ত সকাল আমার মাথায় দাউদাউ আগুন জ্বলেছে শুধু। দুপুরের দিকে অসহ্য লাগতে রাস্তায় বেরিয়ে একটা ট্যাক্সিতে চেপে বসলাম। আশা করছি, বাড়িতেই পাব মাকে, গত রাতে নতুন মা বলছিল, দিদির জ্বর হয়েছে একবার দেখে আসি, চল্।

আমি কেন চলেছি, কৈফিয়ত নিতে? মায়ের সঙ্গে যে অদৃশ্য বন্ধনটুকু আছে, নির্মমভাবে সেটা ছিঁড়ে ফেলে দিতে? নাকি জীবনের এতবড় মিথ্যেকে অভিনয় করে এমন সত্যের রূপ দিতে পেরেছে বলে কনগ্র্যাচুলেট করতে?

আমি জানি না, কেন যাচ্ছি। ভিতরটা কি যেন এক চুড়ান্ত নিষ্পত্তির আঘাত হানার জন্য অস্থির কঠিন।

দারোয়ান চেনে, সে সেলাম ঠুকল। দোতলার সিঁড়ির বারান্দার দূরের কোণে আয়া ছুটো তকতকে মেঝেতে পড়ে ঘুমুচ্ছে। নিঃশব্দে পর্দা সরিয়ে মায়ের ঘরে ঢুকলাম।

তারপরেই চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে গেলাম।

পালঙ্কে শুয়ে মা ঘুমুচ্ছে। তার একদিকের কাঁধে মাথা রেখে বলতে গেলে প্রায় বুকের ওপর শুয়ে যশোদা ঘুমুচ্ছে। ওর একটা হাত মায়ের বুকটা বেষ্টন করে আছে। মায়ের বুকে যশোদা আধা-আধি উপুড় হয়ে শুয়ে আছে।

অপলক চোখে দেখছিলাম। একটা ঝাঁকুনি খেয়ে সজাগ হলাম। ঝাঁকুনি নয়, শয়তানের চাবুক, মগজের মধ্যে শয়তানের কাটাছেঁড়া। শরীরের রক্ত এখন বুঝি চোখ দিয়ে ফেটে বেরিয়ে মুখের দিকে গড়াবে। নিজের রক্তের নোনা স্বাদ আমি আগেই পাচ্ছি কেন?

যেমন এসেছিলাম তেমনি নিঃশব্দে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম। দারোয়ানটা এরই মধ্যে আমাকে চলে যেতে দেখে অবাক হল একটু।

না, আমার মাথায় বুকে সর্বাঙ্গে এমন আগুন আর কখনো জ্বলে

নি। এ-আগুন আমি নেভাতে চাইনে, এ-আগুনে আমি সব কিছু ধ্বংস করতে চাই।

অপ্রত্যাশিত সুযোগ মিলল। মাথা ঠাণ্ডা থাকলে ওপর-অলার এ-চক্রান্ত ধরতে পারতুম। কিন্তু মাথা ঠাণ্ডা আর বোধহয় এ-জীবনে হবে না।

ঘুরতে ঘুরতে জিতু পোদ্দারের আড্ডার জায়গায় এসেছি। তখন বিকেল। আমাকে দেখে ওরা আনন্দসূচক ধ্বনি ছাড়ল একটা। জিতু বলল, চাঁদুর যে দেখাই নেই আজকাল, বলি প্রেমে-টেমে পড়লে নাকি কারো?

ঘরে তখন চারজন ছিল ওরা। ওদের কাছে আমার এখন মান খুব। শোভা গাঙ্গুলির বাপের হাতে আট হাজার টাকা দিয়েছি। মনা গাঙ্গুলি সেটা এদের কাছে গোপন রাখে নি। জিতু আড়ালে আমাকে বলেছিল, একটা মেয়ের জন্য আট হাজার—ওই টাকায় যে অমন আটটা মেয়ে ঘায়েল করা যেত, দোস্ত.... !

এরপর থেকে আমার টাকার সম্বন্ধে ওরা নিজেদের মধ্যে অনেক জল্পনা-কল্পনা করেছে, বুঝতে পারি। আমাকে দেখলেই সকলে ছেঁকে ধরে, ভালো-মন্দ একটু হয়ে যাক, বন্ধু—

ওদের ভালো-মন্দ মানে মদ। জিতুর বাছাই দলকে অনেকদিন বার-এ নিয়ে গেছি। ওদের সঙ্গে আমিও গিলেছি। তরল পদার্থ বুকের ভিতরটা জ্বালিয়ে দিয়ে জঠরে নেমেছে। এটা মন্দ লাগে না। একটা যন্ত্রণা দিয়ে আর একটা যন্ত্রণা ঘায়েল করার মতো। পরে আরো-ভালো লাগে।

সেদিনও আপত্তি না করে বার-এ নিয়ে গেলাম। আমার নিজেরই দরকার ছিল।

ওদের আনন্দ সবে জমাট বেঁধেছে তখন। জিতু হঠাৎ বলল, কারবারে মন্দা পড়েছে এখন, শালারা সেয়ানা হয়ে উঠেছে, দলে একটা মক্ষীরাণী থাকলে বেশ হত, টোপ ফেলে অনেক মক্কেল ঘায়েল করা যেত, নিজেদেরও আনন্দে কাটত।

এটাই ওপরতলার কারসাজি। শয়তানের এই টোপ যে শুধু আমার উদ্দেশেই ফেলা, কি করে বুঝব। নেশা গুরুর মুখে মনের মতো আলোচনার রসদ পেয়ে ওরা উদ্দীপিত। হৈ-হৈ করে সকলে গুরুর প্রস্তাবনার তারিফ করল। সকলে একবাক্যে স্বীকার করল, সুশ্রী চালাক-চতুর একটি মক্ষীরাণী সংগ্রহ করা গেলে কারবার জমিয়ে তোলা যায় বটে। কিন্তু আসল সমস্যা তেমন মক্ষীরাণী জোটানো যায় কি করে।

আমার মগজের মধ্যে অদ্ভুত দাপাদাপি শুরু হয়ে গেল তক্ষুণি। মায়ের ওই অভিনয়ের পুরস্কার দিতে হবে....একটাই পুরস্কার তার যোগ্য। যশোদাকে তার বুক থেকে ছিনিয়ে নিতে হবে, ছিনিয়ে নিয়ে মায়ের বুক আরো খালি করে দিতে হবে। এটুকু পারলেই শুধু আমার মাথার আগুন বুকের আগুন নিভবে। সব জ্বালা যন্ত্রণা জুড়বে।

ঘোলাটে চোখে তাকালাম ওদের দিকে। অপ্রত্যাশিত উক্তি শুনে ওদের নেশা চটে যাবার দাখিল।

আমি পারি জুটিয়ে দিতে, কিন্তু তোমরা তাকে আগলে রাখতে পারবে? মক্ষীরাণী বানাতে পারবে?

এক নিঃশ্বাসে গেলাস খালি করে জিতু পোদ্দার বলল, জান কবুল, পারলে সেদিন থেকে তুমিই আমাদের গুরু। সত্যি পারবে, না মদের ঝোঁকে বলছ?

আমি মাথা নাড়লাম। সত্যি পারব। তোদের হাতের মুঠোর মধ্যে এনে দেব।

জিতু পোদ্দারের তবু সংশয়, কেমন দেখতে?

তোমরা যা আশা করছ তার থেকে ভালো।

ওদের বুকের তলায় একটা উত্তেজনার ঝড় বইতে লাগল যেন। শুধু মনা গাঙ্গুলি হাঁ করে দেখছে আমাকে। ভাবছে, হয়ত বোনের দুঃখে দরাজ হাতে আট হাজার টাকা দিয়ে ফেলতে পারে যে তার মুখে এই প্রস্তাব সম্ভব কি করে।

জিতু বলল, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, হাতের মুঠোয় যদি তেমন মেয়ে পাই, দরকার হলে পিষে ফেলেও মক্ষীরাণী বানিয়ে ছাড়ব।

পরদিন সকালে জিতু পোদ্দার আর বাকি তিনজনের সঙ্গে বসে ঠাণ্ডা মাথায় সমস্ত ব্যবস্থার প্ল্যান হয়ে গেল।

দুটো নিস্তরঙ্গ নিথর দিন কেটে গেল।

তৃতীয় দিনে মা ষ্টুডিও-য় গেছে, খবর পেলাম। বিকেল পাঁচটা নাগাদ আমি তার বাড়িতে হাজির। মেক-আপ তুলে মায়ের বাড়ি ফিরতে সাড়ে ছ'টা।

যশোদা আমাকে দেখে একমুখ হেসে এগিয়ে এলো। আমার বরাদ্দ চা জলখাবার এসে গেল। ও এটা সেটা গল্প করতে লাগল।

ঘড়িতে সাড়ে পাঁচটা। আমি প্রস্তাব করলাম, চলো একটু বেড়িয়ে আসা যাক, সঙ্গে গাড়ি আছে।

যশোদা অবাক আবার খুশিও। একটু বসুন না, মা ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই এসে যাবে।

তাহলে তুমি থাকো, আমি চললাম।

ওমা সে-কি, মায়ের সঙ্গে দেখা করবেন না?

আমি রাগত মুখে বললাম, তুমি দশ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে আমার সঙ্গে বেরুবে কি না?

যশোদা ঘাবড়েই গেল। আমার খামখেয়ালী স্বভাব জানে। সমীহও করে। আমাকে খুশি রাখতে মায়ের থেকে কম চেষ্টা করে না সেও। তাড়াতাড়ি বলল, আচ্ছা আসছি, বসুন—

*　　　*　　　*

গাড়ি আমি চালাচ্ছি। ফাঁকা রাস্তায় গতির কাঁটা পঞ্চাশ মাইলের দাগ ছুঁয়েছে। পাশে যশোদা বসে। মাঝে মাঝে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাচ্ছে। আমি ওর কাছে বরাবরই একটা বিস্ময়—এমন গাড়ি চালাই, সেটাও। ও জানে না, স্কুলে পড়তেই মায়ের গাড়ি আমি কত চালিয়েছি। আর জোরে চালিয়ে মায়ের কত বকুনি

খেয়েছি। কথা-বার্তা এতক্ষণ ওই বলছিল এক তরফা। তারপর ক্রমে ওর অস্বস্তি বাড়ছে, টের পাচ্ছি।

চলেছেন কোথায় ?

সমুদ্রের হাওয়া খেতে।

অ্যাঁ, এতদূর! না না, আর একদিন যাব, ফিরুন, যেতেই রাত হয়ে যাবে, মা ভাববে।

আমার সঙ্গে এসেছ, সকলেই জানে, কিছু ভাববে না।

যশোদার মুখের হাসি আগেই কমে গেছল। ক্রমে কথাও বন্ধ হল। ওর মুখ শুকিয়ে গেছে, সন্দিগ্ধ চাউনি।

গন্তব্যস্থানে পৌঁছুলাম যখন সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে। একটা ভাঙা নির্জন বাগান বাড়ির খোলা ফটকের মধ্যে গাড়ি ঢুকিয়ে দিলাম। যশোদা আঁতকে উঠল।—এ কোথায় আনলেন আমাকে ?

আমি হাসলাম এবারে। বেশ ভালো জায়গা।

ভাঙা গাড়ি-বারান্দার নিচে গাড়ি থামতে জিতু পোদ্দারের দল তিনটে বড় বড় টর্চ হাতে দৌড়ে এলো। আমি নেমে এসে এদিকের দরজা খুলে যশোদাকে হাতে ধরে টেনে নামালাম। তারপর জিতু পোদ্দারের দিকে ঠেলে দিলাম। এই নাও মক্ষীরাণী।

তিনটে টর্চই যশোদার নির্বাক বিবর্ণ মুখের ওপর জ্বলে উঠেছে। ওদের চোখে মুখে চাপা উল্লাস। . টর্চ নিভে গেল। জিতু খপ্ করে যশোদার একটা হাত ধরে ভিতরের দিকে টানল, চলো গো সুন্দরী, কিছু ভয় নেই।

পিছন ফিরে অন্ধকারে আমার দিকে চেয়ে যশোদা অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল, সুমনদা!

আমার কানের ভিতরটা জ্বলে যেতে চাইল বটে কিন্তু জ্বলতে দিলুম না।

সামনে মস্ত ঘর। দরজা-জানালা বন্ধ, ভিতরে পেট্রোম্যাক্স জ্বলছে। পাশের ঘর ছুটোয় হারিকেন জ্বলছে টিমটিম করে। যশোদাকে বড় ঘরে টেনে এনে মাঝের গদি-আঁটা ময়লা ফরাসের ওপর জোর করে

বসিয়ে দিল জিতু। তারপর খুশির আতিশয্যে আমার পা ছুঁয়ে একটা প্রণাম করল। দেখাদেখি বাকি তিনজনও।

ভয়ে কণ্টকিত যশোদা বিস্ফারিত নেত্রে আমাকে দেখছে। আমার মুখে শয়তানের হাসি দেখছে বোধহয়।

বললাম, এতদিন একরকমের অভিনয় করেছ, এখন মক্ষীরাণী হয়ে ঢের বেশি বাস্তব অভিনয় করবে, অত ঘাবড়াবার কি আছে?

যশোদা হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল, তারপর চিৎকার করে বলতে লাগল, আমাকে মায়ের কাছে দিয়ে এসো সুমনদা, তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে মায়ের কাছে দিয়ে এসো—

আমার কান দুটো আবার জ্বলে যেতে চাইছে বলেই ভিতরে ভিতরে আরো নৃশংস আমি। জিতু শক্ত হাতে ওর মুখ চেপে ধরে গলা বন্ধ করে দিল। তারপর কোমরে গোঁজা রিভলভারটা টেনে বার করে দেখালো। অন্যহাতে ওর কাঁধ ধরে দুটো ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, মেয়েছেলে খুন করার সাধ নেই, কিন্তু দরকার হলে বাধাও নেই—বুঝে-শুনে অবাধ্য হয়ো।

যশোদা আবার নির্বাক, স্তব্ধ। এর পরেও ও শুধু আমার দিকেই চেয়ে আছে কেন! বিরক্তিকর।

এতবড় সৌভাগ্য জিতু আর তার সঙ্গীরা কল্পনাও করতে পারে নি। লোলুপ চোখে ওরা যেন সর্বাঙ্গ. জরিপ করছে মেয়েটার। পারলে এখনি ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিঁড়ে খায়। এই রাতেই ওরা সর্বনাশ করবে মেয়েটার, আমি ওকে রক্ষা করতে পারব না।

বিরক্তিকর। রক্ষা করার কথা ভাবতে যাচ্ছি কেন? রক্ষা করব বলে ধরে এনেছি! তবু হঠাৎই এক বিপরীত প্রতিক্রিয়া মাথার মধ্যে ওঠা-নামা করতে লাগল। তাড়াহুড়োর ব্যাপারটাই শয়তানের অনুকূল, মায়ের বুক খালি করবই আমি, কিন্তু তবু এদের হাতে মেয়েটাকে আজই সঁপে দিতে মন চাইল না। মাঝে একটু কিছু যেন ভাবার আছে। যা করার কাল করব, সঁপে দিতে হয় কাল দেব.... আর সঁপে যদি দিতেই হয় তাহলে...

লুব্ধ চোখে তাকালাম যশোদার দিকে। আমন্ত্রণ পেয়ে শয়তান এবার আমাকেই ঠেলে দিতে চাইল ওর দিকে। কিন্তু ভিতর থেকে প্রচণ্ড বাধা দিচ্ছে কে ?

গম্ভীর মুখে জিতু পোদ্দারকে লক্ষ্য করে সকলের উদ্দেশেই বললাম, শোনো, আনন্দে আটখানা হবার সময় নয় এখন, আনন্দ পরে করো। আর একটুও দেরি না করে বাস ধরে যে যার বাড়ি চলে যাও।

ওরা সবিস্ময়ে একসঙ্গে আর্তনাদ করে উঠল।—সে কি ! কেন ?

বললাম, একটু বুদ্ধি খরচ করলেই বুঝবে, কেন।···তোমাদের মক্ষীরাণীকে আমি বাড়ি থেকে নিয়ে বেরিয়েছি, সকলেই জানে, রাত বেশি হলে মা পুলিশে খবর দেবে, পুলিশ আমাকে না পেয়ে আমার অন্তরঙ্গ সঙ্গী সাথী অর্থাৎ তোমাদের খোঁজ করবে। সেই খোঁজ করার আগে তারা যেন তোমাদের প্রত্যেককে বাড়িতে পায়, খোঁজ নিতে এলে তাদের ভুল রাস্তা দেখিয়ে দেবে। বলবে, একটা মেয়েকে নিয়ে হাওড়া ষ্টেশনের দিকে যেতে দেখেছ, কিংবা উত্তর কলকাতার দিকে।

ওরা হক্‌চকিয়ে গেল কেমন। জিতুর সঙ্গীরাও ঘাবড়াল হয়তো একটু। কিন্তু জিতু পোদ্দার বলল, আমরা যদি সকলে মিলে তোমার মতই গা-ঢাকা দিয়ে থাকি ?

ক'দিন থাকবে, খাবে কি ? তাছাড়া আমার মায়ের কত টাকা তোমরা জানো না—দরকার হলে হাজারখানেক পুলিশ সমস্ত জায়গা চষে ফেলবে। আর দেরি করো না, চলে যাও, কাল বেশ বেলাবেলি এসো, পরের ব্যবস্থা ঠিক করতে হবে।

জিতু জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি এই মেয়েটাকে তোমার মায়ের কাছ থেকে ধরে এনেছ নাকি ?

হ্যাঁ।

আমার বলার মধ্যে বা চোখে মুখে এমন কিছু ছিল, যা ওরা একটুও অবিশ্বাস করল না। তাছাড়া ঠিক যে ভাঁওতা দিয়েছি ওদের, তাও নয়। কেবল এই রাতটার মতো সরাতে চেয়েছি ওদের।

যাবার আগে জিতু আমার কানে কানে অশ্লীল প্রশ্ন করল একটা। আমি মাথা নাড়লাম, অর্থাৎ সেই রকমই ইচ্ছা।

জিতু মুখ দিয়ে কুৎসিত চুকচুক শব্দ করল। তারপর চোখ দিয়েই যশোদার সর্বাঙ্গ লেহন করে বাকি তিনজনকে নিয়ে চলে গেল।

এত ত্রাসের মধ্যেও যশোদা যেন স্বস্তি বোধ করল একটু। তাই দেখে আমার আরো রাগ হয়ে গেল। মাথায় আগুন নিভবে ভেবে-ছিলাম কিন্তু আরো যেন দ্বিগুণ জ্বলছে। ঘরের মধ্যে পায়চারি করছি আর কি-যে উল্টো-পাল্টা চিন্তা করছি, বুঝতে পারছি না।

সুমনদা!

ডাক শুনে থমকে দাঁড়ালাম। সরোষে তাকালাম ওর দিকে। যশোদা প্রাণপণে সাহসে বুক বাঁধতে চেষ্টা করছে, বুঝতে পারছি। কিন্তু এটুকুও আমি তচনচ করে দিতে চাই। অথচ পারছি না কেন?

এদিকে এসো, বোসো।

সামনে এলাম দাঁড়িয়ে রইলাম। নির্দয় চোখে তাকালাম।

সুমনদা তুমি এত নিচে নেমে গেছ! আমি যে বিশ্বাস করতে পারছি না।

বিশ্বাস করো। তাহলে যন্ত্রণা কমবে।

না না, বিশ্বাস করব না, তুমি এ-কাজ কেন করলে?

মায়ের বুক খালি করার জন্যে।

ও স্তব্ধ একটু। তারপর আকুতিভরা সুরে বলল, সুমনদা তোমার মা-কে আমি মা বলি, উনি আমার কাছে মায়ের থেকেও বড়—তাই তুমিও আমার কাছে দাদার থেকে বেশি কিছু।

কানে যেন গলানো সীসে ঢুকল এক প্রস্থ। সরোষে জবাব দিলাম, এটা অভিনয়ের জায়গা নয়, বুঝলে? ধুপ করে বসে হ্যাঁচকা টানে ওকে বুকে টেনে আনলাম।

আমি কেমন দাদা, এই রাতেই টের পাবে সেটা।

যশোদা আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে নিল নিজেকে। কেন যে ছাড়লাম,

কেন যে নৃশংস পাষণ্ড হয়ে উঠতে পারছি না, আমার সেই রাগ সেই যন্ত্রণা।

বসন একটু সম্বৃত করে নিয়ে ও সোজা মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক। আস্তে আস্তে বলল, সুমনদা, একটি ছেলেকে আমি ভালবাসি, মা বলেছে, আসছে ফাল্গুনে তার সঙ্গে আমার বিয়ে দেবে··· তুমি কি আমাদের ত্থ'জনকেই পাগল করে দেবে? আমাকে দয়া করতে পারো না?

কি হল আমার! আষ্টে-পৃষ্ঠে এত চাবুক চালাচ্ছে কে? ভালবাসা আবার কি জিনিস? যশোদার ওই ঠাণ্ডা চোখের সামনে আমি বসে থাকতে পারছি না কেন? এই কাণ্ড করে বসে ওরা সব ঠিক থাকল, মাঝখান থেকে আমার মাথাটাই শুধু গণ্ডগোল হয়ে গেল?

উঠলাম। ঘরের মধ্যে আবার পায়চারি করতে লাগলাম। মাথায় জমাট বাঁধা আগুন ঠাণ্ডা হয়ে আসছে কোন্ যাত্নমন্ত্রে? পায়চারি করছি আর মাঝে মাঝে ওর দিকে তাকাচ্ছি। যশোদা অপলক চোখে আমার দিকেই চেয়ে আছে। ওর মুখখানা এত সুন্দর লাগছে কেন এখন? দাদার মতই সামনে গিয়ে ওকে আদর করতে ইচ্ছে করছে কেন একটু?

কি কাণ্ড, ও নাকি একটা ছেলেকে ভালবাসে। ভালবাসা নামে আছে বোধহয় কিছু। নইলে যশোদার মুখখানা এত ভালো লাগছে কেন দেখতে?

আসছে ফাল্গুনে ওদের বিয়ে হবে। ছেলেপুলে হবে।···যশোদার ছেলের নাম কি হবে, গোপাল? কি আশ্চর্য, মাথাটা কি সত্যিই খারাপ হয়ে গেল আমার।···যশোদার গোপালের মুখখানা আমি চোখের সামনে এত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি কি করে? গোপাল হাসছে খলখল করে, যশোদাও হাসছে, ওদের হাসিতে আমার স্নায়ুগুলো সব যেন ভরাট হয়ে যাচ্ছে।

* * *

অন্ধকারে গাড়ি ছুটছে। যশোদা আমার পাশে নির্বাক বসে। ওর দিকে তাকিয়ে এখন আমার কেমন হাসি পাচ্ছে।

বাড়ি। আমার মায়ের বাড়ি। রাত তখন একটা, কিন্তু বাড়ির সব আলো জ্বলছে। গেটের সামনে গাড়ি থামতে যশোদা নেমেই ভিতরে ছুটল। আধা-আধি গিয়েই থমকে ফিরল! আবার আমার দিকে আসছে। আমাকে নামিয়ে নিতে আসছে। দোতলার বারান্দায় কারা ছুটে এসে দাঁড়াল? মা আর তার দুই আয়া বোধ হয়।

সুমনদা, নামো শীগ্‌গির!

ওকে বিষম চমকে দিয়ে আমি গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেলাম।

কি এক অদ্ভুত অনুভূতির মধ্যে কেটে গেল রাতটা। সকালে জিতু পোদ্দারের বাড়ি এলাম। আমাকে দেখে ও হাঁ। মক্ষীরাণীকে ঘরে ফিরিয়ে দিয়েছি শুনে ওর চাউনি ক্রুর হয়ে উঠল। পরে ওর দল-বল আসতে তারাও ক্রুদ্ধ। সকলেরই অবিশ্বাস।

ওদের ঠাণ্ডা করতে পাঁচশ' টাকা খেসারত কবুল করলাম আমি। চরিত্র জানি, দুনিয়া টাকার বশ।

কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত আর স্থির থাকতে পারলাম না। মা-কে নয়, যশোদাকে দেখার এত লোভ আর কখনো হয়নি। বোকার মত কাল পালিয়ে এলাম কেন? সমস্ত দিন এভাবে না কাটিয়ে দাদা তার বোনের কাছে গিয়ে হাজির হলেই তো পারতো! এতক্ষণ গেলাম না কেন?

গেট বন্ধ। গেটের সামনে দারোয়ান দাঁড়িয়ে। ঠাণ্ডা পালিশ করা মুখ যেন তার। যা বলল—তার সারমর্ম, মাইজি আমাকে আর বাড়িতে ঢুকতে দিতে নিষেধ করেছে।

পায়ের নিচে মাটি এত দুলছে কেন? মাথাটাই বা এ-ভাবে ঘুরছে কেন? বড়রকমের ভূমিকম্প-টম্প হচ্ছে কিছু?

* * *

জীবন কি? দুর্নিরীক্ষ্য কোনো অদৃষ্টকারের ছকে বাঁধা পরিকল্পনা কিছু? সেরকম কোনো শক্তির অস্তিত্ব আমার জানা নেই। এর থেকে আর এক দার্শনিক জীবন-সংজ্ঞা মনে রেখাপাত করে···আমাদের জীবন একখানা ডায়েরির খাতা। এতে আমরা এক গল্প লিখতে চাই কিন্তু লিখে বসি আর এক গল্প। আমাদের সব থেকে বিনীত মুহূর্ত

সেইটি, যা লিখেছি আর যা লিখতে চেয়েছিলাম, এই দুই-ই পাশাপাশি চোখের সামনে রেখে শান্ত মনে বিচার করতে পারি।

আমার সঙ্গে মেলে। আমার এক গল্প লেখার কথা, আর লিখে বসেছি অন্য। জনারণ্যের মধ্যে থেকেই জীবন সার্থক করার সমস্ত রসদ আমার নাগালের মধ্যে ছিল। অথচ জন্ম-মৃত্যুর মাঝখানের এই আল্ বাঁধা ক্ষেতে আমি এক নিঃসঙ্গ পথিক নিজের গড়া অন্ধকার সমুদ্রে ছোট এক জোনাকির মতো আশা আর নিরাশায় টিপ টিপ করে জ্বলেছি আর নিভেছি।

ভবিতব্য অনেক সময় আগে-ভাগে নাকি তার ছায়া ফেলে। আজ দু'বছর ধরে সেই ছায়া আমি অহরহ দেখতে পাচ্ছি। সেটা নড়ছে দুলছে আর খুব ধীরে অথচ অব্যর্থ গতিতে কাছে এগিয়ে আসছে। আসছেই। আমার নিঃসঙ্গ যাত্রা পরিণামের এক স্থির তটের দিকে এগিয়ে আসছে আর আমি যেন নিশ্চিত জানি, এ-যাত্রার মেয়াদ শেষ হয়ে এসেছে।

কিন্তু কেমন করে কোন পথ ধরে এ-শেষ হবে, আমার কোন ধারণা নেই। এ নিয়ে মাথাও ঘামাই নি। জীবনের এই বিনীত মুহূর্তটিকে এ-সব ভাবনা দিয়ে অত ভারাক্রান্ত করতে চাই নে।

তিন বছরের মধ্যে মায়ের সঙ্গে আর দেখা করিনি। মায়ের সঙ্গে দেখা একবার অবশ্য হয়েছে যশোদার বিয়ের রাতে। মা ত্যাগ করলেও ওই মেয়েটা আমাকে ছাড়তে পারেনি। নিজে এসে আমাকে নেমন্তন্ন করেছে, যাবার জন্য ঝোলাঝুলি করেছে। গেছি। বিয়ের জন্য মস্ত একটা বাড়ি ভাড়া করা হয়েছিল, সেই বাড়িতে গেছি। পরের বছর ওর একটা ছেলে হয়েছে। যশোদার গোপাল, গোপালকে ও বাড়িতে এনে আমাকে দেখিয়ে গেছে। আমি ওদের শুভ কামনা করেছি। শুভ কামনার সেই স্বাদও আগে কখনো টের পাই নি।

আশ্চর্য, মায়ের দরজা আমার সামনে বন্ধ হয়ে গেছে, সেই জন্যে আর আমার একটুকু রাগ নেই ক্ষোভ নেই। শুধু একটুকু অভিমান যেন মনের কোণে লেগে আছে। তার বেশি কিছু নয়।

আমি শুধু এই নিঃসঙ্গ যাত্রার শেষ লগ্নের প্রতীক্ষায় বসে আছি। মন কেবলই বলছে, আর খুব দেরি নেই।

কিন্তু শেষের সেই মুহূর্ত হঠাৎ যেন একটু আড়ম্বর করেই এসেছে। কিন্তু এসেছে বড় অনায়াসে। খবরটা খুব জাঁকজমক করে কাগজে বেরিয়েছে বোধহয়, কিন্তু আমার মতে শেষ শেষই—কেমন করে এলো তা নিয়ে অত ঘটা কেন?

জিতু পোদ্দারের দল এই তিন বছরে দ্বিগুণ বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল। প্রয়োজনে অনায়াসে জীবন ছিনিয়ে নেবার খেলায় মেতে উঠেছিল ওরা। ওর প্রধান সাগরেদ মনা গাঙ্গুলি ও আরো দু'জন।

জিতু আর আমার দু'জনের জীবনের খেলাই যে একসঙ্গে ঘনিয়ে এসেছে, আচমকা ঘটনাটা ঘটে যাবার পাঁচ মিনিট আগেও কেউ জানতুম না···রাতে দক্ষিণের এক নির্জন রাস্তায় ওদের চারজনের তিনজনকে একটা বন্ধ দোকানের রকে বসে থাকতে দেখে আমার কেমন সন্দেহ হয়েছিল, ওদের কিছু মতলব আছে। আমাকে দেখে জিতু বলেছিল, তুমি আবার মরতে এ-সময় এখানে কেন, পথ দেখো না!

আমি হেসে বললাম, বেলা চারটে থেকে আজ শুধু পথই দেখছি, এবারে বসি একটু।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমার টো-টো করে পথে পথে ঘুরে বেড়ানোর খবর রাখে ওরা। এই নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করে। কিন্তু আজ যেন সে-রকম মুড নেই ওদের।

যেখানে বসে আছি, সেই জায়গায় অনেকখানি জুড়ে আবছা অন্ধকার। আলো নেই। এক-একটা মোটর বা ট্রাক আসছে হেড লাইট জ্বেলে, সঙ্গে সঙ্গে ওদের তিন জোড়া চোখ যেন এক সঙ্গে সেদিকে ঝলসে উঠছে।

একটু বাদে দূরের আলোয় দেখলাম, মাঝারি গতিতে একটা বড় ঝকঝকে মোটর আসছে, আর সঙ্গে সঙ্গে ওদের তিনজনের মধ্যে চোখের ইশারা খেলে গেল।···ওরা যে-কোনো মোটামুটি পছন্দসই শিকারের আশায় বসে ছিল। শহর কলকাতার দৈনন্দিন স্বাভাবিক

ঘটনা। চোখের পলকে উঠে গেল ওরা, একজন একটা ভাঙা ঠেলা সামনে ধরতেই গাড়িটা থেমে গেল। গাড়িতে সামনে ড্রাইভার আর পিছনে মাঝবয়সী একটি মহিলা। দু'জনের হাতে ঝকঝকে ছোরা উঁচিয়ে উঠল, জিতু পোদ্দারের হাতে রিভলভার।

দশ হাত দূরে রকে বসে নির্বাক মূর্তির মতো দেখছি আমি। দরজা খুলে সঙ্গী দু'জন ড্রাইভারকে আগলে রাখতে চাইল, আর রিভলভার হাতে জিতু পোদ্দার পিছনের দরজা খুলে মহিলাকে প্রায় আধা-আধি টেনে নামালো। সেই সঙ্গে চাপা গর্জন, নেমে এসে দশ সেকেণ্ডের মধ্যে গায়ে যা আছে খুলে দিন, আর সঙ্গে যা আছে দিয়ে দিন···দেরি করলে এ-জীবনে আর গয়না পরার সুযোগ পাবেন না।

আমি বিস্ফারিত চোখে দেখেছি, মহিলার এক গা গয়না···সে কিছুতে গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে না···আমি দেখছি, একরোখা ড্রাইভারটা জোর করে নেমে এসে দু'জনের সঙ্গে যুঝতে গিয়ে ছোরার ঘায়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে—কিন্তু তখনো মনা গাঙ্গুলিকে আঁকড়ে ধরে আছে। এদিকে মহিলাকে প্রায় টেনে নামিয়েছে জিতু পোদ্দার—মহিলা ব্যাকুল ত্রাসে হঠাৎ আমাকে দেখে আর্তনাদ করে উঠল, বাঁচাও বাবা, বাঁচাও, মেরে ফেলল, বাঁচাও—

সঙ্গে সঙ্গে কি যে হয়ে গেল আমার মাথার মধ্যে, কি যে বিভ্রম ঘটল আমার চোখের তারায়—মুহূর্তের মধ্যে মহিলার মুখ মুছে গেল। মনে হল, আমার মায়ের মুখখানা স্পষ্ট দেখলাম, মনে হল, আমার মাকে টেনে নামাচ্ছে—মেরে ফেলছে।···মেরে ফেলবেই জানি, কারণ ওদের বিলম্ব সয় না, কোনরকম বাধা বরদাস্ত করে না।

চোখের পলকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের মতো জিতু পোদ্দারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম আমি। এই বাধার জন্য ও একটুও প্রস্তুত ছিল না, ওর রিভলভার আমার হাতে, আচমকা আঘাতে মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে টাল সামলালো। মহিলাকে···না দিশেহারার মতো আমার মা-কেই আমি আবার গাড়ির মধ্যে ঠেলে ঢোকাতে চেষ্টা করলাম।

আঃ! পিঠে আমল বিধে গেল কি, সত্তা নিঙড়ানো যন্ত্রণা একটা। তারপরেই ঠিক ঘাড়ে আবার সেই আঘাত। মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম···মাথার ওপর আবারও জিতু পোদ্দারের ছোরা ঝলসে উঠেছে।

হাতের রিভলভার আমি সজ্ঞানে ছুঁড়েছি কিনা জানি না। জিতু পোদ্দারের ছোরা আর নামল না। আমার গা ঘেঁষেই ঢলে পড়ল সে। সঙ্গে সঙ্গে মাথার ওপর আবার একটা উদ্যত ছোরা···সামনে মনা গাঙ্গুলির মুখ···আবারও আমার হাতের রিভলভারের শব্দ। মনা গাঙ্গুলি তিন পাক ঘুরে মাটিতে পড়ল। হ্যাঁ তখনো জ্ঞান আছে আমার, জ্ঞান হারাতে দিচ্ছি না···তৃতীয় লোকটা কোথায়···মা-কে কি আমি বাঁচাতে পেরেছি?

একটা গাড়ি থামার শব্দ। লোকজন চেঁচামেচি। একটু বাদে আরো কারা যেন ছুটে আসছে। উত্তেজিত স্বরে কি বলাবলি করছে সব। রমণীর গলা কানে আসছে। কারা আমাকে টেনে তুলতে চেষ্টা করছে।····আমার পাশের লোকটা মরে গেছে বলছে····পরের লোকটা নাকি উরুতে গুলি খেয়ে কাতরাচ্ছে···ড্রাইভারটা জখম হয়ে অজ্ঞান হয়ে আছে····মহিলা তারস্বরে সকলকে বলছে কি···আমাকে ধরাধরি করে গাড়িতে তুলল কারা···রমণীর নরম বুকে আমার মাথা।

আঃ। মা নাকি!

* * *

এই পরিণাম আমার জানাই ছিল। সেটা কবে আসবে, কখন আসবে, কোন পথ ধরে আসবে বা শেষের আসর ঠিক এই রকমই জমে উঠবে কিনা আমার চিন্তার মধ্যে সেটা বড় হয়ে ওঠেনি।···তোমরাও বড় করে দেখো না। শিউরে উঠো না।

পরিণামের এই আলোর রঙে আমার চোখের সামনে সমস্ত দুনিয়ার রঙবদলের উৎসব শুরু হয়েছে। আমার এই জড় দেহের শিরায় শিরায় এক অলক্ষ্য দক্ষশিল্পী তীব্র বেদনার মিড় টেনে চলেছে। তাই দেখে বার বার তোমরা শিউরে উঠছ। কিন্তু বিশ্বাস করো, এক

আসন্ন প্রত্যাশার নিশ্চিন্ততায় আমার এই নিথর দেহের শিরা উপশিরার তলায় তলায় এক অদ্ভুত স্পন্দন চলেছে।

…নিজের আনন্দে বিভোর, তাই তোমাদের করুণ মুখগুলো আমি ঝাপসা দেখছি।…মা ইন্দুমতী, তোমার মুখখানা এমন পাথর কেন? এতসব সেরা অভিনয় করার পর এমন একটা সাদামাটা অঙ্কে এসে এই কাণ্ড তোমার? তুমি কি বুঝতে পারছ না, মরীচিকার প্রেতের নাচ শেষ করে তোমার সুমন অনেক অনেক ব্যবধান পেরিয়ে যেখানে ছিল, ঠিক সেখানেই ফিরে এসেছে। তুমি শিল্পী, ওপরের ওই অলক্ষ্য শিল্পীর কাজ দেখে তুমি মুগ্ধ হতে পারছ না? তাহলে তোমার পাশে তাকাও, বাবার মুখখানা দেখো, আর তার পাশে নতুন মায়ের মুখখানাও। এবার পারছ মুগ্ধ হতে? ওপরের ওই শিল্পী রসিক কত, বুঝতে পারছ?

যশোদা, তুমিও এসে গেছ! কী কাণ্ড, ঘরে তোমার গোপাল কাঁদছে না? আর শোভা মিতা তোমরাই বা খবর পেলে কি করে? রেডিও আর খবরের কাগজগুলো সব দেশ থেকে তুলে দেওয়া যায় না!

দোহাই তোমাদের, তোমরা আর যা-ই করো, শোক কোরো না। শোকের অহঙ্কারে আমি অনেক ভুগেছি। আমার এই স্তব্ধ অনাবিল মুহূর্তগুলিকে আর শোকের শিকল পরিও না। এই কপালে শোকের তিলক কেটে দিয়ে তোমাদের অতি সাধারণ সুমনকে অসাধারণ করে তুলতে চেও না। মিনতি রাখো, শোক কোরো না।

মা ইন্দুমতী, এ-ও সত্যিই অভিনয়ের বেশি কিছু নয়…শোক কোরো না।